শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাকথা

কমলাবিহারী মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাকথা

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়ের লেখা

অন্যান্য বই :

জীবনকথা রচনামালা :

সারদামণির জীবনকথা	
স্বামীজীর জীবনকথা	দুই টাকা
রবীন্দ্র জীবনকথা	দুই টাকা
স্ট্যালিনের জীবনকথা	চৌদ্দ আনা

মহামানুষদের কথা

উপন্যাস :

যে নদী মরুপথে	আড়াই টাকা
ঘুমপাড়ানি গান	দুই টাকা

মহামানুষ রচনামালা :
(ছোটদের জন্য)

ছোটদের বিবেকানন্দ	দশ আনা
ছোটদের শ্রীরামকৃষ্ণ	দশ আনা
ছোটদের গান্ধীজী	এক টাকা দুই আনা
ছোটদের রবীন্দ্রনাথ	দশ আনা
ছোটদের বিদ্যাসাগর	দশ আনা

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাকথা

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

কলকাতা প্রকাশনা

আমার বাবা

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে

বইখানি উৎসর্গ করলুম।

❁

"তৃষ্ণায় অধিক পিয়ে সমুদ্রের বারি
কৃষ্ণপ্রেমকণা আমি ছুঁইবারে নারি।"

—"চৈতন্যচরিত"।

❁ ❁

"জানিনে নাথ, আমার ঘরে
ঠাঁই কোথা যে তোমারি তরে
নিজেরে তব চরণ পরে
সঁপিনি রাজরাজ।"

—"গীতবিতান", রবীন্দ্রনাথ।

লেখকের নিবেদন

সংসার-অরণ্যে পথের সন্ধান করে কাঁদে কে? চোখের জলে ভিজে উঠেছে কার নিশীথ রাত? তাঁদেরই উদ্দেশ্যে নিবেদন করলুম এই মহাজীবনের দিব্য কাহিনী। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাজীবনে সন্ধানও আছে, সমাধানও আছে। ছোট বড়, বিবাগী গৃহী,—সকলকেই তিনি ডাক দিয়ে গেছেন পরম করুণায়।

তাঁর জীবনে অপরূপ ভাবে ফুটে উঠেছে সকল পথের সমন্বয়। তাঁকে অনুসরণ করলে গৃহী তাঁর মধ্যে খুঁজে পাবে গৃহীশ্রেষ্ঠকে, বিবাগী খুঁজে পাবে মহাবৈরাগীকে। কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ভক্তিভোগী, শিল্পযোগী—সকলেই দেখতে পাবে আপন আপন আদর্শধারা। মানবজীবনে সকল পথ এসে যেখানে মিশেছে সেইখানে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তাঁর মধ্যে রূপ পেয়েছে সকল নদীর মিলনক্ষেত্র মহাসাগরের অনন্ত ভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাদের আধুনিক ভারতের আদি পুরুষ। তাঁর জীবনেই জন্মলাভ করেছে নবীন ভারত। আজও আমাদের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। কিন্তু কালে হবে। আদিম পৃথিবীর গহন কুয়াশার জাল ভেদ করে ক্ষুদ্রচক্ষু, অতিকায় গুহাবাসী জীবদের কাছে সূর্যালোক প্রকাশিত হতে সময় লেগেছিল।

ভারতীয় মহাজাতি একদিন শ্রেয়ঃ বলে অবলম্বন করেছিল মায়াময় জীবন ও জগৎ সংসার বর্জনের আদর্শ। ফলে, শুধু মোগল পাঠান ইংরেজের হাতে রাজনৈতিক অধীনতা নয়, তার সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক জীবনেও ঘনিয়ে উঠেছিল চরম অধঃপতন। ইংরেজ জাতির প্রভাবে পাশ্চাত্যসংস্কৃতির সঙ্গে সংঘাতে হঠাৎ আবার তার মধ্যে জেগে উঠল চৈতন্যোদয়ের অরুণ আভাস। এমনি সময় এলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। তাঁর জীবনে পুরাতন পেল নূতন রূপ। প্রাচীনের ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হল নবীন আদর্শধারা। সেই আদর্শধারার মূল কথা হচ্ছে, নির্লিপ্ততার পথে জীবনকে সর্বব্যাপক ভাবে গ্রহণ করা এবং নিত্য চলা।

এ বাণী নবভারতের মর্মবাণী। বিশ্লেষণ করে দেখলে বোঝা যাবে, ভক্তিযোগী বিবেকানন্দ এবং কর্মযোগী সুভাষচন্দ্রের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে এই আদি আদর্শধারাই দিয়েছে অপরূপ কর্মপ্রেরণা। প্রত্যক্ষভাবে যোগ না থাকলেও ভক্তিযোগী রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে এবং কর্মযোগী মোহনদাসের জীবনেও প্রকাশিত হয়েছে এই মূল ভাব-ধারা। নির্লিপ্ত যিনি না হতে পেরেছেন তিনি কি পারেন অহিংসার

অনুসরণ করতে ? জীবনকে নিরাসক্তির সাধনায় যিনি সর্বব্যাপকভাবে গ্রহণ না করেছেন, যিনি জীবের মধ্যে শিবের সন্ধান না পেয়েছেন তিনি কি পারেন নিজের মুক্তিসাধনা তুচ্ছ করে তেত্রিশ কোটী মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি প্রচেষ্টায় হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন দিতে ! একদিন কয়েক শতাব্দী ধরে বুদ্ধকে কেন্দ্র করে সারা ভারতবর্ষে জ্ঞান কর্ম শিল্প সাধনার অপরূপ বন্যা জেগে উঠেছিল। মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কেন্দ্র করেও আধুনিক ভারতে জাগবে তেমনি নব জীবনের প্রেরণা।

আজ সদ্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করার দরুন ভবিষ্যের দিগন্ত সম্বন্ধে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে আমাদের অনেকের দৃষ্টি। রাষ্ট্রনায়কদের কাছ থেকে আমরা খুঁজছি জীবনে পথ চলার বাণী। শুধু ভারতবর্ষে নয়, য়ুরোপেও বহুদেশে মানুষ আজ রাষ্ট্রনায়কদের পূজা করছে অতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। রাষ্ট্রনায়কদের হাতে রাজনৈতিক পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিচালনার দায়িত্ব কেন্দ্রীভূত করা সম্প্রতি এ যুগের অন্ধ মোহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বমানুষের এই তামসিকতা একদিন দূর হবেই। অন্ততঃ ভারতবর্ষে এ মোহ কিছুতেই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। এর আগে ভারতবর্ষ কোন কালেই রাষ্ট্রনায়ককে জীবনে আদি গুরুর আসন দেয় নি। ধর্মাশোক শেষ পর্যন্ত লোকের কাছে রাজাই ছিলেন, ধর্মগুরুর আসন লাভ করেন নি। বুদ্ধের জীবনদীপ থেকেই তিনি জ্বালিয়ে নিয়েছিলেন নিজের জীবনের দীপখানি। সত্য জীবনের সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে নব ভারতও অচিরে একদিন ফিরবে শ্রীরামকৃষ্ণমহাসাগরের দিকে। ইতি, ২৬ ফেব্রুআরী, ১৯৫০।

"শ্রীনাথনিবাস," কোন্নগর। কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়।

পুঃ—এই বইখানি লেখার সময়ে বন্ধু শ্রীবিভুপ্রসাদ বসু এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী নির্মোহানন্দ বই দিয়ে সাহায্য করেছেন। অদ্বৈতআশ্রম কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেও কয়েকখানি বই এবং ছবির ব্লক পেয়েছিলুম। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ স্বামী পবিত্রানন্দ পাণ্ডুলিপি পড়ে সাহায্য করেছেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ স্বামী অভয়ানন্দ অনেকদিন ধরে বইখানি লেখার জন্য উৎসাহ দিয়ে আসছিলেন। প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সেন প্রুফ দেখার কাজে মাঝে মাঝে সাহায্য করেছেন। তাঁদের ঋণ স্বীকার্য। এই প্রসঙ্গে বেলুড় মঠের সাধারণ অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাভাজন শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দের নীরব স্নেহ ও উৎসাহের কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।
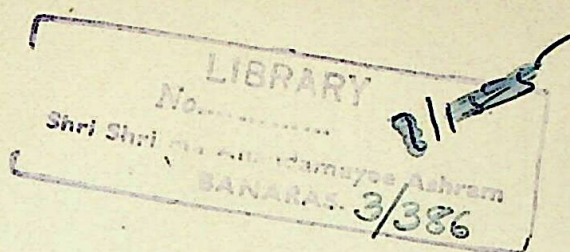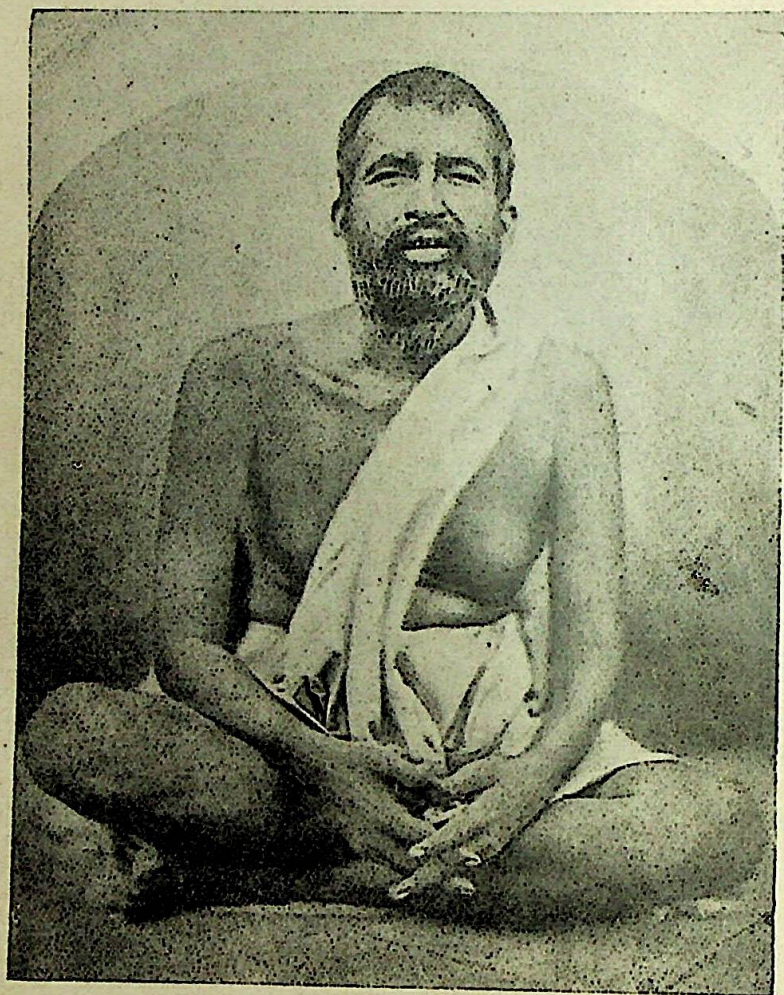
"সে যে আসে, আসে, আসে—"

মহামানুষ আসেন দুর্যোগের মধ্যে দিয়েই। চিরদিন বেদনার তিমির আকাশ চিরে ফুটে ওঠে তাঁর আবির্ভাব।

শ্রীক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের বাস হুগলীজেলার প্রান্তে দেরে গ্রামে। পুরুষানুক্রমে তাঁরা সদাচারী, কুলীন ও শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। পূর্ব-পুরুষের সকল গুণই ক্ষুদিরাম পেয়েছিলেন। রঘুবীরের পূজা না করে জলগ্রহণ করতেন না। শূদ্রের দান কখনও নিতেন না—এমন কি শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ পর্যন্ত রাখতেন না। এই গৌরবর্ণ. প্রিয়দর্শন, দীর্ঘাঙ্গ ব্রাহ্মণ জীবনে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে শাস্ত্রনির্দিষ্ট কৃত্য পালন করতেন। সাংসারিক অবস্থা তাঁর মোটেই ভাল ছিল না। বংশের যত বড় গৌরব ছিল সেই অনুপাতে ছিল না বিত্ত। সামান্য কয়েক বিঘা জমির আয় থেকে দুঃখে-কষ্টে তাঁর দিন কাটত। কিন্তু বাইরের দৈন্য তাঁর অন্তর্জীবনকে স্পর্শ করতে পারে নি।

দেরে গ্রামের জমিদার শ্রীরামানন্দ রায় যেমন ধনী ছিলেন তেমনি প্রজাপীড়নের জন্য ভীষণ তাঁর বদনাম ছিল। কারো উপর অসন্তুষ্ট হলে ছলে বলে তাকে সর্বস্বান্ত না করে নিশ্চিন্ত হতেন না। এমনই ছিল তাঁর জেদ। একবার দেরে গ্রামের এক প্রজাকে জব্দ করবার জন্য তিনি মিথ্যা মামলা রুজু করেন। মকদ্দমার জয়ের জন্য চাই এমন একজন লোকের সাক্ষ্য যাঁর দশজনের কাছে সুনাম আছে। ক্ষুদিরাম ধর্মনিষ্ঠার জন্য সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। জমিদার তাঁকেই মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্য অনুরোধ করে পাঠালেন। অনুরোধ শেষে পরিণত হল পীড়াপীড়িতে। গরিব ক্ষুদিরাম বারেবারে একই উত্তর দিলেন, না, আমার দ্বারা এ কাজ হবে না।

জমিদারের চর এসে গোপনে শাসিয়ে গেল। শুভাকাঙ্ক্ষীরা ভবিষ্যৎ বিপদের কথা উল্লেখ করে একটু সাংসারিক হবার জন্য উপদেশ দিলেন। সত্যনিষ্ঠ ক্ষুদিরামের মুখে এক কথা, মিথ্যে সাক্ষী আমি দিতে পারব না।

যে মিথ্যাকে তিনি প্রশ্রয় দিলেন না, সেই মিথ্যাই কিছুদিন পরে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলে। জমিদারের তরফ থেকে তাঁর নামে অভিযোগ

সাজিয়ে নালিশ করা হল। আদালতের বিচারে জমিদারেরই হল জয়। তিনি ক্ষুদিরামের পৈত্রিক বিষয়সম্পত্তি সব নিলাম করে কিনে নিলেন। সবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবেশীরা কেউ তাঁর পক্ষ নেবার সাহস করতে পারলে না। সাধারণ মানুষের সমাজে মিথ্যার প্রতাপ যে চিরদিনই সত্যের মহিমাকে প্রায় ম্লান করে রাখে।

প্রায় এক ক্রোশ দূরে কামারপুকুর গ্রামে বাস করতেন শ্রীসুখলাল গোস্বামী। ক্ষুদিরামের সঙ্গে ছিল তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গতা। বন্ধুর বিপদে তিনি এসে বুক দিয়ে পড়লেন। তাঁর বাড়ির এক অংশ চিরকালের জন্য বন্ধুকে ছেড়ে দিলেন—উৎপীড়িত পরিবারের ভরণপোষণের জন্য দান করলেন এক বিঘা দশ ছটাক ধান জমি। রঘুবীরকে বুকে নিয়ে নির্ভয়ে পৈত্রিক ভিটা ছেড়ে ক্ষুদিরাম সপরিবারে এলেন কামারপুকুরে। তখন তাঁর বয়স প্রায় চল্লিশ বছর।

এক কালে কামারপুকুর বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। এর প্রায় বত্রিশ মাইল উত্তরে বর্দ্ধমান শহর। প্রায় কুড়ি মাইল পূর্বে তারকেশ্বর। প্রায় ১৮ মাইল দক্ষিণে ঘাটাল। তিনটি শহরের সঙ্গেই পাকা রাস্তার সংযোগ আছে। সুতা, গামছা, কাপড় এবং আবলুষ কাঠের তৈরি হুঁকার নল প্রভৃতি শিল্প-কাজের কারবারের জন্য কামারপুকুর বিখ্যাত ছিল। তখন গ্রামবাসীর শরীরে ছিল প্রচুর স্বাস্থ্য—উর্বর জমি থেকে জন্মাতও প্রচুর ফসল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ম্যালেরিয়া মহামারী সূত্রপাত হবার পর থেকে হুগলীর এই প্রান্তের মূর্তি একেবারে বদলে যায়। ক্ষুদিরাম যখন উঠে এলেন তখন আর কামারপুকুরের আগেকার শ্রী ছিল না। জমির উর্বরতাও নষ্ট হয়ে গেছল। দশ বছরের ছেলে রামকুমার, চার বছরের মেয়ে কাত্যায়নী ও স্ত্রী চন্দ্রা দেবীকে নিয়ে ক্ষুদিরামের ছোট্ট সংসার। বন্ধুর দেওয়া প্রায় দুই বিঘা ধান জমির উপর নির্ভর করে অতি কষ্টে তাঁর দিন কাটতে লাগল। পুরুষানুক্রমে যে সংস্কৃতির মধ্যে তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন তার ফলে তিনি শিখেছিলেন সংসারের সকল দুঃখে অবিচলিত থেকে একান্ত মনে নির্ভর করতে ইষ্টদেবতার উপর। তাই দুর্দিনের অন্ধকারে তিনি আরও গভীর-ভাবে শরণ নিলেন সেই কাণ্ডারীর। দিনের বেশির ভাগ সময় তাঁর কাটতে লাগল রঘুবীরের পূজার্চনায়।

চন্দ্রা দেবীও স্বামীর মত অল্পে তুষ্ট ছিলেন। তাঁর প্রকৃতি ছিল খুব সরল।

সংসারের কুটিলতার লেশমাত্র কখনও তাঁকে স্পর্শ করে নি। বিষয়বুদ্ধিতে তিনি ছিলেন খুব কাঁচা। টাকাপয়সা গুণতে পর্যন্ত পারতেন না। সরল মনে নিজের মনের কথা সকলকে বলে ফেলতেন। তাঁর হৃদয় ছিল সকলের প্রতি ভালবাসায় ভরা। এত অভাবের মধ্যেও গরিবদুঃখী কখনও তাঁর বাড়ি থেকে বিমুখ হয়ে ফিরে যেত না। মানুষকে যত্ন করে খাওয়াতে তিনি খুব ভালবাসতেন। ছেলেমেয়ে পাড়াপড়শী সকলের সব রকম আবদার নিয়ত হাসিমুখে পূরণ করবার চেষ্টা করতেন। তাঁর নানা সদ্‌গুণের জন্য গাঁয়ের মেয়েরা তাঁকে ভালবাসত।

চন্দ্রাদেবী অনন্যসাধারণ নির্লোভ ছিলেন। গদাধর তখন দক্ষিণেশ্বরে, মথুরামোহন তাঁর পরম অনুরাগী সেবক। চন্দ্রাদেবী জীবনের শেষ বছর কয়টি গঙ্গাতীরে কাটাবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে এসে বাস করছেন। চিরজীবন তাঁর কঠোর দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে কেটেছে। পয়সার অভাব যে সংসারে মানুষের জীবনে কি প্রচণ্ড অভাব তা নির্মম অভিজ্ঞতার ফলে তিনি ভাল করেই জানতেন। ইতিপূর্বে মথুরামোহন গদাধরকে কিছু বিষয় দান করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সফল হতে পারেন নি। এবার চন্দ্রাদেবীকে কাছে পেয়ে একদিন সবিনয়ে বললেন, ঠাকুমা, তুমি ত আমার কাছ থেকে কখন কোন সেবা নাও নি। যদি সত্যসত্যই আমাকে তোমার আপনার লোক ভাব তাহলে আমার কাছে আজ যা তোমার ইচ্ছে চেয়ে নাও।

সরলহৃদয়া চন্দ্রা কি চাইবেন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না। বললেন, বাবা তোমার কল্যাণে আমার ত কিছুরই অভাব নেই। যখন কিছুর দরকার হবে চেয়ে নেব।

—না, তুমি কিছু চাও।

বুড়ী নিজের ছোট ট্রাঙ্কটি মথুরের সামনে খুলে ধরে বললেন, এই দেখ, কত পরবার কাপড় রয়েছে। আর খাবারও সকল বন্দোবস্তই তুমি করে দিয়েছ। তবে আর কি নেব বল ?

—যা তোমার খুশি তাই নাও।

—যদি নেহাত ছাড়বে না, তবে আমার মুখে দেবার গুল নেই, এক আনার দোক্তা আনিয়ে দাও।

মহাজন মহাজনের সংসারেই এসে জন্ম নেন। পাগলা ঝোরার নির্মল উৎস থেকেই জাগে পতিপাবনী গঙ্গার স্রোত।

ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রাদেবী দুজনের চরিত্রেই ভগবদ্‌প্রীতি খুব গভীর ছিল; দুজনেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক অনুভূতি নিয়ে।

১২৪১ সালে ক্ষুদিরাম গয়াধামে তীর্থ করতে গেছলেন। একদিন রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, তিনি যেন শ্রীমন্দিরে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করছেন আর তাঁরা যেন জ্যোতির্ময় দেহে এসে তাঁকে আশীর্বাদ করছেন। সহসা এক অপূর্ব দিব্য জ্যোতিঃতে সমস্ত মন্দির ভরে গেল,—এক নবদূর্বাদলশ্যাম পুরুষ এসে আবির্ভূত হলেন। ক্ষুদিরাম হৃদয়ের আবেগে সেই দিব্যপুরুষের সিংহাসনের কাছে গিয়ে একান্ত ভক্তি সহকারে তাঁর বন্দনা করতে লাগলেন। তখন যেন দিব্যপুরুষ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, ক্ষুদিরাম, তোমার ভক্তিতে আমি তুষ্ট হয়েছি। তোমার ঘরে আমি যাব, তোমার পুত্ররূপে তোমার সেবা গ্রহণ করব। ক্ষুদিরামের আনন্দের সীমা রইল না। কিন্তু পলকে তাঁর মনে পড়ল নিজের দারিদ্র্যের কথা। তিনি করুণভাবে জানালেন, আমার মত গরিবের ঘরে এলে তোমার যে উপযুক্ত সেবা হবে না, প্রভু! তুমি আমাকে কৃপা করে দর্শন দিয়েছ এতেই আমি কৃতার্থ। এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর আমি চাই না।

দিব্যপুরুষ আরও তুষ্ট হয়ে বললেন, ভয় নেই, তুমি যা দেবে তাই আমি তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করব।

অদ্ভুত স্বপ্নের আনন্দে ক্ষুদিরামের মন ভরে উঠল। যথা সময়ে তিনি গয়াধাম ত্যাগ করলেন।

বাড়ি ফিরে এসে স্ত্রীর কাছে শুনলেন, চন্দ্রাদেবীও ইতিমধ্যে এক অদ্ভুত দর্শন পেয়েছেন। একদিন যুগীদের শিবমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে পাড়ার একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন এমন সময় দেখতে পেলেন, মহাদেবের অঙ্গ থেকে দিব্য জ্যোতিঃ বার হয়ে মন্দির ভরে গেছে। কিছুক্ষণ পরে সেই জ্যোতিঃর তরঙ্গ যেন হাওয়ার মত ছুটে এসে চন্দ্রাদেবীকে ছেয়ে ফেললে। ভয়ে বিস্ময়ে আবেগে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

ক্রমে তিন চার মাস কেটে গেল। বোঝা গেল, পঁয়তাল্লিশ বছর

বয়সে চন্দ্রাদেবী আবার সন্তানসম্ভবা হয়েছেন। দিব্যজ্যোতির আবির্ভাব সম্ভাবনায় ক্ষুদিরামের দুঃখের সংসারে দেখা দিলে এক অজানা আনন্দ।

পরম বিশ্বাসে তাঁদের হৃদয়ের সব সংশয় ঘুচে গেল। দুঃখীর ঘরেই ত তিনি আসেন, বিপদের দিনেই ত দূরে শোনা যায় তাঁর রথের ধ্বনি।

"কত শ্রাবণ অন্ধকারে মেঘের রথে
সে যে আসে, আসে, আসে।
দুখের পরে পরম দুখে,
তারি চরণ বাজে বুকে,
সুখে কখন বুলিয়ে সে দেয়
পরশমণি।
সে যে আসে, আসে, আসে।"

*

* *

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুআরী, বুধবার (১২৪২ সালের ৬ ফাল্গুন)।

বাইরে বনে বনে লেগেছে তখন নব বসন্তের দোলা। কচি কচি পাতায় পাতায় নতুন প্রাণের হিল্লোল। ডালে ডালে সদ্যজাগা বকুল চাঁপা পলাশের পুলক পরশ। আকাশে বাতাসে নবীনের আগমনী। এমনি দিনে চিরনবীন জন্ম নিলেন ক্ষুধিরামের কুঁড়ে ঘরে। ফুলের কুঁড়ির মত ফুটফুটে খোকা দেখে চন্দ্রাদেবী সকল যন্ত্রণা ভুলে গেলেন, ক্ষুধিরামের বুক উঠল ভরে। গয়া তীর্থের কথা স্মরণ করে তাঁরা ছেলের নাম রাখলেন গদাধর।

বালক গদাধর এমনই সুঠাম ও সুন্দর ছিলেন যে যে দেখত সেই মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারত না। তাঁর এত তীক্ষ্ণ মেধা ছিল যে সেই বয়সেই পূর্ব পুরুষের নামাবলী, ছোট ছোট মন্ত্র ও স্তোত্র, রামায়ণ মহাভারতের নানা গল্প বাবার মুখে একবার শুনে তা হুবহু আবৃত্তি করতে পারতেন। পাঁচ বছরে পড়তেই ক্ষুদিরাম তাঁকে জমিদার লাহাদের পাঠশালে পাঠিয়ে দিলেন। এই দুরন্ত ছেলেটিকে নিয়ে গুরুমশাইকে প্রায়ই বিপদে পড়তে হত। পড়াশোনায় তাঁর একটুও মনোযোগ ছিল না। সমবয়সীদের সঙ্গে খেলা করতে পাড়ায় পাড়ায় যাত্রাগান কথকতা শুনতে তাঁর খুব মজা লাগত। ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রাদেবী তাঁদের স্বপ্নের কথা স্মরণ করে ছেলেকে বিশেষ কিছু তাড়না করতেন না। তার ফলে গদাধর বেশ একগুঁয়ে হয়ে উঠেছিলেন—নিজের খেয়ালে যা

করতে চাইতেন তা থেকে জোর করে কেউ নিবৃত্ত করতে পারত না। অথচ হুকুম না করে মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে বললে সহজেই কথা শুনতেন। গদাধরের ব্যবহারে কোন মিথ্যার সংশ্রব ছিল না। কিছু অন্যায় কাজ করে ফেললে কোনদিন তা ঢাকবার চেষ্টা করতেন না।

এই সদানন্দ বালক খুব রঙ্গপ্রিয় ছিলেন। মানুষের হাবভাবের বৈশিষ্ট্য তন্ন তন্ন করে লক্ষ্য করতেন। পরে মা ও পাড়ার অন্যান্য মেয়েদের সমাজে বা বন্ধুমহলে সেই সব হাবভাবের চমৎকার অনুকরণ করে দেখাতেন। তাঁর অদ্ভুত অনুকরণ শক্তি দেখে সকলেই অবাক্ হয়ে যেত।

অতি অল্প বয়সেই তাঁর ভাবতন্ময়তার পরিচয় পাওয়া গেছল। তখন তাঁর বয়স মাত্র ছ বছর। জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাস হবে। বন্ধুর দল মিলে একদিন সকাল বেলা মাঠের পথে বেরিয়েছিলেন। তাঁর হাতে টোকায় ভরা মুড়ি। মাথার উপরে উঠেছিল একখানা সুন্দর জলভরা মেঘ। মুড়ি খেতে খেতে আকাশের দিকে চেয়ে আলপথ দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। ক্রমে মেঘখানা প্রায় আকাশ ছেয়ে ফেললে। এমন সময় এক ঝাঁক সাদা দুধের মত বক সেই কাল মেঘের কোল দিয়ে উড়ে গেল। সে দৃশ্য দেখতে দেখতে গদাধর তন্ময় হয়ে গেলেন, তাঁর আর হুঁশ রইল না। অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

বিরহিনী আকাশ কি ডাক দিয়েছিল তার চিরকালের ভালবাসার ধন শ্যামল সুন্দরকে! পরে আরও কয়েকবার তাঁর এই রকম ভাবসমাধি হয়।

১২৪৯ সালে ক্ষুদিরাম দেহত্যাগ করলেন। সংসারের সব ভার পড়ল বড় ভাই রামকুমারের উপর। রামকুমারের স্নেহে গদাধর মানুষ হতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, ছোট ভাই লেখাপড়া করে যেন বিখ্যাত পণ্ডিত হয়। কিন্তু গদাধরের মন ছিল অন্য কাজে। পাঠশালায় রোজ যেতেন বটে কিন্তু পড়াশোনায় মোটে আনন্দ পেতেন না। এই সময়ে দেবদেবীর মূর্তি গড়তে তাঁর খুব ভাল লাগত,—পরে এ কাজে বিশেষ দক্ষতালাভও করেছিলেন। শোনা যায়, দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে রাত্রে শোবার সময় পূজকের হাত থেকে পড়ে গোবিন্দ বিগ্রহের একটি পা ভেঙে যায়। গদাধর এমন নিপুণভাবে ভাঙা পা জুড়ে দিয়েছিলেন যে বিগ্রহ আর বদলাবার দরকার হয় নি।

তখন তাঁর বয়স আট বছর। কামারপুকুরের এক পাশ দিয়ে বর্দ্ধমান থেকে পুরী যাবার রাস্তা আছে। এই রাস্তায় সাধুসন্ন্যাসী, তীর্থযাত্রীরা রোজই যাতায়াত করত। তাঁদের আশ্রয়ের জন্য জমিদার লাহাদের প্রতিষ্ঠিত একটি

পান্থনিবাস ছিল। গদাধর সাধু দেখবার জন্য প্রায়ই সেখানে যেতেন। সন্ন্যাসী বিবাগীদের প্রতি তাঁর একটা গভীর বিস্ময়ের ভাব ছিল। একবার কয়েকজন সাধু কিছুদিন পান্থনিবাসে থেকে যান। তাঁদের সঙ্গে গদাধরের খুব ভাব হয়। প্রায়ই তাঁদের কাছে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে তাঁদের দেওয়া খাবার খেয়ে তিনি বাড়ি ফিরতে লাগলেন। একদিন নিজের পরনের কাপড়খানি ছিঁড়ে সন্ন্যাসীদের মত কৌপীন পরে সর্বাঙ্গ বিভূতি মেখে তিলক কেটে মার কাছে এসে হাজির, বললেন, মা দেখ দেখ সাধুরা আমায় কেমন সাজিয়ে দিয়েছে।

চন্দ্রা ছুটে এসে সেই অপূর্ব মূর্তি দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন। গায়ে কাঁচা সোনার লাবণ্য, মুখে দিব্য জ্যোতিঃ, অঙ্গে অঙ্গে ছন্দেভরা চাঞ্চল্য, পরনে কৌপীন। দেখতে দেখতে মায়ের চোখদুটি সজল হয়ে উঠল।

জীবনের সব কিছু জানবার জন্য গদাধরের ছিল প্রবল ঔৎসুক্য। এই অদম্য ঔৎসুক্য নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। তাঁর মধ্যে প্রাণের প্রবাহ ছিল নিত্যউচ্ছল। চারিদিকের কোন কিছুর প্রতি উদাসীন হয়ে তিনি থাকতে পারতেন না। ছোট বেলা থেকে যা দেখতেন তারই অনুকরণ করতেন—এই অনুকরণ করার মূলে ছিল তাঁর সতেজ প্রাণের জীবন সম্বন্ধে অপরিমেয় ঔৎসুক্য।

ন বছর বয়সের সময় গদাধরের উপনয়ন হয়। এই সময়ে তিনি যে কত একগুঁয়ে ছিলেন তা একটি ঘটনাতে পরিচয় পাওয়া যায়। পাড়ার কামারবাড়ির মেয়ে ধনী তাঁর মার বন্ধু ছিলেন। গদাধরকে তিনি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসতেন।

তাঁর মনে বড় সাধ, গদাধর তাঁকে কোনভাবে যেন মা বলে ডাকেন। কিন্তু তিনি অন্তরের গোপন কথা অন্তরেই লুকিয়ে রাখেন। সাহস করে প্রকাশ করতে পারেন না। একদিন হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, গদাধরের পৈতের সময় ত তিনি তাঁর ভিক্ষামা হতে পারেন। গদাধরকে কোলে নিয়ে আদর করে তাঁকে মনের কথা জানালেন, বাবা, তোমার যখন পৈতে হবে তখন আমি সকলের আগে তোমায় ভিক্ষে দেব, আর তুমি আমায় মা বলে ডাকবে কেমন ?

গদাধর আহ্লাদে আটখানা হয়ে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, তুমি আমার ভিক্ষেমা হবে। চিরদিন ভালবাসার দাস তিনি।

আশাভরা আনন্দে দুঃখিনীর বুক ভরে গেল। তিনি বললেন, দেখো বাবা, কথা দিলে, পরে যেন তা ভুলে যেও না।

কিছুদিন পরে রামকুমার গদাধরের পৈতা দেবার আয়োজন করলেন।

উপনয়নের দিন ঠিক হলে ধনী এসে বন্ধু চন্দ্রাকে সব কথা জানালেন। চন্দ্রা তা শুনে চমকে উঠলেন। তাঁর মুখের নীরব রেখায় রেখায় ফুটে উঠল, তাকি হয় ?

রামকুমার সব শুনে ঘোর আপত্তি করলেন, বললেন, প্রথমেই শূদ্রের হাত থেকে দান নেবে এ যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা! গদাধর কিন্তু জিদ্ ধরে বসলেন, বললেন, ওকে ভিক্ষামা হতে না দিলে আমার পৈতে চাই না। শেষে রামকুমার উপায়ন্তর না দেখে রাজী হলেন। যথা দিনে পৈতে হয়ে গেলে নতুন ব্রহ্মচারী দণ্ডী ঘরে যাবার আগে প্রথমেই ধনীর কাছে এসে হাত পেতে দাঁড়ালেন, ভবতী, ভিক্ষাম্ দেহি। ধনী তাঁর স্নেহের দুলালের ভিক্ষাঝুলি ভরে দিলেন, গর্ব ও আনন্দের আবেগে তাঁর কণ্ঠ রোধ হয়ে গেল।

দেখতে দেখতে গদাধর যৌবনে পা দিলেন। কিন্তু তাঁর ভিতরের আনন্দবিলাসী কিশোর মূর্তির কোন পরিবর্তন হল না। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ দিন দিন ক্ষীণ হতে লাগল তবু তাঁর পূর্ণ জ্যোৎস্না যেন কিছুমাত্র কমল না। চিরকিশোর কামারপুকুরের নরনারীর হৃদয়ে হৃদয়ে অহেতুক ভালবাসার আসন প্রতিষ্ঠিত করতে লাগলেন।

দুঃখকষ্টের সংসার। দেশে অন্নসংস্থানের তেমন সুবিধা না হওয়ায় দাদা রামকুমার এর আগেই কলকাতায় গিয়ে টোল খুলেছিলেন। তাঁর পরিচিত কয়েকজন কলকাতায় যজমানী কাজ করে নিজেদের অবস্থা ফিরিয়ে নিয়েছিল। রামকুমারেরও মনে মনে ছিল সেই আশা। বাড়িতে থেকে মেজভাই রামেশ্বর সংসার দেখতে লাগলেন। বাড়ির অভাব অনটন দেখে গদাধরের নির্বিকার তরুণ মনে বিশেষ কোন চাঞ্চল্য আসত না। অফুরন্ত জীবনী-শক্তির স্ফূর্তি নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। নিজের আনন্দে আত্মভোলা হয়ে দিন কাটাতেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি। লেখাপড়ার দিকে ত মোটেই ঝোঁক ছিল না। কুলগত যজমানী কাজে দক্ষ হয়ে যে জীবিকা উপার্জনের জন্য প্রস্তুত হবেন—সেদিকেও তাঁর মন বসেনি। রামকুমার ও রামেশ্বর ছোট ভাইএর মতিগতি দেখে মহা ভাবনায় পড়লেন। তাঁরা জানতেন না, মহাকাল অনেক আগে থেকেই তাঁর এই অপরূপ সৃষ্টির বিকাশের জন্য সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত পথে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তুলছিলেন।

কলকাতা জানবাজারের বিখ্যাত ধনী মাড়বংশের বাস। এই পরিবারের শ্রীরাজচন্দ্র ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে দেহ রাখলে তাঁর স্ত্রী রানী রাসমণি স্বামীর বিপুল ঐশ্বর্যের তত্ত্বাবধানের ভার পান। তিনি যেমনি তেজস্বিনী তেমনি অসামান্য শক্তিশালিনী ছিলেন। বাংলাদেশে এমন প্রখর বুদ্ধিমতী ও ব্যক্তিত্বপরায়ণা মেয়ের কথা খুব কম শোনা যায়। 'রানী' তাঁর রাজসরকারের দেওয়া উপাধি ছিল না, তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে লোকে তাঁকে ডাকত রানী বলে। তাঁর জন্ম হয় হালিশহরের কাছে কানা গ্রামে সাধারণ গরিব ঘরে। হয়ত অপরূপ রূপলাবণ্যের জন্যই কলকাতার বিখ্যাত ধনী পরিবারে বধূরূপে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

রাসমণি সকল দিকেই অসামান্য ছিলেন। ধর্মে যেমন তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, বিদ্যাবুদ্ধিতেও তেমন তীক্ষ্ণ ছিলেন। একবার হঠাৎ ভারতের বিদেশী গভর্ণমেণ্ট ঠিক করলেন গঙ্গায় মাছধরার জন্য প্রত্যেককে লাইসেন্স নিতে হবে। নিরুপায় জেলের দল এসে হাজির হলেন রানীর দরবারে। নানা চিন্তার পর রাসমণি এক মতলব স্থির করলেন। দশ হাজার টাকা দিয়ে তিনি মেটেবুরুজ থেকে ঘুষুড়ী পর্যন্ত গঙ্গায় মাছ ধরবার স্বত্ব ইজারা নিলেন। আইন অনুযায়ী লিখিত বন্দোবস্ত হয়ে গেল। তারপর রাসমণির ইঙ্গিতে তাঁর কর্মচারীরা ইজারানেওয়া সীমানার মধ্যে নৌকো জাহাজ যাতায়াত বন্ধ করে দিলেন। এই ব্যাপারে চারিদিকে হৈচৈ পড়ে গেল। গভর্ণমেণ্ট আইনের বিধি অনুযায়ী রানীর কাজে বাধা দিতে পারলেন না। তখন তাঁর টাকা ফেরত দিয়ে আগেকার মত আবার বিনাশুল্কে সকলের মাছ ধরার অধিকার মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

জনহিতকর কাজের সঙ্কল্প করে রাসমণি কখনও খরচের জন্য কুণ্ঠিত হতেন না। যাত্রীদের সুবিধার জন্য তিনি সুবর্ণরেখা নদী থেকে পুরী পর্যন্ত চওড়া রাস্তা করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রায় লক্ষ টাকা খরচ করে টোনার খাল কাটিয়ে মধুমতী নদীর সঙ্গে নবগঙ্গার সংযোগ করিয়ে দেন।

ছেলে বয়স থেকে কালীপদে তাঁর অচলা ভক্তি ছিল। জীবনের সায়াহ্নে

দক্ষিণেশ্বর গ্রামে গঙ্গাতীরে প্রায় ৬০ বিঘা জমির উপর ছ সাত লক্ষ টাকা খরচ করে প্রকাণ্ড কালীবাড়ি নির্মাণ করালেন। তাঁর প্রবল ইচ্ছা হল, মন্দিরে তাঁর ইষ্টদেবীকে নিত্য অন্নভোগ দেবেন। কিন্তু সমাজের এমন স্তরে তাঁর জন্ম যেখানে প্রচলিত শাস্ত্রমতে অন্ন ভোগ দেবার অধিকার কেউ লাভ করতে পারে না। দেবতাকে মানুষ মনের মত করে পূজা করবে, তিনি ত ভক্তের ভগবান। মানুষের পৃথিবীতে এই ত পূজার সব চেয়ে বড় বিধি হওয়া উচিত। কিন্তু সংসারে মানুষ ত একা একা বাস করে না—সমাজ গড়ে সে যে চারিদিকে নানা বিধি নিষেধের জাল সৃষ্টি করে রেখেছে। রাসমণি সামাজিক শাস্ত্রের বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে চাইলেন না। তিনি নানা শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের নির্দেশ ও ব্যবস্থা নেবার আয়োজন করলেন। শুধু তাই নয়, তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ইষ্টদেবীর পূজার ভার এমন একজন শাস্ত্রজ্ঞ, সদাচারী ব্রাহ্মণের হাতে দেবেন যাঁর সাধনার ফলে তাঁর সকল অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে উঠবে। চারিদিকে সন্ধান চলতে লাগল।

এদিকে কলকাতার একপ্রান্তে ঝামাপুকুরে রামকুমারের তখন টোল চলছে। দিন দিন তাঁর আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে উঠছে। বিখ্যাত পণ্ডিত তিনি কিন্তু সংস্কৃত ভাষার গরিব পণ্ডিতের পক্ষে বিশেষ কোন উচ্চাসন তখন শহরের সমাজে ছিল না। যজমানী পুরোহিতের প্রতি লোকের আস্থাও দিন দিন কমে আসছিল। তাই যজমানী কাজের আদায়দক্ষিণা হিসাবে রামকুমারের আর তেমন আয় হত না। কিছুদিন আগে তিনি ছোট ভাই গদাধরকে কামারপুকুর থেকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, গদাধর তাঁর কাছে থেকে ব্রাহ্মণোচিত কিছু কিছু লেখাপড়া করবে আর তাঁর যজমানী কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করবে। কিন্তু নানা চেষ্টা করেও গদাধরের মন লেখাপড়ায় টানতে পারলেন না। একদিন রেগে গিয়ে তিনি কঠোরভাবে বললেন, কিছু লেখাপড়া না শিখলে ব্রাহ্মণের ছেলে খাবে কি করে?

ছোট ভাই জবাব দিলেন, দাদা, চালকলাবাঁধা বিদ্যে শিখতে আমার মোটে ইচ্ছে করে না।

—তবে কি করতে চাস?

—এমন বিদ্যে শিখব যাতে সত্যিকার জ্ঞান হয়। শেষে রামকুমার গদাধরের লেখাপড়া শেখার আশা মন থেকে মুছে দিলেন।

দিন যায়। রাসমণির লোকেরা নানা বিখ্যাত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ব্যবস্থা

নিলেন কিন্তু কারুর কাছ থেকে রানীর মনের মত বিধান পাওয়া গেল না। সকলেরই এক কথা, মাহিষ্যের পক্ষে দেবীকে অন্নভোগ দেওয়া অশাস্ত্রীয়। রানী মহা বিপদে পড়লেন। মন্দির নির্মাণের কাজ সব শেষ হয়েছে কিন্তু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার দেরি হয়ে যাচ্ছে। তিনি লোকদের আরও নতুন নতুন ব্রাহ্মণের কাছে বিধান নিতে বললেন। ক্রমে রামকুমারের কাছেও বিধান দেবার জন্য অনুরোধ এল। রামকুমার নানাভাবে বিচার করে বললেন, অন্নভোগ দেওয়া যেতে পারে, এ কাজ শাস্ত্রের দিক থেকে বিধিবিরুদ্ধ হবে না যদি প্রতিষ্ঠার আগে মন্দিরটি কোন ভাল ব্রাহ্মণের নামে দানপত্র করে উৎসর্গ করা হয়। এই বিধান পেয়ে রাসমণি খুব খুশী হলেন। প্রাণের ইচ্ছা বুঝি বিফল হয়—এই ভেবে এতদিন যে মর্মপীড়া অনুভব করছিলেন আজ সে যন্ত্রণার অবসান হল। অপরে যাই বলুক, তিনি রামকুমারের বিধান অনুযায়ী নিজ গুরুর নামে ঠাকুরবাড়ি উৎসর্গ করে মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করলেন। কিন্তু কোথায় পাবেন মনোমত পুরোহিত? কে এমন উদারচেতা শাস্ত্রজ্ঞ, সাধক ব্রাহ্মণ আছেন যিনি তাঁর দান গ্রহণ করে কালীবাড়িতে পূজার ভার নেবেন? রানীর অনুচরেরা নানাদিকে সন্ধান করতে লাগলেন। কোথাও মনের মত লোককে রাজী করানো গেল না। শেষে নিরুপায় হয়ে একজন অনুচর এসে আবার হাজির হলেন রামকুমারের কাছে, সঙ্গে রানীর সনির্বন্ধ অনুরোধ পত্র, আপনি অনুগ্রহ করে বিধান দিয়েছেন, সেই মত আয়োজন করেছি। অনুগ্রহ করে প্রতিষ্ঠা দিবসের সকল ভার গ্রহণ করুন। তা না হলে আমার সকল আয়োজন পণ্ড হয়ে যায়।

রামকুমারের গোঁড়ামি ছিল কিন্তু তার ফলে সঙ্কীর্ণতা জন্মাতে পারে নি। সহজ উদারতার দীপ্তিতে তাঁর হৃদয় ভরে ছিল। রানীর অসহায় অবস্থা দেখে তিনি প্রতিষ্ঠা দিবসে এসে পুরোহিতের সব ভার নিলেন। সঙ্গে এলেন গদাধর। তিনি বড় ভাইএর কাছে ইতিমধ্যে কিছু কিছু পুরোহিতের কৃত্য শিখেছিলেন। রামকুমার হয়ত ভেবেছিলেন, গদাধর তাঁকে মন্দির প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবেন। কিন্তু ছোট ভাই সেদিন মন্দিরের কোন অনুষ্ঠানে যোগদান করলেন না। ক্ষুদিরামের নিষ্ঠার কথা স্মরণ করে তিনি রাসমণির পৌরহিত্য গ্রহণে রামকুমারকে মনে মনে একটুও সমর্থন করতে পারেন নি। এমন কি সেদিন মন্দিরের প্রসাদ বা অন্য খাবার কিছুই স্পর্শ করলেন না। কালীবাড়ির বাইরে থেকে মুড়ি কিনে খেয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিলেন।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মে তারিখে প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ হলে রাসমণির একান্ত পীড়াপীড়ি অগ্রাহ্য করতে না পেরে রামকুমার কালীবাড়িতে থেকে গেলেন এবং শ্রীশ্রীভবতারিণী বিগ্রহের পূজকের চাকরি নিলেন। দিন সাতেক পরে ঝামাপুকুর থেকে এসে গদাধরও দক্ষিণেশ্বরে দাদার সঙ্গে বাস করতে লাগলেন।

রানীর সকল কাজে সহায় ছিলেন তাঁর জামাতা শ্রীমথুরামোহন। তিনি সুপুরুষ, সংস্কৃতিবান্ এবং কর্মকুশল ছিলেন। নূতন কালীবাড়িতে প্রায়ই তিনি আসতেন। একদিন দেখতে পেলেন সৌম্য, সুঠাম, লাবণ্যভরা ঢলঢল মূর্তি গদাধরকে। দেখে তাঁর খুব ভাল লাগল। এমন কান্তি সহজে চোখে পড়ে না। বিষয়ী মথুর মুগ্ধ হলেন। তিনি রামকুমারকে ডেকে বললেন, আপনার ছোট ভাইকে দেবীর বেশকারীর কাজে লাগিয়ে দিন না।

রামকুমার এসে ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে, এ কাজ নিবি?

গদাধর শুনে ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগলেন। রামকুমার নানাভাবে বোঝালেন। কিন্তু পরের চাকরি করা,—অন্যের হুকুম মত কাজ করা! গদাধর মন্দিরে চাকরি করতে কিছুতেই রাজী হলেন না।

চাকরি না নিলেও তিনি কালীবাড়ি ছেড়ে দেশে চলে গেলেন না। গঙ্গানদী সম্বন্ধে সকল বাঙালী হিন্দুরই একটা মোহ আছে। সেই পবিত্র গঙ্গার তীরে প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে বিরাট মন্দির। প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্যভরা পরিমণ্ডল। এখানে থাকলে মন আপনা থেকে উদার চিন্তায় ভরে আসে। দিন দিন গদাধরের আকর্ষণ গভীরতর হয়ে উঠল।

কুলুকুলু শব্দে জাহ্নবী বয়ে যায়। ওপারের ঘন গাছের কোল ঘেঁসে দিগন্তে নেমে গেছে উদার আকাশ। স্থান মাহাত্ম্যে গদাধরের হৃদয়ের সহজ কামনা জাগ্রত হয়ে উঠল। তাঁর ইচ্ছা হল নিজের হাতে শিবমূর্তি গড়ে এখানে পূজা করবেন। অনেক দিন আগে ছেলে বয়সে তাঁর এ রকম ইচ্ছা জাগত। এক দিন নিজের হাতে এক শিবমূর্তি গড়লেন—হাতে ত্রিশূল আর ডমরু। অপরূপ মাধুর্যমাখা সেই মূর্তি। তন্ময় হয়ে পূজো করছেন এমন সময় বেড়াতে বেড়াতে মথুরামোহন এসে সেখানে উপস্থিত হলেন। সেই মনোরম শিবমূর্তি দেখে তিনি অবাক্ হয়ে গেলেন। গদাধর সেই মূর্তি গড়েছেন শুনে বিশেষ খুশী হলেন।

কিছুদিন পরে মন্দিরে পুনরায় বেড়াতে এসে তিনি গদাধরকে ডেকে পাঠালেন। গদাধর মনে মনে এই ভয়ই করছিলেন তাই এত দিন মথুরামোহন ও রানীকে যতদূর সাধ্য এড়িয়ে চলতেন। মথুরের লোক চলে গেলে তিনি ইতঃস্তত করতে লাগলেন। হৃদয় বলে তাঁর এক ভাগ্নে কিছুদিন আগে থেকে চাকরির সন্ধানে দক্ষিণেশ্বরে এসে তাঁদের কাছে ছিলেন। হৃদয় গদাধরকে খুব ভালবাসতেন। তিনি গদাধরকে বললেন, যাও না, যেতে আপত্তি কিসের?

—গেলেই ওঁরা আমাকে পীড়াপীড়ি করবেন, চাকরি নিতে বলবেন। আমি আর না করতে পারব না।

—চাকরি নিলে দোষ কি? ওঁরা মহৎ লোক। ওঁদের মত মহতের আশ্রয়ে থাকলে দোষের কি?

—চাকরি নিলে মন্দিরে দেবীর অঙ্গে যে সমস্ত গয়নাগাটি রয়েছে তার ভার নিতে হবে। ও সব আমার দ্বারা হবে না। তবে তুমি যদি সেই ভার নাও তাহলে পূজো করতে আমার আপত্তি নেই।

হৃদয়ের মুখে সব কথা শুনে মথুরামোহন তৎক্ষণাৎ গদাধরের প্রস্তাবে রাজী হলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যেই গদাধর কালীমন্দিরে বেশকারীর পদে নিযুক্ত হলেন। হৃদয় হল তাঁদের দু ভাইএর সহকারী।

এতদিনে গদাধরের জীবন গুহার বদ্ধ দ্বার খুলে গেল। তিনি বার হলেন তাঁর যাত্রা পথে। সে পথ বড় বন্ধুর। ফুলের পাপড়ি বিছানো তা নয়,—কাঁটায় কাঁটায় দুর্গম, কর্দমে পিচ্ছিল। তবু এই রাজপথেই যুগে যুগে মহাজনেরা লক্ষ্যসন্ধানে বার হয়েছেন। কে গদাধরকে এ পথের সন্ধান দিলে? তিনি এই লক্ষ্যের বীজ নিয়েই জন্মেছিলেন—লক্ষ্য সন্ধানে তাঁকে জীবনে বৃথা সময় নষ্ট করতে হয় নি। শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারে মানুষ হয়েছিলেন। ছোট বেলা থেকেই এই ধারণার পরিমণ্ডলে তাঁর দিন কেটেছিল যে সংসারে সকল পাওয়ার বাইরে এক চরম পাওয়া আছে। সেই স্পর্শমণি লাভ না করলে আর যা কিছু সবই মূল্যহীন। এই সৃষ্টির আদিতে যিনি, অন্তে যিনি, এই চরাচরের জলে যিনি, অগ্নিতে যিনি, বনস্পতিতে যিনি, ওষধিতে যিনি—সব কিছুর মধ্যে যিনি, সব কিছুর বাইরে যিনি, তাঁকে জানা, তাঁকে পাওয়া সেই হচ্ছে সংসারের চরম পাওয়া। হিন্দু ব্রাহ্মণকুলের চিরাচরিত আদর্শ ছিল তাঁরও আদর্শ। যে যুগে তিনি জন্মেছিলেন তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে দেশে হিন্দুর চিরাচরিত আদর্শের সঙ্গে নব আদর্শের সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেছল। কিন্তু

তখনও সেই সংঘর্ষের সংস্পর্শ কামারপুকুরের মত শহর থেকে দূরের গাঁয়ে গিয়ে পৌছয়নি। গদাধর কামারপুকুর থেকে কলকাতায় এসেও সাধারণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন; তখনকার কলকাতার সমাজজীবনের যে উচ্চস্তরে এই সংঘর্ষ প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল তার সংস্রবে ঘনিষ্ঠ-ভাবে আসতে পারেন নি। পরে একদিন অবশ্য এই সংঘর্ষে ব্যাকুল মানুষ-গোষ্ঠী শ্রীরামকৃষ্ণের সিদ্ধির মধ্যে আপনাদের মুক্তির সন্ধান পেয়েছিল। সেদিক থেকে বিচার করলে মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ এই সংঘর্ষের প্রত্যক্ষ সৃষ্টি নন,—বরং এর মুক্তিদাতা। তাঁর প্রথম জীবনের কোন অধ্যায়েই—তাঁর মনোবিকাশের কোন স্তরেই এই সংঘর্ষ তাঁকে স্পর্শ করতে বা প্রভাবান্বিত করতে পারে নি। বিবেকানন্দের মত আদর্শের দ্বন্দ্বের ঘাতপ্রতিঘাতে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে কোন দিন লক্ষ্যপথের সন্ধান করে ঘুরে মরতে হয় নি। সে যুগের যত কিছু ব্যর্থতা ও অভীপ্সায় ভরা ছিল স্বামীজীর মন,—তিনি যেন তাঁর কালের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষটির সৃষ্টি যুগাতীত,—কোন কালের সীমায় তা সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলাদেশের উনবিংশ শতাব্দী তাঁর সাধনার ক্ষেত্র সৃষ্টি করে দিয়েছিল, তাঁর শেষজীবনের সিদ্ধিকে মুক্তির মন্ত্র হিসাবে পরম আগ্রহে গ্রহণ করেছিল কিন্তু তাঁর চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে মূলতঃ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

*

* *

বিগ্রহের পূজার ভার পেয়ে গদাধরের জীবনে ঘটল এক মহা পরিবর্তন। তিনি এর আগেও ধ্যান জপ ও পূজাআহ্নিকাদি নিয়মিত কৃত্য করতেন বটে কিন্তু তার মধ্যে বিশেষ কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকত না। বালসুলভ আগ্রহে কর্তব্য যথারীতি সম্পাদন করেই সন্তুষ্ট হতেন। এতদিন দেবপূজা তাঁর ইচ্ছা-ধীন ছিল এবার কালীঘরের পূজাই তাঁকে পেয়ে বসল। পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি নিত্যকৃত্য সম্পন্ন করতে লাগলেন। পূজা করতে করতে তিনি তন্ময় হয়ে পড়তে লাগলেন। এই তন্ময়তা তাঁর জীবনে এক নতুন জিনিস। শুধু সংস্কৃত মন্ত্র পড়ে তাঁর তৃপ্তি হত না। জন্মের সঙ্গে তিনি পেয়েছিলেন মধুর কণ্ঠ। সেই কণ্ঠ অপরূপ হয়ে উঠেছিল পূজায় নতুনপাওয়া আনন্দের আবেগে। গদাধর মাতোয়ারা হয়ে বিগ্রহের সামনে বসে বসে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি ভক্তদের লেখা গান গাইতেন,—সেই গানের মধ্যে ঢেলে দিতেন

নিজেকে, আত্মহারা হয়ে আপনাকে ভুলে যেতেন। গান আর গান থাকত না, তা হয়ে যেত যেন তাঁর নিজেরই অন্তরের ভাষা। গানের ভাবের সঙ্গে তিনি নিজেকে এক করে দিতেন।

এমনি ভাবে দিন যায়। রামকুমার সবই লক্ষ্য করেন। ছোট ভাইএর নিষ্ঠা ও দক্ষতা দেখে তাঁর খুব আনন্দ হয়। তিনি ক্রমে তাঁকে চণ্ডীপাঠ, কালীপূজা ও অন্যান্য পূজাপ্রকরণ শেখাতে লাগলেন। গদাধর একে একে দশকর্মান্বিত ব্রাহ্মণের শিক্ষণীয় সবই শিখে ফেললেন। কিন্তু শাক্তী দীক্ষা গ্রহণ না করে শক্তিপূজা করা উচিত নয়। রামকুমারের পরিচিত একজন প্রাচীন শক্তি-সাধকের কাছে গদাধর শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন। দাদা বুড়ো হয়ে গেছলেন। সে বয়সে দেবীপূজার সমস্ত কৃত্য করা সহজসাধ্য নয়। তাই এক একদিন দাদার বদলে গদাধর দেবীপূজা করতে লাগলেন। শেষে দাদার শরীর আরও অপটু হলে মথুরামোহনের অনুরোধে গদাধর দেবীপূজার পুরো ভার গ্রহণ করলেন। এর কিছুদিন পরে রামকুমার জীবনের শেষ দিনগুলি দেশে কাটাবার উদ্দেশ্যে চাকরি থেকে বিদায় নেবার ব্যবস্থা করলেন। বাড়িতে যাবার উদ্যোগ করছেন, হঠাৎ একদিন তাঁর জ্বর হল। সেই জ্বর আর ভাল হল না, দক্ষিণেশ্বরেই তিনি দেহ রাখলেন। তখন ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ।

গদাধরের জীবনে বড় ভাই ছিলেন পিতার তুল্য। ছোটবেলা থেকে বাবার স্নেহ বেশি দিন তাঁর অদৃষ্টে ঘটে নি। দাদাই তাঁকে প্রতি-পালন করেন, দাদাই ছিলেন তাঁদের সংসারের একমাত্র নির্ভর। রাম-কুমারের মৃত্যুতে গদাধরের অন্তরে গভীর আঘাত লাগা স্বাভাবিক। বোধশক্তি উদয়ের পর জীবনে এই তাঁর প্রথম মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয়। স্বভাবতঃ উদাসীন গদাধর শোকে মুহ্যমান না হয়ে আরও আধ্যাত্মিক ভাবের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, মানুষের জীবন—এ ত মধুর খেলা নয়। এখানে বারেবারেই বাতি নেবে, বারেবারেই ঝড়ের রাতি গর্জে আসে। তবু রুদ্রের ভালবাসায় অবহেলা নেই, আঘাত দিয়েই তিনি মানুষকে জাগান, কান্নার পথে আসে তাঁর পরম আহ্বান। দুঃখই তাঁর প্রিয় দূত।

রামকুমারের শোকে গদাধরের মন ব্যক্তিগত সাধনার মধ্যে গভীরভাবে নিবিষ্ট হয়। দুঃখ তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছিল নিজের মধ্যে। দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে পূজা ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয় তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার আকারে। এতদিন মন্দিরের দেবীমূর্তিকে তিনি মৃণ্ময়ী জগজ্জননী রূপে পূজা করতেন। ক্রমশঃ সেই মূর্তি হয়ে পড়ল তাঁর চিন্ময়ী ইষ্ট দেবী। শুধু পূজার সময়টুকুতেই মন্দিরের বিগ্রহের পূজা করা যায় কিন্তু ইষ্টদেবীর আরাধনা যে আটপ্রহরের পূজা। তাতে যে মুহূর্তের বিরাম সহ্য হয় না। ইষ্টদেবীর চিন্তা ছাড়া জীবন যে মরুভূমির মত শূন্য বোধ হয়। গদাধর দিন দিন ইষ্টদেবীর আরাধনায় তন্ময় হয়ে পড়লেন। এক থেকে একে ক্রমশঃই তাঁর জীবনশতদলের দলগুলি বিকশিত হয়ে উঠছে,—প্রথম স্তরের এই বিকাশ এত তাড়াতাড়ি ঘটছিল যে বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। রানী রাসমণির কালীমন্দির আর রানীর রইল না, তা পরিণত হল গদাধরের ব্যক্তিগত সাধনার ক্ষেত্রে। বিগ্রহপূজা আর তাঁর কাছে শুধু কর্তব্যভার রইল না,—হয়ে পড়ল সাধনার অঙ্গ।

এ সময়ে সংসারের আর কোন চিন্তা তাঁর মধ্যে ছিল না, শুধু মা,—চিন্ময়ী, বিশ্বপালিনী মা। সারাদিন পূজা, গান, আধ্যাত্মিক আলোচনায় নিজেকে

ডুবিয়ে রেখেও তাঁর মন তৃপ্ত হত না। তখন কালীবাড়ির এক প্রান্তে পঞ্চবটীর পাশে ছিল উঁচুনীচু জমি আর বুনো গাছগাছড়ার বন। তার এক কোণে ছিল একটি আমলকী গাছ। আগে সেখানে ছিল কবর দেবার জায়গা। তাই সেখানে দিনের বেলাও বড় একটা কেউ যেতে চাইত না। গদাধর রাত্রে সকলের অজ্ঞাতে একলা সেই আমলকীতলায় নিরিবিলিতে এসে জপে ধ্যানে কাটাতে লাগলেন।

বয়স তাঁর কুড়িবাইশ, মন কিন্তু এখনও ছোট ছেলের মত। যে আধ্যাত্মিক সাধনায় তিনি রত তার কত পথ—কত মত। গদাধর বালকসুলভ আগ্রহে সে সব চিন্তা করে ভয় পেতেন না, একাই সেই দুর্গম পথে বার হয়েছিলেন। তিনি কারুর কাছে পরামর্শও চাইতেন না, কারুর সঙ্গে সবিশেষ আলোচনাও করতেন না। হিন্দু সংস্কৃতির প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী আপন মনে সাধনা করতেন। ভাগ্নে হৃদয় কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছিলেন, মামা রোজ রাত্রে পঞ্চবটীতে চুপি চুপি চলে যান। কয়েকদিন চুপিচুপি খোঁজ করার পর তিনি সবই ধরে ফেললেন। দিন দিন রাতজাগা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে গদাধরের শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। হৃদয় আর চুপ করে থাকতে না পেরে রাত্রে জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে ঢিল ছুঁড়ে গদাধরকে ভয় দেখাতে লাগলেন। তবুও গদাধর নিবৃত্ত হলেন না। হৃদয় একদিন উদ্বিগ্ন মনে এগিয়ে গিয়ে দেখেন, পরবার কাপড় ও গলার পৈতা ফেলে দিয়ে মামা উলঙ্গ হয়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন। সামনে গিয়ে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, এ সব কি হচ্ছে! পাগল হয়ে যাবে নাকি?

কয়েকবার ডাকাডাকির পর গদাধরের চৈতন্য হল। তিনি হৃদয়কে দেখে বললেন, তুই কি জানিস্? এই ভাবে সকল পাশ মুক্ত হয়ে ধ্যান না করলে কি কিছু হয়? ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাতিঅভিমান—এই সব পাশে মানুষের জীবন জন্ম থেকে বাঁধা। পৈতাটা আমি ব্রাহ্মণ, বর্ণের গুরু—এই অভিমানের চিহ্ন। মাকে ডাকতে হলে এসব পাশ ফেলে দিয়ে এক মনে ডাকতে হয়। তাই ও সব খুলে রেখেছি। ধ্যান করা শেষ হলে আবার ও সব পরব।

গদাধর জানতেন, লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে সাধন চাই। "ঘরের ভিতরের রত্ন যদি কেউ নিতে চায় তাহলে পরিশ্রম করে চাবি এনে দরজার তালা খুলতে হয়। তা না হলে তালা দেওয়া ঘর, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে 'এই দরজা খুললুম,

সিন্দুকের তালা ভাঙলুম, রত্ন বার করলুম' ভাবলে ত হয় না।" গদাধর জীবনের সব কিছু দিয়ে রত্নলাভের সাধনায় মগ্ন হলেন।

ক্রমে তাঁর দেবীপূজার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল। উত্তরোত্তর বাহ্য নিষ্ঠার স্থানে তন্ময়তা প্রকট হয়ে উঠল। সকল মূর্তির মধ্যে যে মূর্তিহীন রয়েছেন এবার তাঁর আরাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। আগে তিনি পূজায় যে সব খুঁটিনাটি কৃত্য শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে সম্পন্ন করবার জন্য উদ্বিগ্ন হতেন এখন তার অনেক কিছুই ভুল হতে লাগল। পূজা করতে বসে যথাবিধি মাথায় ফুল দিয়ে ধ্যান করতে করতে হয়ত ঘণ্টা কেটে যেত। ভোগ নিবেদন করে মা সত্যিসত্যিই স্বাদ গ্রহণ করছেন ভেবে স্থির হয়ে বসে অপেক্ষা করতেন,—কতক্ষণ কেটে যেত হুঁশ থাকত না। সকালে ফুল তুলে মালা গেঁথে আপন মনে দেবীকে সাজাতেন—এক এক দিন তাঁর তন্ময়তা আর যেন ভাঙত না, পূজার সময় বয়ে যেত। মনে তাঁর গভীর ব্যাকুলতা। হৃদয়ে তীব্র ভক্তি। মুখে কেবলই 'মা মা' নাম। জীবনে যেন আর কোন কামনা নেই, আর কোন বাসনা নেই। শুধু এক আকাঙ্ক্ষা:

"আমায় দে মা পাগল করে (ব্রহ্মময়ী);
আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।
তোমার প্রেমের সুরা
পান করে মাতোয়ারা।
ওমা ভক্তচিত্তহরা,
ডুবাও প্রেম সাগরে।"

দেবী বিগ্রহের সামনে গান করতে করতে তিনি আত্মহারা হয়ে চিৎকার করে উঠতেন, মা, আমাকে দেখা দে। রামপ্রসাদকে তুই দেখা দিয়েছিলি তবে আমায় কেন দিবি না? আমি ধন চাই না, মান চাই না, ভোগসুখ কিছু চাই না, শুধু আমায় দেখা দে। আবেগে চোখ বেয়ে তাঁর হু-হু করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত।

দিনের পর দিন এমনি দিব্য ব্যাকুলতায় কেটে যায় তবু মায়ের দেখা মেলে না। বিকালে মন্দিরের সামনে গান করতে করতে পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যায়। সন্ধ্যার শাঁখ বাড়িতে বাড়িতে বেজে ওঠে। আরতির সময় বয়ে যায়—গদাধরের হুঁশ নেই। তিনি আপন মনে মায়ের ভজন গেয়ে চলেছেন কখনও বা হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন, আর একটা দিন যে চলে গেল মা, তুই ত দেখা দিলি না?

তবু তাঁর মনে আশা মরে না। সে যে আসে—এমনি করেই আসে। ব্যথায় রাঙা তাঁর যে আসার পথ। অকূল পারাপারের তীরে একদিন তাঁর সাধনার তরী ভিড়বেই, তাঁর জীবনের চরম ক্ষণে সকল কাঁটা ধন্য হয়ে ডালে ডালে ফুল ফুটবেই।

কখন কখন মনে আবার সংশয় জাগে, তবে কি সব মিথ্যে! এত আশা,—এত চোখের জল, এর পরিণাম কি কিছু নেই। কাণ্ডারী, তোমায় আমায় মিলন হবে বলে যুগে যুগে জীবনের কতই না আয়োজন—সে সব কি আজ হবে বৃথা! এ কি শুধু অনাদি স্রোতে আশার তরণী বেয়ে যাওয়া,—এ বুকভরানো ব্যথার কি কোন কূল পাওয়া যাবে না! ওগো অন্তর্যামী, সাধনার বল আমার নেই। আমি পথ জানিনে, ভিতর বাহির আজ আমার কালোয় কালো। আমি তোমার শরণাগত। এই গভীর অন্ধকারের মধ্যে তুমি এসে হাত ধর, আমার হৃদয়ে তোমার পরশ দাও।

সেদিনটা সারাক্ষণ কেঁদে কেঁদেই গদাধরের কেটেছে। বিকালে পরম আগ্রহে জগদম্বাকে গান শোনাচ্ছেন,

"সেদিন কবে বা হবে?
হরি বলতে ধারা বেয়ে পড়বে।
সেদিন কবে বা হবে?........."

বুকের ভিতরে তীব্র আকুলিবিকুলি। মনে একান্ত ভয়, এ জীবনে বুঝি তাঁরে পাওয়া হল না,—সাধনার আকাশে সকল অন্ধকার ভেদে বুঝি আলোর দেখা মিলল না। দূর বুঝি চিরকাল দূরেই রয়ে গেল। না-পাওয়ার যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করে উঠলেন। ভাবলেন, এত ডাক সবই বৃথা হল! তবে আর এ জীবনে আবশ্যক কি! এই মুহূর্তেই এর শেষ হোক্। সামনে বিগ্রহের হাতে ছিল অসি। পাগল গদাধর আত্মহত্যার জন্য ছুটে গেলেন সেই অসি নিতে। সহসা এ কি হল! কি এ? কে এ? ঘর, দ্বার, মন্দির—সব যেন কোথায় মিলিয়ে গেছে। চারিদিকে কিছু নেই,—শুধু আছে অসীম, অনন্ত জ্যোতিঃ-সমুদ্র। যত দূরে দৃষ্টি যায় শুধু জ্যোতিঃর অসংখ্য তরঙ্গমালা—উত্তাল, উচ্ছল। তারা একটির পর একটি যেন হাত তুলে তুলে ছুটে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে সেই তরঙ্গদল দিক্‌বিদিক আচ্ছন্ন করে ফেললে। সেই দিব্য জ্যোতিঃর বন্যা-স্রোতে গদাধর যেন তলিয়ে গেলেন। নেই, নেই, আর কিছু নেই। চারিদিকে শুধু চিদ্‌ঘন পরমানন্দ।

বেহুঁশ গদাধরের যখন চৈতন্য হল তখন তিনি 'মা মা' বলে কাতর কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন। এমনি বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থায় দুদিন কেটে গেল, ছবির মত কোথা দিয়ে যে কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারলেন না। সারা দেহমন ভরে জমাটবাঁধা আনন্দের হিল্লোল।

তারপর সেই অবস্থা দূর হল। আবার ফিরে এল আগেকার দুঃসহ ব্যথা। রূপসাগরে ডুব দিয়ে তিনি অপরূপের সন্ধান পেয়েছেন, এবার তাঁর অন্তরের ব্যাকুলতা আরও বেড়ে গেল। বিরাট আকাশ তাঁর জীবননদীর বুকে স্পর্শ দিয়ে গেছে, সেই বিরাটকে ছাড়া তাঁর দিন এবার কেমন করে কাটবে? কেবলই তিনি আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন, ক্ষণিকের দেখা দিয়ে মা তুই লুকালি কেন, আবার আমায় দেখা দে।

"কোন আলোতে আশার প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস।
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো ধরায় আস।
এই অকুল সংসারে
দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝঙ্কারে।
ঘোর বিপদ মাঝে
কোন জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাস।
তুমি কাহার সন্ধানে
সকল সুখে আগুন জেলে বেড়াও কে জানে।
এমন ব্যাকুল করে
কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালবাস?"*

*রবীন্দ্রনাথ।

দিব্য উন্মাদনা

এই অভিজ্ঞতার পর গদাধরের অন্তর্জীবনে দেখা দিল বিকাশের নতুন স্তর। ইষ্টচরণে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পন করলেন। অহংবোধের লয় না হলে সাধনার পথে এগিয়ে যাওয়া যায় না। "বাছুর হাম্বা হাম্বা করে, তাই এত যন্ত্রণা। কসায়ে কাটে, চামড়ায় জুতা হয়। আবার ঢোলঢাকের চামড়া হয়। সে ঢাক কত পেটে, কষ্টের শেষ নেই। শেষে নাড়ী থেকে তাঁত হয়, সেই তাঁতে যখন ধুনুরীর যন্ত্র তৈয়ার হয় আর ধুনুরীর তাঁতে তুঁহু, তুঁহু বলতে থাকে তখন পায় নিস্তার। তখন আর হাম্বা, হাম্বা—আমি, আমি বলে না, বলে তুঁহু, তুঁহু —তুমি, তুমি। অর্থাৎ তুমি কর্তা, আমি অকর্তা, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র, তুমিই সব।" এবার গদাধরের সব আত্মনির্ভরতা,—সব অভিমান দূর হল, এখন মা-ই যন্ত্রী, তিনি তাঁর হাতের যন্ত্র মাত্র। এখন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, তিনি শিশু, মা-ই সব। পূজায় বসে তিনি দেখতে লাগলেন, জ্যোতির্ময়ী জননী যেন হাসছেন, যেন কথা বলছেন, যেন তাঁকে সস্নেহে নির্দেশ দিচ্ছেন, এটা কর্, ওটা করিস্ নি বাবা। তিনি বালকের মত প্রার্থনা করে বলতে লাগলেন, মা, আমার যেন কি হচ্ছে, কিছুই বুঝি না। তোকে ডাকবার মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি না। যা করলে তোকে পাওয়া যায় তা আমায় শিখিয়ে দে। তুই বই আর যে আমার কেউ নেই, মা।

পূর্ণ আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তন্ময়তা আরও গভীর হয়ে উঠল। কেবল ইষ্টদেবীর চিন্তাতেই তাঁর দিবারাত্রি কাটতে লাগল। তাঁর দিব্যোন্মাদ অবস্থা হল। মুখে তাঁর কেবলই এক প্রার্থনা, মা, আমি তোমার শরণাগত, শরণাগত। দেহ সুখ চাই না। লোকমান্য চাই না। অষ্টসিদ্ধি চাই না। কেবল এই কর যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়,—নিষ্কাম, অমলা, অহেতুকী ভক্তি। আর যেন মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। তোমার মায়ার সংসারের কামিনীকাঞ্চনের উপর ভালবাসা যেন কখনও না হয়। আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, কৃপা করে শ্রীপাদপদ্মে আমায় ভক্তি দাও।

আগে গভীর ধ্যানের সময় বা পূজা করতে বসে দেখতেন, সামনের পাষাণময়ী বিগ্রহে জাগ্রত বিশ্বজননী এসে আবির্ভূত হয়েছেন। এখন আর পাষাণ-

ময়ীকে মোটেই পাষাণময়ী বলে অনুভব করতে পারতেন না। বিগ্রহ চোখে পড়বামাত্র মনে হত, সমগ্র বিশ্বজগৎ তাঁর চৈতন্যের দীপ্তিতে প্রাণময়, তিনিই চিদ্‌ঘন মূর্তি পরিগ্রহ করে সামনে বিরাজিত রয়েছেন। বালকের মত বিশ্বাসে তিনি বিগ্রহের নাসিকায় হাত দিয়ে দেখতেন, সত্যিসত্যিই নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে। কখন বা নিজের ঘরে বসে আছেন, হঠাৎ শুনতে পেতেন, মা পাঁই-জোর পরে ছোট মেয়ের মত আনন্দে ঝম্‌ঝম্ শব্দে মন্দিরের উপর তলায় উঠছেন। কখন বা দেখতেন, মা মন্দিরের উপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন, মাথার চুল খোলা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি গঙ্গা দেখছেন।

সেবক হৃদয় মামার এই দিব্যোন্মাদ অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। গদাধর আর আগের মত সুস্থির চিত্তে মন্দিরের পূজা করতে পারতেন না—শাস্ত্র-নির্দিষ্ট অনেক কৃত্যই অসম্পন্ন থেকে যেত। কখন তিনি জবাবিল্ব দিয়ে পূজার অর্ঘ সাজিয়ে নিজের মাথা, বুক প্রভৃতি অঙ্গে ঠেকাতে ঠেকাতে নিজের পায়ে ঠেকিয়ে ভবতারিণীর পাদপদ্মে অঞ্জলি দিতেন। কখন পূজাসন ছেড়ে সিংহাসনে উঠে সস্নেহে বিগ্রহের চিবুক ধরে আদর করতেন, এক মনে কত যেন কথা বলতেন। কখন মূর্তির হাত ধরে বেহুঁশ ভাবে নাচতেন। কখন বা ভোগ-নিবেদনের সময় থাল থেকে অন্নব্যঞ্জনের গ্রাস তুলে বিগ্রহের মুখে দিয়ে বলতেন, খা মা, খা, বেশ করে খা; তারপর খেয়াল হত, মায়ের সঙ্গে ছেলেরও খাওয়া উচিত। সম্পূর্ণ সরল ভাবের প্রেরণায় তিনি বলতেন, আমি খাব, আচ্ছা খাচ্ছি। তারপর সেই ভোগের স্বাদ নিজে গ্রহণ করে আবার বিগ্রহের মুখে দিতেন। একদিন ভোগের সময় কালীঘরে একটা বিড়ালকে ডাকতে শুনে 'ভোগ খাবি মা' বলে তাকেই ভোগের অন্নব্যঞ্জন খাওয়াতে লাগলেন। আর একদিন রাত্রে বিগ্রহকে শোয়াতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর মনে হল, মা যেন তাঁকে কাছে শুতে বলছেন। অবোধ বালক পরম আনন্দে বিগ্রহের রূপার খাটের উপর গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

পূজার এই সব অপ-আচার দেখে হৃদয় ভয় পেয়ে গেলেন। জানাজানি হয়ে গেলে হয়ত গদাধরের মন্দিরে থাকা অসম্ভব হবে। দুশ্চিন্তায় তাঁর দিন কাটতে লাগল। কিন্তু যাঁকে নিয়ে এই দুশ্চিন্তা তাঁর এ সব দিকে মোটেই হুঁশ ছিল না। জীবনে তাঁর এসেছে নব অনুরাগের বিপুল বন্যা। আজ তাঁর অপরূপ পৃথিবীতে আছেন শুধু তিনি আর তাঁর মা। অপরের চিন্তা তাঁর কাছে অর্থহীন। অসঙ্কোচ তাঁর ব্যবহার, নির্ভীক তাঁর ভাব। ইষ্টদেবীকে নিয়ে

তিনি দিবারাত্রি মাতোয়ারা। সকালে বিগ্রহের মালা গাঁথবার জন্য ফুল তুলতে গিয়ে কার সঙ্গে কথা যেন আর তাঁর ফুরোয় না। কখন হাসেন, কখন রঙ্গ করেন, কখনও আব্দার করে কথা বলেন। রাতে ঘুম নেই। ভাবের ঘোরে কখন গান করছেন, কখন জপধ্যানে মগ্ন, কখনও বা অদৃশ্য কার সঙ্গে যেন তন্ময় হয়ে কথা বলছেন। আপনাকে আজ শেষ করে গদাধর নতুন করে আপনাকে ফিরে পেয়েছেন। তাঁর চিরদিনের জানা পুরাতন পৃথিবী আজ বিদায় নিয়েছে, তিনি এসে হাজির হয়েছেন এক অপরূপ জগতে। সেখানে ক্ষণে ক্ষণে অজানার সঙ্গে বিরহ মিলনের নিত্যনতুন খেলা।

গদাধর ইষ্টপ্রেমে মাতোয়ারা তবু বিচার ভোলেন নি। সংসারের সব বাসনা বিসর্জন না দিতে পারলে কি সাধনায় সিদ্ধি পাওয়া যায়? কামিনীকাঞ্চনে মন মলিন হয়ে থাকলে চলবে কেন? এ সাধনা ত জানার সাধনা নয়,—এযে হওয়ার সাধনা। মন দিয়ে বুঝলেই তা সব সময়ে প্রাণ দিয়ে করা যায় না,—মানুষের মন যে নিয়ত চঞ্চল। সব পাওয়াকে যে নিঃশেষে মন থেকে মুছে দিতে না পারে তার জীবনে পরম পাওয়া দুর্লভ। গদাধর নিয়ত নিজেকে বোঝাচ্ছেন, বিষয়ানন্দের সত্যিকার কোন মূল্য নেই। কাঞ্চনে আসক্তি দূর করা চাই। তিনি এক হাতে টাকা আর এক হাতে মাটি নিয়ে গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে বারবার নিজেকে বোঝাতেন, মাটি টাকা, টাকা মাটি। তারপর হাতের মাটি ও মুদ্রা এক সঙ্গে গঙ্গার গর্ভে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। ঘৃণা, অভিমান, অহংকার—সকল ভাবকে জয় করাই তাঁর সাধনার অঙ্গ। কালীবাড়িতে রোজ কাঙালী ভোজন হত। গদাধর কোন কোন দিন কাঙালীদের খাবার পর তাদের ভুক্তাবশিষ্ট নির্বিকার চিত্তে পরিষ্কার করে আসতেন। ভগবানের দাস যিনি, তিনি দীনের চেয়েও দীন, সামাজিক আভিজাত্যের তিলমাত্র জ্ঞান থাকতে তাঁর পূর্ণ ভগবদ্ ভক্তি হতে পারে না।

এদিকে গদাধরের নিত্য পূজায় শাস্ত্রবিরুদ্ধ অনাচার কালীবাড়ির কর্মচারীদের চোখে পড়ল। দেবতার প্রতি অপরাধের পরিণাম সম্বন্ধে অপদেবতার বাহনেরা আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। এমন ভয়ঙ্কর অনাচার ত চুপ করে সহা যায় না। অতিউৎসাহী কোন কর্মচারী কলকাতার জনবাজারে মথুরামোহনের কাছে খবর পাঠালেন। চিঠি পড়ে তিনি দুঃখিত হলেন। গদাধরের অঙ্গে অঙ্গে কেমন যেন একটা দিব্য ভাব ছিল, তা দেখে তিনি প্রথম সাক্ষাতেই ওঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। তারপর ওঁর নির্ভীক, নির্লোভ চালচলন

দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি। তিনি ছিলেন সেকালের ইংরেজী পড়া লোক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহপাঠী, কার্যকুশলী এবং বিষয় পরিচালনে বিশেষ দক্ষ। স্বভাবতঃ তাঁর কোন বিশেষ ধর্মানুরাগ ছিল না তবু রানী রাসমণির আদর্শ ও মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আন্তরিকতার অভাব ছিল না। মন্দিরের কাজে অনাচারের খবর শুনে উদ্বিগ্ন হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি গদাধরের সম্বন্ধে কিছু হঠকারিতা করতে রাজী হলেন না। ভাবলেন, সব কিছু নিজের চোখে দেখে তারপর যা দরকার ব্যবস্থা করবেন। কয়েক দিন পরে গদাধর তখন আপন মনে মন্দিরে পূজো করছেন এমন সময়ে কারুকে কোন খবর না দিয়ে মথুরামোহন সোজা মন্দিরের দরজায় এসে হাজির। গদাধর তখন মাকে নিয়ে তন্ময়,—আশেপাশে কে এল, কে তাঁকে লক্ষ্য করলে সে বিষয়ে কোন হুঁশ নেই। মথুরামোহন একান্তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রেমভক্তিসার অদ্ভুত পূজাপ্রণালির সব কিছু দেখলেন। দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন। তাঁর সারা দেহে অকপট আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন, গদাধর জগন্মাতার কৃপালাভে ধন্য হয়েছেন। এ ত অনাচার নয়,—এই ত সত্যিকার পূজা। তাঁদের এতদিনের সাধ আজ সফল হয়েছে। মন্দিরে মা জেগেছেন। মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে সার্থক। বৈধী ভক্তির বিধিবদ্ধ সীমা ছাড়িয়ে এখন গদাধরের মন অহেতুকী প্রেমভক্তির উচ্চ স্তরে উঠেছে। আনন্দ-বিহ্বল অন্তরে মথুরামোহন বাড়ি ফিরে গেলেন। পরের দিন কালীবাড়ির প্রধান কর্মচারীর কাছে আদেশ এল, ভটচাযমশাই যে ভাবেই পূজো করুন না কেন, তাঁকে কেউ যেন বাধা না দেয়।

রামকৃষ্ণলীলাকাহিনীতে মথুরামোহনের নাম চিরদিন উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি জন্মেছিলেন তখনকার ধনী, বিষয়ী, ইংরেজীপড়া, অভিজাত সমাজে। গদাধরের সঙ্গে কোথাও তাঁর মিল ছিল না। তবু আশ্চর্যের কথা, তিনি ক্রমশঃ গদাধরের একান্ত অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর এই অনুরাগ অকপট ছিল। গদাধরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সাধনার সুবিধার জন্য তিনি শুধু অকুণ্ঠিতভাবে অর্থব্যয় করতেন না, খুঁটিনাটি বিষয়ে নিজে তদারক করতেন। এ কাজে তিনি এক আলৌকিক আনন্দ অনুভব করতেন। এই অনুরাগ অন্ধ ছিল না। প্রথমে তিনি নানাভাবে গদাধরকে পরীক্ষা করে-ছিলেন। কিন্তু যতই এই অলৌকিক মানুষটির গুণাবলীর পরিচয় পেয়েছিলেন ততই তাঁর বিশ্বাস অটুট হয়ে উঠেছিল।

মথুরামোহনের মুখে অদ্ভুত পূজার কথা শুনে রাসমণি কালীবাড়িতে এসে হাজির হলেন। তিনি বিশেষ ভক্তিমতী ছিলেন। গদাধরের মধুর কণ্ঠের ভক্তিমাখা গান শুনে তাঁকে আগে থেকেই বিশেষ স্নেহ করতেন। আজ তাঁর দিব্য উন্মাদনার অবস্থা দেখে রাসমণির আনন্দের সীমা রইল না।

কিছু দিন পরে হঠাৎ একটি অঘটন ঘটল। রানী একদিন মন্দিরে এসেছেন। বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারে মন তাঁর ভারাক্রান্ত। সামনে গদাধর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তাঁকে গান শোনাচ্ছেন। হঠাৎ কি মনে হল, তিনি উঠে গিয়ে রানীর গালে একটা চড় মেরে বলে উঠলেন, এখানেও ঐ চিন্তা।

পাশে যারা ছিল তারা সকলেই এ ব্যাপার দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। পাগল গদাধর নির্বিকার। শেষে রাসমণির পরিচারিকারা ও কালী-বাড়ির কর্মচারীরা পাগলকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য হৈচৈ করে উঠল। তাদের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে দরওয়ান ছুটে এল পাগলকে ধরবার জন্য। রাসমণি তা দেখে গম্ভীরভাবে বললেন, ভটচাযমশাইএর কোন দোষ নেই। তোমরা ওঁকে কেউ কিছু বলো না। রাসমণি বুঝতে পেরেছিলেন মন্দিরে বসে তিনি অন্যমনস্কভাবে বিষয় চিন্তা করছিলেন, মার নামগানে তাঁর মন ছিল না। তাই নিজের আচরণের কথা ভেবে তিনি মনে মনে অনুতপ্ত হয়েছিলেন।

এই ঘটনার কথা যখন মথুরামোহনের কানে গেল তিনি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি গদাধরকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর সত্যিকার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাঁর মনে হল, নবঅনুরাগের উৎসাহে গদাধর সীমার বাইরে চলে যাচ্ছেন। তিনি বিষয়ী লোক। তিনি জানেন, সব কাজে সীমা সম্বন্ধে সচেতন থাকাই সফল হওয়ার এক মস্ত বড় উপায়। গদাধরের আধ্যাত্মিক সাধনা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। মঙ্গল কামনার অনুপ্রেরণায় তিনি এসে গদাধরকে বললেন, যা রয় সয়, তাই করা ভাল। ভক্তিবিশ্বাস করাটা ভাল কথা, কিন্তু তা নিয়ে একেবারে আত্মহারা হলে চলবে কেন? তাতে বরং অনিষ্ট হবার বেশি সম্ভাবনা। প্রকৃতির নিয়ম মেনে আপনার চলা উচিত। স্বয়ং ভগবানকেও আইন মেনে চলতে হয়। তিনি যা নিয়ম একবার করে দিয়েছেন তা রদ করবার ক্ষমতা তাঁর নেই।

ভক্ত গদাধর বললেন, সে কি কথা? যার আইন, সে ইচ্ছে করলে তখনি তা রদ করতে পারে বা তার জায়গায় আর একটা আইন করতে পারে।

ইংরেজীজানা মথুরামোহন কিছুতেই এ যুক্তি মেনে নিলেন না। বললেন,

লাল ফুলের গাছে লাল ফুলই হয়, সাদা ফুল কখনও হয় না। কেননা, তিনি নিয়ম করে দিয়েছেন। কই, লাল ফুলের গাছে সাদা ফুল এখন তিনি করুন দেখি!

—তিনি ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন। লাল ফুলের গাছে সাদা ফুলও করতে পারেন।

—তা কখনও হয় না, বাবা।

পরের দিন গদাধর কালীবাড়ির কোণের জঙ্গল থেকে আসছেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন একটা লাল জবা ফুলের গাছে দুটি ফেঁকড়িতে দুটি ফুল ফুটে রয়েছে—একটি লাল আর একটি ধব্‌ধবে সাদা। তিনি ডালটি ভেঙে সোজা মথুরের সামনে এনে হাজির করলেন, বললেন, এই দেখ, লাল ফুলের সঙ্গে সাদা ফুল।

মথুর অবাক্ হয়ে জবাব দিলেন, হ্যাঁ, বাবা, আমার হার হয়েছে।

কিন্তু গদাধরের অনন্যসাধারণ ভগবদ্‌ভক্তির সঙ্গে যে সাময়িক বায়ু রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে এ বিশ্বাস তাঁর মন থেকে দূর হল না। যাতে সুস্থদেহে সংযত অবস্থায় গদাধর সাধনার পথে উত্তরোত্তর এগিয়ে যেতে পারেন তার জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। কলকাতা শহরের একজন নামজাদা কবিরাজ অনিদ্রা, বায়ুপ্রকোপ, গাত্রদাহ প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা করতে লাগলেন।

মথুর যে গদাধরের কত অকৃত্রিম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তা এই সময়ের আর একটি ঘটনায় পরিচয় পাওয়া যায়। রাসমণি ও মথুরের মনে ক্রমে দৃঢ় ধারণা হল, ভক্ত গদাধরের উন্মাদের মত ব্যবহার ও স্বাস্থ্যভঙ্গ কঠোর ব্রহ্মচর্যের ফল। তাঁরা জানতেন, এ বিষয়ে সোজাসুজি কিছু করলে নির্ভীক, সরল গদাধর কিছুতেই রাজী হবেন না। তাই নানা দিক ভেবে মথুর এক কৌশল করলেন। একদিন দু জন মেয়েলোককে টাকা দিয়ে ঠিক করলেন। তারা প্রলোভন দেখাবার জন্য কালীবাড়িতে গদাধরের ঘরে এসে হাজির হল। এ বিপদের দিনে ভক্তের মা ছাড়া আর কে সহায় আছেন! গদাধর তাদের দেখে ব্যাকুলভাবে 'মা, মা' বলে চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর সেই বুকফাটা ডাক শুনে মেয়েলোকেরা লজ্জায় পালিয়ে গেল।

আর একদিন কলকাতায় বেড়াতে নিয়ে যাবার অছিলা করে উঠলেন মেছুয়াবাজারের একটি বেশ্যালয়ে। আগে থেকেই কয়েকজন সুন্দরী মেয়েলোকের

সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক করা ছিল। মথুর গদাধরকে তাদের কাছে রেখে কৌশলে সরে পড়লেন। তাদের হাবভাব দেখেই গদাধর 'মা, মা' বলে ডাকতে লাগলেন। ডাকতে ডাকতে একেবারে তন্ময় হয়ে গেলেন। এ দৃশ্য মেয়েলোকেরা জীবনে কখনও দেখে নি। তারা আতঙ্কে বিস্ময়ে বারবার গদাধরের কাছে মাপ চাইতে লাগল।

মথুরামোহন বুঝলেন, এই অসামান্য সাধকের বায়ুরোগ এ পথে প্রশমনের কোন সম্ভাবনা নেই।

ক্রমশঃ নিত্য দেবীপূজা করা গদাধরের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। কিছুদিন থেকে তাঁর খুড়তুতো ভাই শ্রীতারক চট্টোপাধ্যায় কাজের সন্ধানে কালীবাড়িতে এসে বাস করছিলেন। মথুর তাঁকেই পূজারী নিযুক্ত করলেন। তখন ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ।

গদাধরের মাতোয়ারা ভাব ক্রমে বেড়েই চলল। মথুরের ভক্তি কিন্তু কোন দিন শিথিল হয় নি। একদিন শিবমন্দিরে ঢুকে গদাধর শিবের স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে মেতে উঠলেন। শিবমহিমার বিরাট ভাবে তিনি বাহ্যজ্ঞান-শূন্যের মত হু-হু করে কাঁদতে লাগলেন আর বিগ্রহকে পরম আপন জনের মত জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, মহাদেব গো, তোমার গুণের কথা আমি কেমন করে বলব ?

অন্যান্য কর্মচারীরা তা দেখে বিরক্ত হল, কেউ টিপ্পুনি কাটল, ছোট ভটচায আজ দেখছি নিতান্ত বাড়াবাড়ি করছে।

সেদিন মথুর কালীবাড়িতে ছিলেন। গোলমাল শুনে তিনিও শিবমন্দিরে এসে হাজির। তাঁকে দেখে একজন কর্মচারী বলে উঠল, পাগলটাকে গলা ধরে বার করে আন নাহে কেউ। শেষে ও শিবের ঘাড়ে চড়ে না বসে !

মথুর বিরক্ত হয়ে বললেন, কে এখন ভটচাযমশাইকে ছুঁতে পারে দেখি— কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে ?

তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন, ভক্তিতে আত্মহারা ভক্ত কেমন করে প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করছেন।

অনেক ক্ষণ পরে দিব্যোন্মাদ প্রকৃতিস্থ হলেন। এত গভীর তন্ময়তা সত্ত্বেও নিজের সম্বন্ধে গদাধরের বিচার বোধ ক্ষুণ্ণ হয় নি। মথুরামোহনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বালকের মত সরল ভাবে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি আজ বেসামাল কিছু করে ফেলেছি কি ?

—না বাবা। তুমি স্তব পড়ছিলে। পাছে তোমায় কেউ বিরক্ত করে তাই আমি এখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম।

এদিকে কামারপুকুরে চন্দ্রমণির কাছে খবর পৌছল, গদাধর কাজ ছেড়ে দিয়েছেন, পাগলের মত হাসি কান্নায় তাঁর দিন কাটছে। রাতে ঘুম নেই, জেগে জেগে কার সঙ্গে নিয়ত কথা বলেন। চন্দ্রা বছর দুই আগে বড় ছেলেকে হারিয়েছিলেন। তিনি ভাবলেন, এবার উপদেবতার কোপে নয়নের মণি ছোটরও বুঝি প্রাণ যায়। শোকে দুঃখে দুশ্চিন্তায় অধীর চন্দ্রা গদাধরকে ব্যাকুলভাবে মিনতি জানালেন, বাবা, একবার তুমি দেশে এস, অনেকদিন তোমায় দেখি নি। বাবা, কখন কি ঘটে—আমার বড় ভয়। তুমি দুঃখিনীর ধন, তোমাকে দেখবার জন্য আমার মন বড় আকুল হয়েছে।

মায়ের অবস্থার কথা বিবেচনা করে গদাধর কিছু দিনের জন্য দেশে গিয়ে হাজির হলেন।

ছেলেকে দেখে মায়ের আগেকার সন্দেহ দৃঢ় হল। এ নিশ্চয়ই অপদেবতার অত্যাচার। ওঝা ডেকে ভূত ছাড়ানোর চেষ্টা করলেন। ওঝা পরীক্ষা করে বললে, এর ত কোন অসুখ করে নি।

—তবে ?

মায়ের মনের ভাবনা তবু দূর হল না। তিনি নিজেই গদাধরের চিকিৎসার ভার নিলেন। বায়ুরোগ হয়েছে অনুমান করে একান্ত যত্নে ছেলের সেবাশুশ্রূষা করতে লাগলেন। কয়েক মাস পরে গদাধরের উন্মত্তভাব একটু কমল। সময়ে খাওয়াদাওয়া করতে লাগলেন। লোকের সঙ্গে দিনের দিন ব্যবহারেও স্বাভাবিকতা ফিরে এল। মা ভাবলেন, বায়ুরোগ এবার ভাল হয়েছে।

তিনি জানতেন, গদাধর ছোটবেলা থেকে উদাসীন। ওকে সংসারী না করতে পারলে ফের সাধনায় মন দেবে, তারপর আবার বায়ুরোগ হবে। চন্দ্রা ও রামেশ্বর গোপনে পাত্রীর সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু মনোমত মেয়ে পাওয়া ভার। এদিকে দিন চলে যায়। হঠাৎ একদিন বিবাহের উদ্যোগের কথা গদাধরের কানে গেল। তিনি সব খবর শুনে মাকে বললেন, মিথ্যে এত খোঁজাখুঁজি করছ কেন? জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়িতে পাত্রী কুটো বেঁধে রাখা আছে, দেখগে যাও।

বিশ্বাস হয় না, তবু পরীক্ষার ছলে চন্দ্রা খোঁজ করলেন। শেষে প্রমাণ পাওয়া গেল গদাধরের কথাই ঠিক। রামচন্দ্রের বাড়িতে সকল দিক থেকে মনোমত পাত্রী পাওয়া গেল। কিন্তু তাঁর বয়স মাত্র পাঁচ বছর! গদাধরের বয়স তখন চব্বিশ। ১২৬৬ সালের (১৮৫৯ খ্রীঃ) বৈশাখ মাসে শুভ পরিণয় হয়ে গেল। চন্দ্রার বুক থেকে নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস পড়ল। স্ত্রী, সংসার এসব ছেড়ে ছেলে আর বিবাগী হতে পারবে না। এবার তিনি কঠিন বাঁধনে তাঁকে বেঁধেছেন। মাতৃস্নেহে বন্দী আর বন্ধন-পাশ কাটাতে পারবে না।

ক্রমে গদাধরের এক বছর সাত মাস কামারপুকুরে কেটে গেল। মায়ের স্নেহাশ্রয়ে একান্ত যত্নের ফলে তাঁর শরীর বেশ সুস্থ হয়ে উঠল। এক শুভদিনে তিনি দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

যাত্রা আরম্ভের মুহূর্তে চন্দ্রাদেবী ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করলেন। মায়ের

প্রাণে ভয় যে কিছুতেই মরতে চায় না। তবু গদাধর আর আগের মত নেই, অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে—এই কথা ভেবে তিনি সাহসে বুক বাঁধলেন।

যথা দিনে গদাধর এসে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলেন। গঙ্গার পুণ্য তীর, মায়ের মন্দির—পুরাতন পরিমণ্ডলে ফিরে এসে আবার পুরাতন ভাবের উদয় হল। চন্দ্রার সব আশা গেল ভেঙে। কয়েকদিন ভবতারিণীর পূজা করতে না করতেই আধ্যাত্মিক সাধনায় আবার গদাধর তন্ময় হয়ে পড়লেন। কোথাকার পাগল হাওয়া কি অজানা সুর আবার তাঁকে শুনিয়ে দিল। সে ডাকে মা, স্ত্রী, সংসার, কামারপুকুর সব আকর্ষণ ভেসে গেল। বুকের মাঝে আবার পুরাতন ব্যথার কমল উঠল ফুটে। যন্ত্রণায় অধীর হয়ে তিনি ডাকতে লাগলেন, মা, মা, মা।

দিব্য বিরহে তাঁর দিন কাটতে লাগল। ভাবের প্রাবল্যে তিনি শরীর সম্বন্ধে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। দিনে খাওয়া নেই, রাতে ঘুম নেই। চোখ পলক-শূন্য হয়ে গেল—সময়ে সময়ে এমন হয় যে চেষ্টা করলেও পাতা পড়ে না। বিষম গাত্রদাহ পুনরায় শুরু হল। সাধকের তাতে দুঃখ নেই। মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বেজে উঠত, ভাগীরথীর বুকে নেমে আসত অন্ধকার। তিনি হু হু করে কেঁদে উঠতেন, যা হবার হোকগে, শরীর যায় যাক্, তুমি কিন্তু আমায় ছেড় না মা। আমায় দেখা দাও, আমায় কৃপা কর। আমি যে মা তোমার পাদপদ্মে একান্ত শরণ নিয়েছি, তুমি ভিন্ন আমার যে আর অন্য গতি নেই।

আজ আর তাঁর চলার পথ অন্ধকার নয়,—তাঁর চিত্তে কিছুমাত্র দ্বিধা ও সংশয় নেই। মা ছাড়া এ সংসারে আর কোন সুখের বাসনা নেই। জীবনের সকল দ্বন্দ্ব, সকল সংশয়, সকল ভোগেচ্ছা তিনি মায়ের পাদপদ্মে বিসর্জন দিয়েছেন, এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।

দিন নেই, ক্ষণ নেই। সে কি তাঁর আকুল ক্রন্দন! তাঁকে দেখলেই মনে হত, তাঁর দেহমনের উপর দিয়ে যেন নিত্য বয়ে চলেছে কালবৈশাখীর ঝড়। সেই ঝড়কে রোধ করবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা তাঁর মধ্যে নেই। তিনি ত আর তিনি নেই। তিনি যে আজ মায়ের শরণাগত। পূর্ণ আত্ম-

নিবেদনের দিব্য আনন্দে তাঁর কাছে সকল ব্যথা মনে হতে লাগল পরম মধুর।

শেষে একদিন সে অবস্থারও পরিবর্তন হল! এক গোপন মুহূর্তে তিনি পেলেন মুক্তির পরম স্পর্শ। তাঁর আনন্দবিহ্বল মন যেন গেয়ে উঠল :

"আজ নয়ন মেলিয়া একি হেরিলাম
বাধা নাই কোন বাধা নাই
—আমি বাঁধা নাই।"

এতদিনে তৃষিত গদাধরের হৃদয় জুড়াল। আকাশভরা ভোরের আলোয় তাঁর তনুমন উঠল কানায় কানায় ভরে। চিন্ময়ী বিশ্বজননী অনন্ত স্নেহের ঝরনাধারায় ছাপিয়ে দিলেন তাঁর সাধনার মাটির কলসখানি।

কিন্তু তাঁকে পেয়েও যে হারাতে হয় বারেবারে। চিরবিরহের মধ্যে দিয়েই যে তাঁকে ফিরে ফিরে নতুনকরে পাওয়া। এক পাওয়াতে যে সাধকের মন চিরদিনের জন্য ভরে না। তাই ত দোঁহার কোলে দুজনে বসেই বিচ্ছেদের কথা ভেবে অশ্রুবিসর্জন করেন। দিব্যবিরহে গদাধর আবার কাতর হলেন।

"তোমায় নতুন করেই পাব বলে
হারাই ক্ষণে ক্ষণ,
ও মোর ভালবাসার ধন।
দেখা দেবে বলে তুমি
হও যে অদর্শন,
ও মোর ভালবাসার ধন।
ওগো তুমি আমার নও আড়ালের,
তুমি আমার চিরকালের,
ক্ষণকালের লীলার স্রোতে
হও যে নিমগন,
ও মোর ভালবাসার ধন।"

'তাঁর খবর নাই'

ভক্তদের মধ্যে দু জাতের স্বভাব দেখতে পাওয়া যায়—বিড়ালের ছা আর বানরের ছার স্বভাব। "বানরের ছা যো সো করে মাকে আঁকড়িয়ে ধরে। তেমনি কোন কোন সাধক মনে করে এত জপ করতে হবে, এত ধ্যান করতে হবে, এত তপস্যা করতে হবে তবে ভগবানকে পাওয়া যাবে। এ সাধক নিজে চেষ্টা করে ভগবানকে ধরতে যায়। বিড়ালের ছা কিন্তু নিজে মাকে ধরতে পারে না। সে পড়ে পড়ে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে। মা যা করে। মা কখন বিছানার উপর কখন ছাদের উপর কাঠের আড়ালে রেখে দিচ্ছে। মা তাকে মুখে করে এখানে ওখানে লয়ে রাখে, সে নিজে মাকে ধরতে জানে না। তেমনি কোন কোন সাধক নিজে হিসাব করে কোন সাধন করতে পারে না। সে কেবল ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকে। তিনি তাঁর কান্না শুনে আর থাকতে পারেন না। এসে দেখা দেন।"

গদাধর জন্মেছিলেন দ্বিতীয় ধরণের প্রকৃতি নিয়ে। তাঁর ছিল শরণাগতের পথ,—সহজের পথ! পূর্বনির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ পথে আধ্যাত্মিক সাধন করে লক্ষ্যে পৌছবার চেষ্টা করেন নি। দীর্ঘ চার বছর পরে অন্তরের সহজ পথে তিনি সিদ্ধি পেলেন। অপূর্ব অনুভূতির রসাস্বাদনে তাঁর জীবন অপরূপ হয়ে উঠল। এই সিদ্ধির ফলে তাঁর অবস্থা হয়ে পড়ল বালকবৎ—"যেন পাঁচ বছরের বালকের অবস্থা। সরল, উদার, অহঙ্কার নাই, কোন জিনিসে আসক্তি নাই, কোন গুণের বশ নয়, সদাআনন্দময়।" মাঝে মাঝে আসে উন্মাদের অবস্থা। আপন খেয়ালে কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, কখন নাচেন, কখন বা গান করেন।

গদাধরের জীবনের এমন কি এই সহজ সিদ্ধিই এত অলৌকিক ও অপূর্ব ঘটনা যে কেবলমাত্র এর ফলেই তিনি মানুষের সমাজে অনন্যসাধারণ বলে পূজা পেতে পারতেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্যের অদৃশ্য বিধানপত্রে সিদ্ধির যে নির্দেশরেখা ছিল তা এক সিদ্ধির ছোট সীমার মধ্যে সঙ্কীর্ণ ছিল না। বিচিত্র পথে নবনব সিদ্ধির অনুরেখায় এমন সমৃদ্ধ নির্দেশরেখা পৃথিবীর ইতিহাসে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। ১২৬৬ থেকে ১২৭৩ সাল এই আট বছর তাঁর জীবনে আসে সেই নব নব সিদ্ধির বিচিত্র অনুভূতি।

সত্যকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা বিশ্বমানুষের হৃদয়ের একটি আদি আকাঙ্ক্ষা,

কোন একটিমাত্র দেশের সম্পত্তি নয়। সকল যুগেই দেশেদেশে মানুষ অন্তরের সহজিয়া পথে সত্যের অনুসন্ধান করেছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের সত্য-সাধকরা কিন্তু বিদেশী সাধকদের চেয়ে এক বিষয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছলেন। সত্যসন্ধানকে তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে নিঃশেষ হতে দেন নি ; গোষ্ঠীগত জীবনের সাধনায় পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন,—নানা মহাজনের অন্তরের সহজিয়া পথকে বিশেষ যত্নের সঙ্গে শ্রেণী ভাগ করে নির্দিষ্ট বিধির মধ্যে বাঁধবার ব্যবস্থা করেছিলেন। মনে হয়, একমাত্র ভারতবর্ষেই আধ্যাত্মিক সাধনার বিধিবদ্ধ পন্থা আছে। মানুষের মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে পরম ও সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ না করলে এভাবে সাধনমার্গকে বিধিবদ্ধ করা সম্ভব হত না। পৃথিবীর সংস্কৃতির ইতিহাসে এই মহাদানের জন্য ভারতের নাম চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা হবে।

সাধনমার্গকে শুধু বিধিবদ্ধ করে সাধকরা শান্ত হন নি, তাঁরা বুঝেছিলেন, যত মত তত পথ। নানা সাধক নানাভাবে সাধনা করে নানা পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন। সব পথেরই লক্ষ্য এক। নদীর দল যেমন যে দেশ দিয়ে যেমন ভাবেই যাক না কেন তাদের শেষগতি একমাত্র সাগর তেমনি আধ্যাত্মিক রাজ্যে যে যে পথের সাধনা করুক সকলেই পৌছবে এক লক্ষ্যে। প্রাচীন ভারতবর্ষ বিভিন্ন পথের মধ্যে দুরতিক্রম্য বৈষম্যকে উপেক্ষা করেন নি, বাস্তব ঘটনা হিসাবে স্বীকার করেছিলেন কিন্তু দিব্য ঔদার্যের প্রভাবে সেই বৈষম্যকে মানুষের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করতে দেন নি। তাঁরা বুঝেছিলেন, লক্ষ্য এক—পথ ভিন্ন।

গদাধরের জীবনে হঠাৎ একদিন এল বিধিবদ্ধ গুরুপরম্পরাগত পথে সাধনার স্তর। এ পথে তিনি পা বাড়ালেন নিজের ইচ্ছায় নয়। সহজ পথে সিদ্ধিলাভ করে তখন তিনি দিব্যআনন্দে মাতোয়ারা। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ। কয়েকমাস আগে রাসমণি ইহলোকের লীলা শেষ করেছেন। তাঁর অবর্তমানে মথুরামোহনের উপর দেবসেবাসংক্রান্ত সকল কাজের পরিচালনায় ভার পড়েছে। তিনি যথাসাধ্য গদাধরের সেবা করছেন। যাতে এই পরম সাধকের সাধনায় বাইরে থেকে কোন বিঘ্ন না হয় তার জন্য সদাই তিনি ব্যগ্র। গদাধর তখন কালী-ঘরের পূজার কাজ বিশেষ কিছু করতে পারেন না। তাঁর জীবনের উপর দিয়ে এক বিরাট বন্যাস্রোত বয়ে গেছে। গভীর অরণ্যের মধ্যে অজানাভাবে ঘুরতে ঘুরতে তিনি এক অপূর্ব ফাঁকা জায়গায় এসে আশ্রয় পেয়েছেন। কিন্তু এই কি তাঁর লক্ষ্যস্থল? মায়ের শরণাগত বালক গদাধর তা জানেন না।

এ সেই চিরন্তন পাওয়া না শুধু মায়ার খেলা ? কে এ কথা তাঁকে বলে দেবে ! গভীর অরণ্য মধ্যে তিনি যে একা। গদাধরের মনের অবস্থা তখন এই রকম সংশয়াকুল। একদিন ভোরবেলা কালীবাড়ির ফুল বাগানে ফুল তুলছেন এমন সময় দেখতে পেলেন বকুলতলার ঘাটেলাগা নৌকা থেকে গৈরিক কাপড়পরা একজন সুন্দরী ভৈরবী চাঁদনির দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁকে দেখে গদাধরের যেন মনে হল, ইনি পরমাত্মীয়। তিনি এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করলেন। ঘরে ফিরে এসে হৃদয়কে খবরটা দিয়ে বললেন, ঐ ভৈরবীকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়।

ভৈরবী গদাধরকে দেখেই অবাক্ হয়ে বলে উঠলেন, বাবা তুমি এখানে ! আর আমি গঙ্গার তীরে তুমি আছ জেনে কত দিন ধরে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তাঁর দুচোখ দিয়ে আনন্দ অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

গদাধরের বিস্ময়ের সীমা রইল না। বালকের মত তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কথা কেমন করে জানতে পারলে, মা ?

—জগদম্বার কৃপায় জানতে পেরেছিলুম তোমাদের তিন জনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। দুজনের সঙ্গে দেখা এর আগেই পূর্ব বঙ্গে পেয়েছি। এখানে পেলুম তোমার দেখা। ভৈরবীর গদগদ কণ্ঠে যেন পরমজনের সাক্ষাৎ পাওয়ার আনন্দ।

মনের মত লোক পেয়ে বালক গদাধর তাঁর সংশয়ের কথা তুললেন। একে একে তাঁর অলৌকিক দর্শন, গাত্রদাহ, রাতে ঘুম না হবার কথা শেষ করে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁগা, আমার এ সব কি হয় ? সত্যি কি আমি পাগল হয়ে গেছি ? মাকে রাতদিন ডাকার ফলে কি এমনি শক্ত ব্যারাম হল ?

বালকের মত সরলভাবে গদাধরকে এ সব প্রশ্ন করতে শুনে ব্রাহ্মণী বার বার করে বলতে লাগলেন, তোমায় কে পাগল বলে বাবা ? এ পাগলামি নয়,—তোমার মহাভাব হয়েছে। ভগবানকে যাঁরা এক মনে ডেকেছেন তাঁদের সকলেরই এমনি অবস্থা হয়েছে।

কথায় কথায় বেলা বয়ে যায়। এক পেয়েছে আর-এককে। শরৎ পেয়েছে বর্ষার দেখা। প্রশ্নের শেষ নেই, মীমাংসারও শেষ নেই। হঠাৎ গদাধরের খেয়াল হল, দুপুর হয়ে গেছে। তিনি মন্দিরের প্রসাদী ফলমূল, মাখন মিছরি ভৈরবীকে দিলেন, তাঁকে জলযোগ করতে বললেন। মন্দিরের কর্তৃপক্ষ কালীবাড়িতে সমাগত সাধুসন্ন্যাসীভৈরবভৈরবীদের ভোগের জন্য আটা চাল প্রভৃতি ভিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ভৈরবী সেই ভিক্ষা নিয়ে পঞ্চবটীতে

রান্না করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল রঘুবীর শিলা। রান্না শেষ হলে রঘুবীরের সামনে ভোগ নিবেদন করতে করতে গভীর ধ্যানে তিনি নিমগ্ন হলেন। তাঁর বাহ্য জ্ঞান লুপ্ত হল। সেই সময়ে গদাধর কি যেন এক ভীষণ আকর্ষণে ভাবের ঘোরে সেইখানে এসে পূর্ণাবিষ্ট অবস্থায় সেই ভোগ খেতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণীর জ্ঞান ফিরে এল, গদাধরও প্রকৃতিস্থ হলেন। সহজ অবস্থায় সব বুঝতে পেরে তিনি লজ্জিতভাবে বললেন, কি জানি মা, কেমন আত্মহারা হয়ে এ সব কাজ করে বসি!

ব্রাহ্মণীর হৃদয়ে তখন পুলকের বিপুল আবেগ। মায়ের মত স্নেহের কণ্ঠে তিনি জবাব দিলেন, বেশ করেছ বাবা। ও ত তুমি কর নি, তোমার ভিতরে যিনি রয়েছেন তিনি করেছেন। এবার বুঝেছি আর আমার বাহ্য পূজোর দরকার নেই, এত দিনে আমার সকল পূজো সার্থক হয়েছে। তাঁর দুচোখ দিয়ে প্রেমাশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। কথা শেষ করে তিনি বহুদিনের সঙ্গের সাথী রঘুবীর শিলাটিকে গঙ্গার জলে বিসর্জন দিলেন।

তারপর পঞ্চবটীতে বসে বসে নানা আধ্যাত্মিক দর্শন ও তত্ত্বালোচনায় ছয় সাত দিন দুজনের তন্ময়ভাবে কেটে গেল। দুজনেই দুজনকে ছাড়তে চান না। ভৈরবী জন্মেছিলেন বাঙালী ব্রাহ্মণ বংশে, বাড়ি ছিল যশোর জেলায়। জন্ম তাঁর বড় ঘরে, চালচলনেও ছিলেন বড় ঘরের মেয়ে। হিন্দুশাস্ত্র বিশেষ ভাবে পড়েছিলেন, সাধনায়ও বিশেষ উচুঁ স্তরে পৌঁছেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বে ছিল অপূর্ব আকর্ষণী শক্তি। তিনি গদাধরের প্রতি একান্ত স্নেহবশে দক্ষিণেশ্বরে থেকে গেলেন। আশ্রয় পাবার জন্য তাঁর কোন অসুবিধা হল না। কালীবাড়ির কাছেই ছিল দেবমণ্ডলের ঘাট। সেই ঘাটের চাঁদনীতে আশ্রয় নিলেন।

*

* *

গদাধরের দর্শন ও অনুভূতির গল্প শুনতে শুনতে ব্রাহ্মণী বুঝতে পারলেন, গদাধর সত্যিই সাধনার শীর্ষস্থানে পৌঁছেছেন কিন্তু "তাঁর খবর নাই।" তিনি জানেন না তাঁর অবস্থা কত উচ্চ স্তরের। নিজের সম্বন্ধে গদাধরের কেবলই সংশয়, দুর্গম পথের নিঃসঙ্গ পথিক হয়ত পথ হারিয়েছেন। ব্রাহ্মণী মনে মনে ঠিক করলেন, গদাধরের মন থেকে যাতে সংশয় দূর হয় তার চেষ্টা করবেন। তিনি নিজে তন্ত্রপথের প্রবীণা সাধিকা। সাধক সাধন পথের বিশেষ বিশেষ স্তরে যে সব প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করেন তন্ত্রশাস্ত্রে তা লেখা

আছে। তান্ত্রিক অনুষ্ঠান সহায়ে নির্দিষ্ট পথে সাধনা করলে গদাধরের মত অনন্য-সাধারণ শক্তিমান্ সাধক পূর্বাচার্যদের দর্শন ও অনুভূতি লাভ করবেন,—শাস্ত্রের লেখার সঙ্গে নিজের সেই সব দর্শন ও অনুভূতি মিলে গেলে তাঁর মন থেকে সকল সন্দেহ ঘুচে যাবে। একদিকে নিজের সম্বন্ধে তাঁর আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় হয়ে উঠবে আর একদিকে নব নব সিদ্ধিলাভ করে ধন্য হয়ে উঠবেন। পরম শুভাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণী একান্ত আগ্রহে একদিন গদাধরকে বললেন, বাবা, তুমি তন্ত্রমতে সাধনা কর।

গদাধর মার শরণাগত। জীবনে কোন কিছুতে তিনি নিজের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা দিয়ে পরিচালিত হন না। যা কিছু সব মা জানেন। তাই গদাধর উত্তরে বললেন, আমি কি জানি? মা যদি বলেন তাহলে করব।

তিনি মার মন্দিরে গিয়ে জিজ্ঞাসু বালকের মত নিজের মনের কথা নিবেদন করলেন। মায়ের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে শেষে তান্ত্রিক সাধনায় প্রবৃত্ত হলেন।

রূপরাগাদি যে সব বস্তুর প্রলোভনের মধ্যে পড়ে জীব বারবার জন্মমৃত্যুর জালে বাঁধা পড়ছে এবং ভগবানলাভ ও আত্মজ্ঞানের অধিকারী হতে পারছে না. কঠোর সংযম সহায়ে নব নব চেষ্টায় সেই সকলকে সাধক যাতে ভগবানের মূর্তি বলে ধারণা করতে পারে তা-ই হচ্ছে তান্ত্রিকী ক্রিয়া সকলের উদ্দেশ্য। তন্ত্রমতে তিন ভাবে সাধনা করা যায়—পশু, বীর ও দিব্য। পশুভাবের সাধকের মধ্যে কামক্রোধাদির আধিক্য থাকে, তাঁর কর্তব্য সব রকম প্রলোভনের বস্তু থেকে দূরে থেকে ভগবানের নাম জপ, পুরশ্চরণাদিতে রত থাকা। বীর ভাবের সাধকের বিশেষত্ব হচ্ছে তাঁর মধ্যে কামক্রোধাদির চেয়ে ঈশ্বরানুরাগ প্রবল। কামকাঞ্চন, রূপরসাদির আকর্ষণ তাঁর হৃদয়ে ভগবদ্প্রীতি বাড়িয়ে তোলে। তাঁর কর্তব্য কামকাঞ্চনাদির প্রলোভনের মধ্যে বাস করে অবিচলিত থেকে ভগবানে মনপ্রাণ সমর্পণ করতে চেষ্টা করা। আর যাঁর জীবনে ভগবদ্প্রীতির বন্যায় কামক্রোধাদি চিরকালের মত ভেসে গেছে এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত ক্ষমা দয়া তোষ সত্যাদি সদ্গুণ সহজ হয়ে উঠেছে তিনিই দিব্যভাবের যোগ্য সাধক।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী বীরভাবের সাধিকা ছিলেন। তাঁর যত্ন ও উদ্যমে গদাধর একটির পর একটি তন্ত্রোক্ত রহস্য সাধনের অনুষ্ঠান করতে লাগলেন। এ সাধনায় তাঁর তিন চার বছর কেটে গেল। পরবর্তীকালে তিনি গল্প করতেন, "ব্রাহ্মণী

দিনের বেলায় দূরে নানা জায়গা থেকে তন্ত্রনির্দিষ্ট দুষ্প্রাপ্য সব উপকরণ সংগ্রহ করত। রাত্তিরে বিল্বমূলে বা পঞ্চবটীতলে সমস্ত উদ্যোগ করে আমাকে ডাকত। তারপর ঐ সব উপকরণ সহায়ে জগদম্বার পূজো করিয়ে শেষে জপ ধ্যান করতে বলত। কিন্তু পূজোর পরে প্রায়ই আর জপ করতে পারতুম না। মন এত দূর তন্ময় হয়ে পড়ত যে জপের মালায় হাত দিতেই সমাধি হয়ে যেত। সেই অবস্থায় পূজোর সময়কার ক্রিয়া সকলের শাস্ত্রেলেখা ফল প্রত্যক্ষ করতুম। এই ভাবে সে সময়ে দর্শনের পর দর্শন, অনুভূতির পর অনুভূতি,—কত যে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রত্যক্ষ করেছি তার ইয়ত্তা নেই। বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত চৌবট্টিখানা তন্ত্রে যত কিছু সাধনের কথা আছে, সবগুলিই ব্রাহ্মণী একে একে অনুষ্ঠান করিয়েছিল। কঠিন কঠিন সাধন—যে সব করতে গিয়ে অধিকাংশ সাধক পথভ্রষ্ট হয়, মার কৃপায় সে সব সাধনে উত্তীর্ণ হয়েছি। * * * * একদিন দেখি, ব্রাহ্মণী মাঝ রাতে কোথা থেকে একজন পূর্ণ যুবতী সুন্দরী মেয়েকে ডেকে এনেছে আর পূজোর আয়োজন করে দেবীর আসনে তাকে বসিয়ে আমাকে বলছে, বাবা, এঁকে দেবী বুদ্ধিতে পূজো কর। পূজো সাঙ্গ হলে বললে, বাবা, সাক্ষাৎ জগজ্জননী জ্ঞানে এঁর কোলে বসে তন্ময়চিত্তে জপ কর। তখন আতঙ্কে কেঁদে মাকে বললুম, তোর শরণাগতকে একি হুকুম করছিস, মা? দুর্বল সন্তান অত সাহস কোথায় পাবে? সে কথা বলবামাত্র মন দিব্য বলে ভরে গেল। দেবতাবিষ্টের মত কি করছি না জেনে মন্ত্র পড়তে পড়তে মেয়েটির কোলে বসতেই সমাধিস্থ হয়ে পড়লুম। যখন হুঁশ ফিরে এল তখন ব্রাহ্মণী বললে, ক্রিয়া শেষ হয়েছে, বাবা। অপরে কষ্টে ধৈর্য ধরে ঐ রকম অবস্থায় মাত্র কিছুক্ষণ জপ করেই ক্ষান্ত দেয়, তুমি কিন্তু একেবারে শরীর বোধ-শূন্য হয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলে। পরীক্ষায় পার হয়ে গেছি শুনে আমি বারবার মাকে প্রণাম করতে লাগলুম।”

সাধারণ জীবনের দিক থেকে তন্ত্রের অনেক ক্রিয়াই ভয়ঙ্কর অদ্ভুত। গদাধর অবশ্য সব পরীক্ষায় সমান অবিচলিত ভাবে উত্তীর্ণ হন নি। কিন্তু তিনি যে কাজ যখন করতেন তাতে মনপ্রাণ সমর্পণ করে দিতেন। তাঁর হৃদয়ে উদ্যম ও প্রেরণার উৎস ছিল অফুরন্ত। তাই আগ্রহের গভীরতায় সব বাধা শেষ পর্যন্ত দূর হয়ে যেত। পরবর্তীকালে এমনি একদিনের গল্প বলতেন, “যেদিন ব্রাহ্মণী গলা আমমহামাংসখণ্ড এনে জগদম্বার পূজো করে বললে, বাবা, এবার তোমার জিবে ছোঁয়াও, তখন আর চুপ করে থাকতে পারলুল না। ঘৃণায় বলে উঠলুম,

তা কি কখন করা যায় ? সে বললে, সে কি বাবা ? এই দেখ আমি করছি ; নাও, তুমিও নাও, ঘেন্না করতে নেই। তাকে ওরকম করতে দেখে জগদম্বার প্রচণ্ড চণ্ডী মূর্তির উদ্দীপনা হয়ে গেল। আমি 'মা মা' বলতে বলতে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লুম। তখন ব্রাহ্মণী সেই মাংস আমার মুখে দিলে। আমার মধ্যে আর কোন ঘৃণা জাগল না।"

শেষে একদিন বীরভাবের শেষ সাধনে উত্তীর্ণ হবার পর ব্রাহ্মণী বললেন, বাবা, তুমি এবার আনন্দাসনে সিদ্ধ হয়ে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে।

তন্ত্রসাধন কালে গদাধর যে সব অপূর্ব দর্শনলাভ করেছিলেন অনেকের ধারণা, তা শাস্ত্রমতে পরম সিদ্ধির পরিচায়ক। কিন্তু বীরভাবের সাধন করলেও তিনি তাঁর দিব্য জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করেন নি। রমণীমাত্রে মাতৃভাব কখনও ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি, তান্ত্রিক কারণও স্পর্শ করেন নি।

এই দীর্ঘ সাধনার প্রভাব তাঁর দেহ মনে প্রকট হয়ে উঠেছিল। সারা দেহ স্নিগ্ধ কান্তিতে ভরে গেছল। অঙ্গে অঙ্গে জ্যোৎস্নার অমিয় তরঙ্গ লীলায়িত হয়ে উঠেছিল। সে মনোহর রূপ যে দেখত সেই মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারত না। নিরভিমান গদাধর কিন্তু তা দেখে বিরক্ত হয়ে উঠতেন—বাহ্য কিছুতে ত তাঁর আর প্রয়োজন নেই। ভিতরের ঐশ্বর্যই পৃথিবীতে চরম ধন। তিনি মার কাছে প্রার্থনা জানাতেন, মা, এ বাহ্যরূপে আমার কিছুমাত্র দরকার নেই। ও নিয়ে তুমি আমাকে অন্তরের আধ্যাত্মিক রূপ দাও।

গদাধরের ভিতরের জীবনেও সিদ্ধির প্রভাব পড়েছিল। তাঁর মধ্যে দেহবোধ শূন্য হয়ে গেছল। পরনের কাপড় তিনি আর অঙ্গে ধরে রাখতে পারতেন না। যজ্ঞসূত্রাদি কি যে কোথায় থাকত সে বিষয়ে একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। আর মন তাঁর একেবারে হয়ে পড়েছিল বালকবৎ। এ অবস্থা আগেও তাঁর ছিল কিন্তু এখন তা আরো গভীর হয়ে উঠেছিল। পৃথিবীতে তিনি শুধু আছেন, তাঁর মধ্যে আর অহংবোধ বিন্দুমাত্র নেই! তিনি যন্ত্রমাত্র। মা তাঁর পরিচালিকা, তাঁর বিধানদাত্রী।

রামলালালাভ

গঙ্গার তীরে রাসমণির কালীবাড়ি। সেখানে এলে মন্দির থেকে ভিক্ষা পাওয়া যায়। তাই দেশ বিদেশ থেকে আসত যত তীর্থযাত্রী সাধুসন্ন্যাসীর দল। এক এক সময়ে এক এক সম্প্রদায়ের সাধকের ভিড় লেগে যেত। তাঁদের পথ বিভিন্ন, মতও বিভিন্ন,—আচার ব্যবহারও বিচিত্র। একবার একজন আসেন, তাঁর মুখখানিতে ছিল এক অপরূপ সুন্দর জ্যোতিঃ। তিনি কেবল বসে থাকতেন আর হাসতেন। সকাল সন্ধ্যা একবার করে ঘরের বাইরে এসে গাছপালা, আকাশ, গঙ্গা সব অনিমেষ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন আর আনন্দে বিভোর হয়ে দু হাত তুলে নাচতেন। কখন বা হেসে মাটিতে গড়াগড়ি দিতেন আর বলতেন, বাঃ বাঃ, কেয়া মায়া, ক্যায়সা প্রপঞ্চ বানায়া!

আর একবার আর একজন আসেন তিনি ছিলেন জ্ঞানোন্মাদ। দেখতে যেন পিশাচের মত—উলঙ্গ, গায়ে মাথায় ধুলো, বড় বড় নখ চুল, গায়ে একখানা ময়লা পুরু কাঁথা। কালীঘরের সামনে এসে তিনি বিগ্রহ দর্শন করতে করতে এমনি জোরে স্তব পড়তে লাগলেন যেন মন্দিরটা সুদ্ধ কাঁপতে লাগল। তারপর কাঙালীরা যেখানে বসে প্রসাদ পায় সেখানে গিয়ে কাঙালীদের সঙ্গে বসতে গেলেন। কিন্তু ঐ রকম বিকট চেহারা দেখে তারা তাঁকে কাছে বসতে দিলে না। তারপর তিনি গিয়ে যেখানে লোকে প্রসাদ খাবার পর এঁটো পাতাগুলো ফেলে দিয়েছে সেখানে বসে কুকুরদের সঙ্গে খুঁটে খুঁটে ভাত খেতে লাগলেন।

এঁরা কেউই সাধারণ সাধক ছিলেন না। দক্ষিণেশ্বরে বসে বসেই গদাধরের সারা ভারতবর্ষ পরিক্রমার কাজ হত। লোকের পক্ষে শত শত গ্রন্থ পড়ে এবং তীর্থের পর তীর্থ ঘুরেও যে বস্তু লাভ করা একান্ত সুকঠিন—তিনি এক জায়গায় বসে সেই নানা মতের সাধকশ্রেষ্ঠের সঙ্গলাভ করতেন। বাইরে যতই বৈচিত্র্য থাক, সকলের অন্তরেই এক চরমের ধ্যান,—আলাপআলোচনায় সকলের মুখেই এক শেষ প্রসঙ্গ। এঁদের মুখে পরমার্থের বিচার ও আলোচনা শুনে গদাধরের আনন্দের শেষ থাকত না। এই সাধুসমাগম একদিক থেকে তাঁর জীবনে একটি পরম সুযোগ এনে দিয়েছিল। তাঁর হৃদয়ে যে তীব্র আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা ছিল তা অল্পে তুষ্ট হবার বস্তু ছিল না। এর পরিতৃপ্তির জন্য

হয়ত তাঁকে বারে বারে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াতে হত। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের মত তাঁর অটুট স্বাস্থ্য ছিল না। তাছাড়া, তিনি জীবনের আরম্ভেই যে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন সেই রকম অবস্থা নিয়ে যে কোন লোকের পক্ষে ঘুরে বেড়ানো হয়ত অসম্ভব হয়ে পড়ত। জীবনের বেশির ভাগ একই সাধন পীঠে কাটালেও গদাধর যে প্রতিনিয়ত এক বিরাট ও বিচিত্র পটভূমির মধ্যে অসীমের অনুভূতি সম্ভোগ করতে পারতেন তাঁর মনের এই বিশাল উদারতা মনে হয় অংশতঃ এই দক্ষিণেশ্বরের বিচিত্র সাধুসঙ্গের প্রত্যক্ষ ফল। ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার বিচিত্র মার্গের সঙ্গে এই যে যোগাযোগ এ ছিল একেবারে জীবন্ত। এ লোকের মুখে শোনা কথা নয়,—বই থেকে পড়ে সংযোগস্থাপনাও নয়। দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ জীবনত্রিবেণীতে সারা ভারতবর্ষের দিক দিক থেকে এসে হাজির হয়েছিল নানা স্রোতের সুগভীর প্রবাহ। তার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ইষ্টের অনুভূতি ছিল চিরদিন টাট্‌কা পদ্মের মত, তাঁর প্রাণের গতিবেগে কখনও জড়তা আসে নি। যতক্ষণ মহামানুষের মধ্যে সাধারণ মানুষের বোধাবোধ আছে ততক্ষণ মনে হয় তাঁর পক্ষেও দীর্ঘদিন একের অনুভূতি একঘেয়ে, মামুলি ও স্ফূর্তিহীন হতে বাধ্য। নিত্য এককে একই ভাবে মানুষ বেশি দিন সহ্য করতে পারে না। তাই সংসারের সর্বত্রই বিচিত্র রসের আস্বাদন দিয়েই এককে চরমভাবে ধরার চেষ্টা। প্রকৃতির মধ্যে তাই ষড় ঋতুর প্রকাশ।

তীর্থ থেকে তীর্থে আসাযাওয়ার পথে কোন কোন সাধু গদাধরের সাধনায় প্রত্যক্ষভাবে সাহায্যও করেছিলেন। এমনি একজনের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন রামলালকে। তখন বোধ হয় ১২৭০ সাল। তন্ত্রসাধনার শেষে তখন তিনি মধুরভাবের সাধনায় মগ্ন। হঠাৎ দক্ষিণেশ্বরে এসে হাজির হলেন একজন রামাইৎ সাধু, নাম জটাধারী। তাঁর সঙ্গে ছিল একটি অষ্ট ধাতু দিয়ে তৈরি বালক রামচন্দ্রের মূর্তি। ঐ মূর্তিটির সেবাই তাঁর জীবনের পরম সাধনা। যা ভিক্ষা পেতেন রেঁধে বেড়ে রামলালকে ভোগ দিতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বিগ্রহ সেই ভোগ খান। ঠাকুরটি নিয়েই সাধু সারা দিন বিভোর। এই রামলাল বেড়াতে যেতে চাচ্ছেন, এই অন্য আবদার করছেন, এই হয়ত খেলা করছেন।

গদাধর প্রথম দর্শনেই জটাধারীর নিষ্ঠা দেখে আকৃষ্ট হন। বাৎসল্যরসের পরম সাধকের কাছে বসে তিনি রোজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে লাগলেন।

ক্রমে তাঁদের দুজনের সম্বন্ধ নিকটতম হয়ে উঠল। গদাধর জটাধারীর কাছে শ্রীগোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নিলেন।

"দিনের পর দিন যেতে লাগল, রামলালেরও তত আমার উপর পিরিত বাড়তে লাগল। আমি যতক্ষণ বাবাজীর কাছে থাকি, ততক্ষণ সেখানে সে বেশ থাকে, খেলাধূলা করে। আর যেই সেখান থেকে নিজের ঘরে চলে আসি সেও আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে। আমি বারণ করলেও সাধুর কাছে থাকে না। প্রথম প্রথম ভাবতুম বুঝি মাথার খেয়ালে ঐ রকমটা দেখি। নইলে সাধুর চিরকেলে পূজোকরা ঠাকুর,—ঠাকুরটিকে সে কত ভালবাসে, ভক্তি করে, সন্তর্পণে সেবা করে, সেই ঠাকুর তার চেয়ে আমাকে ভালবাসবে, এটা কি হতে পারে? কিন্তু ও রকম ভাবলে কি হবে? দেখতুম—সত্যি সত্যি দেখতুম, যেমন তোদের সব দেখছি—এই রকম দেখতুম, রামলালা সঙ্গে সঙ্গে কখন আগে কখন পেছনে নাচতে নাচতে আসছে। কখনবা কোলে ওঠবার জন্যে আবদার করছে। আবার কখন হয়তবা কোলে করে রয়েছি, কিন্তু কিছুতেই কোলে থাকবে না, কোল থেকে নেমে রোদে দৌড়োদৌড়ি করতে যাবে, কাঁটা বনে গিয়ে ফুল তুলবে বা গঙ্গার জলে নেমে ঝাঁপাই জুড়বে। কত বারণ করি, ওরে অমন করিস্ নি, গরমে পায়ে ফোস্কা পড়বে, ওরে অত জল ঘাঁটিস্ নি, ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হবে, সে কি তা শোনে! যেন কে কাকে বলছে! হয় ত সেই পদ্মপলাশের মত সুন্দর চোখ দুটি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগল আর আরও দুরন্তপনা করতে লাগল। তখন সত্যি সত্যিই রেগে বলতুম, তবে রে পাজি, রোস্, আজ তোকে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব। বলে রোদ থেকে বা জল থেকে জোর করে টেনে নিয়ে আসি। এ জিনিসটা ও জিনিসটা দিয়ে ভুলিয়ে ঘরের ভেতর খেলতে বলি। আবার কখনবা কিছুতেই দুষ্টুমি থামছে না দেখে চড়টা চাপড়টা বসিয়ে দিতুম। মার খেয়ে সুন্দর ঠোঁট দুখানি ফুলিয়ে সজল নয়নে আমার দিকে দেখত। তখন আবার মনে কষ্ট হত কোলে নিয়ে কত আদর করে তাকে ভোলাতুম। এই রকম সব ঠিক ঠিক দেখতুম, করতুম। * * * * আর একদিন তার জন্যে মনে কত যে কষ্ট হয়েছিল, কত যে কেঁদেছিলুম! সেদিন রামলালা বায়না করছে দেখে ভোলাবার জন্যে চারটি ধান সুদ্ধ খই খেতে দিয়েছিলুম। তারপর দেখি সেই খই খেতে ধানের তুষ লেগে তার নরম জিব চিরে গেছে। তখন মনে কি কষ্টই হল! তাকে

কোলে করে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলুম আর মুখখানি ধরে বলতে লাগলুম,- যে মুখে মা কৌশল্যা লাগবে বলে ক্ষীর, সর, ননীও অতি সন্তর্পণে তুলে দিতেন আমি এমন হতভাগা যে সেই মুখে ধানভরা খই তুলে দিলুম! * * * * ক্রমে এমন হল, এক একদিন রেঁধে বেড়ে ভোগ দিতে বসে জটাধারী রামলালাকে আর দেখতেই পেত না। তখন মনে ব্যথা পেয়ে আমার কাছে ছুটে আসত। এসে দেখত রামলালা ঘরে খেলা করছে। তখন অভিমানে তাকে কত কি বলত! বলত, আমি এত করে রেঁধে বেড়ে তোকে খাওয়াব বলে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তুই কিনা এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে ভুলে রয়েছিস। তোর ধারাই ঐ রকম, যা ইচ্ছে হবে তাই করবি! মায়া দয়া তোর একটুও নেই? বাপমাকে ছেড়ে বনে গেলি বাপটা কেঁদে কেঁদে মরে গেল। তবু ফিরে এলি না একবার দেখা দিলি না। এই রকম সব কত কি বলে রামলালাকে টেনে নিয়ে গিয়ে খাওয়াত। এই ভাবে দিন যেতে লাগল। * * * * তারপর একদিন জটাধারী সজল নয়নে বললে, রামলালা কৃপা করে আমার প্রাণের তৃষ্ণা মিটিয়ে দিয়েছে, যেমন ভাবে দেখতে চাইতুম তেমনি করে দর্শন দিয়েছে। ও যে তোমাকে ছেড়ে যেতে চায় না—তাতে আর আমার মনে কোন দুঃখ নেই। তোমার কাছে ও সুখে থাকে, আনন্দে খেলা করে। তাই দেখেই আমি আনন্দে ভরপুর হয়ে যাই। এখন আমার এমনটা হয়েছে যে ওর যাতে সুখ তাতেই আমার সুখ। তাই এখন ওকে তোমার কাছে রেখে আমি দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে যেতে পারব। তোমার কাছে সুখে আছে ভেবে ধ্যান করেই আমার আনন্দ হবে।"

সংসারে মানুষ দেবতারে প্রিয়জনের আসনে বসিয়েই আনন্দ পায়। সম্বন্ধের আস্বাদন দিয়ে সম্বন্ধরাহিত্যের স্তরে ওঠাই মধুর ভাবের সাধনার লক্ষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন যে কাজে হাত দিয়েছেন তাতে একেবারে তন্ময় হয়ে যেতেন; তিনি শুধু জানার সন্ধানী ছিলেন না,—হওয়ার সাধনায় নিজেকে ডুবিয়ে দিতেন। তাই এই কালীর সাধকের বলা উপরের বিবরণের মধ্যে রসঘন-বাৎসল্যের ক্রমবিকাশের অপরূপ ছবি ফুটে উঠেছে। একদিন এ পথেও তাঁর সিদ্ধি লাভ হল। জটাধারী তাঁর পরম প্রেমাস্পদকে গদাধরের হাতে সঁপে দিয়ে যেমন হঠাৎ একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তেমনি হঠাৎ আর একদিন নিঃশঙ্কমনে দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে গেলেন। এর পরে আর কখনও তিনি গদাধরের কাছে ফিরে আসেন নি।

গদাধরের চরিত্রে প্রাণধারা এমন উচ্ছল ছিল যে তিনি লক্ষ্যে পৌঁছে কখনও চুপ করে থাকতে পারতেন না। সাংসারিক কামনা তাঁর লেশমাত্র ছিল না। কিন্তু যে পরম কামনা তাঁর মধ্যে নিত্য লীলাঘন হয়ে উঠত সে বিষয়ে কিছুতেই তাঁর তৃপ্তি হত না। একবার পাওয়ার মধ্যে তিনি নতুনকরে পুনরায় পাবার প্রেরণায় মেতে উঠতেন। অবশ্য বারে বারে একেকেই পেতেন কারণ চিরদিন লক্ষ্য তাঁর একই ছিল। কিন্তু নতুন নতুন পথে তিনি একেরই নব নব রসাস্বাদন করতে চাইতেন। পথের আনন্দ সেই ত মানুষের সত্যি-কার পাবার আনন্দ। "পথে চলাই সেই ত তোমায় পাওয়া।" পথ চলার এই যে অনির্বান নিত্য কামনা—এর অতৃপ্তির মধ্যে কোন অপূর্ণতার প্রশ্ন নেই কারণ এই কামনা দিব্য কামনা এবং এই অতৃপ্তি পূর্ণতার অতৃপ্তি। এই যে লক্ষ্যের চরম শীর্ষে উঠে আবার নেমে আসা এবং নতুন করে পুনরায় চলা শুরু করা—এ শুধু শ্রেষ্ঠ মহামানুষেই সম্ভব। এই যে বারেবারে নতুন করে পাব বলেই পাওয়াকে হারানো—এ লীলা কেবল পরম গতিশীল রহস্যঘন মনেরই ধর্ম। দুর্দম গতিশীলতার দিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের মন ছিল অতুলনীয়।

কেন এই রহস্যঘন চাওয়ার খেলা? এ প্রশ্নের মীমাংসা সহজ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই একদিন শিষ্যদের বলেছিলেন, "সমুদ্রের তীরে যে ব্যক্তি সর্বদা বাস করে তার মনে যেমন কখন কখন বাসনার উদয় হয়, রত্নাকরের গর্ভে কত প্রকার রত্ন আছে তা দেখি, তেমনি মাকে পেয়ে ও মার কাছে সর্বদা থেকে আমার তখন মনে হত অনন্তভাবময়ী, অনন্তরূপিনী তাঁকে নানাভাবে ও নানারূপে দেখব। বিশেষ কোন ভাবে তাঁকে দেখতে ইচ্ছা হলে তার জন্য তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ধরতুম। কৃপাময়ী মাও তাঁর ঐ ভাব দেখতে বা উপলব্ধি করতে যা কিছু প্রয়োজন তা যুগিয়ে এবং আমার দ্বারা করিয়ে নিয়ে আমার কাছে সেইভাবে দেখা দিতেন।"* এ লীলা বলহীনের নয়। যিনি অনেক পাওয়ার অধিকারী কেবল তাঁর হৃদয়েই জাগতে পারে এমন অসামান্য চাওয়া।

*শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ : সাধকভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনজীবনকাহিনী এই বিচিত্র পথের ইতিহাস। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যদি সেই বিচিত্র কথা কেউ খুঁটিনাটি লিখে রেখে যেতে পারতেন তাহলে এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক গ্রন্থ সৃষ্টি হত সন্দেহ নেই। কিন্তু গদাধরের চারপাশে সেকালে যাঁরা ছিলেন তাঁদের পক্ষে একাজ করা সম্ভব হয় নি।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ, জানুআরী মাস। হঠাৎ একদিন এক নাগা সন্ন্যাসী এসে হাজির হলেন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে। শ্রীমৎ তোতাপুরীর মঠ ছিল পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলায়। চল্লিশ বছর তাঁর কেটেছিল ধ্যানধারণায়। নর্মদাতীরে অনেকদিন দুশ্চর তপস্যা করে নির্বিকল্প সমাধির অধিকারী হয়েছিলেন। সিদ্ধিলাভের পর তাঁর ইচ্ছা হয় পূর্বভারতের তীর্থে তীর্থে কিছুদিন ঘুরে বেড়াবেন। সেই উদ্দেশ্যে সাগরসঙ্গম ও পুরীধাম পরিক্রমার পর ফেরবার পথে এসে হাজির হয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। গদাধরের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয় গঙ্গার ঘাটের চাঁদনীতে। তিনি তখন আনমনাভাবে এক পাশে বসেছিলেন। উলঙ্গ তোতাপুরী গদাধরের তপোদীপ্ত মুখের দিব্য ভাব দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ ধরে অনিমেষ চোখে তাকিয়ে দেখবার পর কাছে এসে আপনা থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে বেশ যোগ্য অধিকারী, তুমি বেদান্ত সাধন করবে?

মায়ের একান্ত শরণাগত গদাধর নিজে ত কিছু ঠিক করতে পারেন না। তাঁর মধ্যে আর কিছুমাত্র নিজের ইচ্ছা কাজ করত না। তিনি জবাব দিলেন, আমি কি জানি? আমার মা সব জানেন। তাঁর আদেশ পেলে বেদান্ত সাধন করব।

—তবে যাও, তোমার মাকে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করে এস। আমি ত আর বেশি দিন থাকতে পারব না।

গদাধর গিয়ে কালীমন্দিরে ঢুকলেন। যথাভাবে তিনি মায়ের প্রত্যাদেশ পেলেন। ঠিক হল, তিনি তোতাপুরীর কাছে দীক্ষা নিয়ে এবার অদ্বৈত সাধন করবেন।

তোতা বললেন, বেদান্ত সাধন শুরু করতে হলে প্রথমেই শিখাসূত্র ত্যাগ করে যথারীতি সন্ন্যাস নিতে হবে।

তাকি হয়! এই কঠোর সাধকের অন্তরের অন্তস্তলে চিরদিন এক টুকরো অপূর্ব মানবিকতা লুকিয়ে ছিল। গদাধর কোনদিন মাটির দেশের যথা কর্তব্য

করতে বিমুখ হতেন না। তাঁর মা চন্দ্রা দেবী তখন দক্ষিণেশ্বরে। অভাবের সংসারে চিরকাল দুঃখকষ্টে তাঁর দিন কেটেছে। তারপর বড় ছেলের মৃত্যুতে শোকে সন্তাপে আর তিনি সংসারে থাকতে পারলেন না। জীবনের শেষ দিন কটি গদাধরের কাছে কাটাবার উদ্দেশ্যে গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে এসে বাস করছিলেন। তাঁর চোখের উপর গদাধর যদি মনের সব সংস্কার বিসর্জন দিয়ে মাটির দেশের সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে সন্ন্যাস নেন, অভাগিনীর মনে ভয়ঙ্কর আঘাত লাগবে। গদাধর নানা চিন্তা করে বললেন, গোপনে যদি সন্ন্যাস নিলে চলে তাহলে রাজী আছি।

তোতা সব কথা শুনে শিষ্যের শর্তই মেনে নিলেন। গোপনে সব আয়োজন শেষ হল। নির্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্ম মুহূর্তে সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষা দেওয়া হল। হোমের অগ্নিকে সাক্ষী করে ব্রতী মন্ত্র পড়লেন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ থেকে উদ্ভূত আমার মধ্যে যত কিছু বিষয়সংস্কার শুদ্ধ হোক; আহুতি-প্রভাবে রজোগুণ প্রসূত সকল মলিনতা থেকে মুক্ত হয়ে আমি যেন জ্যোতিঃ স্বরূপ হই,—স্বাহা। * * * * আমার মন, বাক্য, কায়া, কর্ম সব শুদ্ধ হোক। আহুতি প্রভাবে রজোগুণ প্রসূত সকল মলিনতা থেকে মুক্ত হয়ে আমি যেন জ্যোতিঃ স্বরূপ হই,—স্বাহা। * * * * অগ্নিশরীরে শয়ান হে জ্ঞানপ্রতিবন্ধকহারী লোহিতাক্ষ পুরুষ আমার মধ্যে জাগো। অভীষ্টপূরণকারী, তত্ত্বজ্ঞানলাভের পথে আমার যত কিছু বাধা সব নাশ করে দাও। চিত্তের সমস্ত সংস্কার পূর্ণ ভাবে শুদ্ধ হয়ে গুরুর কাছে শোনা জ্ঞান যাতে আমার মধ্যে উদয় হয় তাই করে দাও। আহুতি প্রভাবে রজোগুণপ্রসূত মলিনতা থেকে মুক্ত হয়ে আমি যেন জ্যোতিঃ স্বরূপ হই,—স্বাহা। * * * * চিদাভাস ব্রহ্মস্বরূপ আমি,—স্ত্রী, পুত্র, সম্পদ, সুন্দর তনু লাভের সব বাসনা অগ্নিতে আহুতি দিয়ে নিঃশেষে ত্যাগ করলুম,—স্বাহা।"

গুরুর দীক্ষায় শিষ্যের নব জন্ম লাভ হল। সব দিয়ে যেন নতুন করে সব ফিরে পেলেন। তাঁর মধ্যে যেন নামহীন, গোত্রহীন,—মাটির দেশের সঙ্গে সকল সম্পর্কহীন এক দিব্যপুরুষের আভির্ভাব হল। তোতা গদাধরকে নতুন নাম দিলেন "রামকৃষ্ণ"। তারপর তিনি ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানের জন্য শিষ্যকে অদ্বৈত তত্ত্বের নানা উপদেশ দিতে লাগলেন। উপদেশ দিতে দিতে বারবার নিজেই সর্বতোভাবে নির্বিকল্প আত্মধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতে লাগলেন। আজ মনের মত শিষ্য পেয়েছেন, আজীবনের সাধনালব্ধ উপলব্ধিগুলি যোগ্য লোককে

দিতে পারার উৎসাহে তাঁর আনন্দের শেষ নেই। কিন্তু সাধকশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ কিছুতেই ধ্যানের মধ্যে ডুবে নির্বিকল্প হতে পারলেন না,—নামরূপের সীমা ছাড়িয়ে কিছুতেই অন্তস্তরে পৌছতে পারলেন না। স্বভাবসিদ্ধভাবে যেই সব বিষয় থেকে মন গুটিয়ে আসতে লাগল অমনি শ্রীশ্রীজগদম্বার চিরপরিচিত চিদ্‌ঘন মূর্তি মানসপটে ফুটে ওঠে আর নামরূপত্যাগের সকল সঙ্কল্প তিনি ভুলে যান।

নিরুপায় রামকৃষ্ণ গুরুকে বললেন, না, মনকে সম্পূর্ণ নির্বিকল্প করে আত্মধ্যানে মজে যেতে পারলুম না।

উত্তেজিত তোতা ধমক দিয়ে উঠলেন, কেঁও হোগা নহী ?

তিনি ছাড়বার পাত্র নন। এ এমনই মহাধন যে এ ধন দিতে পারাই সাধকের কাছে সব চেয়ে বড় আনন্দের কথা। ঘরের বাইরে গিয়ে তিনি এক টুকরো কাঁচ কুড়িয়ে এনে রামকৃষ্ণের ভ্রূ দুটির মধ্যে তার স্থচের মত তীক্ষ্ণ প্রান্ত সজোরে টিপে ধরে বললেন, এই বিন্দুতে মনকে গুটিয়ে আন।

দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে রামকৃষ্ণ আবার ধ্যানে বসলেন। যে মা তাঁর জীবনের পরম কেন্দ্র সেই জগদম্বার চিন্তাকে এবার কিছুতেই তাঁর নির্বিকল্প সমাধির পথে বাধা হতে দেবেন না। অপরূপ তাঁর অধ্যবসায়,—অদ্ভুত সঙ্কল্পের জোর। এবার হু-হু করে তিনি উঠতে লাগলেন। একে একে নামরূপ রাজ্যের অতীত স্তরে গিয়ে অকস্মাৎ সব একাকার হয়ে তিনি গভীর সমাধিমগ্ন হলেন।

তোতা অনেক ক্ষণ ধরে কাছে বসে শিষ্যকে দেখতে লাগলেন। নির্বাক, নিস্পন্দ জ্যোতির্ময় সেই দেহ। পরে ঘরের বাইরে গিয়ে পাছে কেউ অজান্তে ঢুকে পড়ে রামকৃষ্ণকে বিরক্ত করে এই ভেবে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন।

অনেক ক্ষণ কেটে গেল। কাছে পঞ্চবটীতলে যোগাসনে বসে বসে তোতা প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। শিষ্যের ধ্যান ভাঙলে এসে দরজা খুলে দেবেন—মনে এই সঙ্কল্প। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, তবু কোন সাড়া শব্দ নেই। ক্রমে দিন শেষ হল। রাত হল ভোর। একে একে তিন দিন দেখতে দেখতে চলে গেল। তবুও দরজা খুলে দেবার জন্য কেউ ডাকলে না। বিস্ময়-বিমুগ্ধ তোতা শেষে নিজেই আসন ছেড়ে উঠে গেলেন। ঘরে ঢুকে দেখেন, রামকৃষ্ণ সেই এক ভাবে স্থির হয়ে বসে আছেন। মুখ শান্ত, গম্ভীর, অপরূপ জ্যোতিঃর আলোকে উদ্ভাসিত। নিবাত নিষ্কম্প অগ্নিশিখার মত তাঁর মন ব্রহ্মে লীন হয়ে অবস্থান করছে।

চল্লিশ বছর ধরে কঠোর সাধনার শেষে যা উপলব্ধি করা তোতার পক্ষে

সম্ভব হয়েছিল, একদিনের চেষ্টায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাই আয়ত্ত করেছেন। বিস্ময়ে আনন্দে তিনি চিৎকার করে উঠেলেন, ইয়ে ক্যা দৈবী মায়া!

শিষ্যকে আবার সংসারের রাজ্যে ফিরিয়ে আনবার জন্য তিনি হরি ওম্, হরি ওম্ বলে মন্ত্র তাঁর কানে শোনাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান ভাঙল।

এই ঘটনার পর তোতার আর দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে যাওয়া হল না। জীবন্মুক্ত পুরুষ তিনি, কোথাও তিন দিনের বেশি রাত্ কাটাতেন না। সন্ন্যাস জীবনে এ নিয়ম কঠোর ভাবে পালন করার চেষ্টা করতেন কিন্তু এত দিনে এক অদ্ভুত মানুষের সন্ধান পেয়েছেন। স্পর্শমণি আর একটি স্পর্শমণির সংস্পর্শে এসে পড়েছেন। দুজনে দুজনের আকর্ষণে পরমানন্দে এগার মাস দক্ষিণেশ্বরে কাটালেন।

তখনও যোগেশ্বরী ভৈরবী শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বাস করে অপত্যস্নেহে তাঁর বিচিত্র সাধনায় সাহায্য করছিলেন। তিনি তোতাপুরীর সংস্রব পছন্দ করেন নি। তাঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘনিষ্ঠভাবে মেশামেশি করতে দেখে বলেছিলেন, বাবা, ওর সঙ্গে অত মেশামিশি কর না। ওদের সব শুকনো ভাব। ওর সঙ্গ অত করলে তোমার ভাবপ্রেম আর কিছু থাকবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ যোগেশ্বরীর এই নিষেধ শোনেন নি। যখন যে পথে তিনি ডুব দিতেন তখন অল্পে আর তাঁর তৃপ্তি হত না। অদ্বৈতসাধনার চরম স্তরে পৌঁছবার জন্য তিনি তোতার উপদেশ অনুসারে চলতে লাগলেন। যোগেশ্বরীকে ক্ষুণ্ণ হতে দেখেও বিচলিত হলেন না।

কিন্তু তোতার কাছ থেকে তিনি শুধু নেন নি। গুরুশিষ্যের এই সংস্রবের ইতিহাস দেওয়ানেওয়ার এক অপরূপ কাহিনী। শিষ্যের সংসর্গে গুরুও নতুন নতুন অনুভূতি লাভ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে শুকনো ভাবের সাধকের জীবনে নেমে এসেছিল অজানা রসের নিবিড়তা।

তোতার বাইরেটা ছিল বড় অদ্ভুত। তিনি কখনও ঘরের ভিতর থাকতেন না। নাগাসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলে সর্বদা অগ্নি সেবা করতেন। নাগাদের চোখে অগ্নি পরম বস্তু। তাই যখনই যেখানে থাকুন না কেন তাঁরা "ধুনি" জ্বালিয়ে রাখেন। তাঁরা ধুনিকে সকাল সন্ধ্যা আরতি করেন। ভিক্ষায় পাওয়া সকল আহার্য প্রথমে সেই ধুনির অগ্নিকে নিবেদন করে তবে নিজেরা খান। দক্ষিণেশ্বরে তোতা পঞ্চবটীর তলায় আসন করে বাস করতেন। রোদ হোক,

বাদল হোক, তাঁর ধুনি নিয়ত সমানভাবে জ্বলত। ঐ ধুনির ধারেই তোতা আহার, শয়ন, ধ্যান সব কিছু করতেন। গভীর রাতে যখন চারিদিক নির্জন নিশুতি হয়ে যেত তখন তিনি ধুনির আগুন বাড়িয়ে দিয়ে অচল, অটল সুমেরুর মত নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে যেতেন। দিনের বেলায়ও অনেক সময় ধ্যান করতেন। তবে পাছে লোকে জানতে পারে তাই একখানা চাদরে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে ধুনির ধারে লম্বা হয়ে শুয়ে ধ্যান করতেন। লোকে ভাবত, ল্যাংটা সাধু বুঝি ঘুমুচ্ছেন।

সম্পত্তির মধ্যে তোতার ছিল একটি লোটা আর একটি লম্বা চিমটা আর আসনের জন্য একখানা চামড়া। সব সময়ে গায়ে একটা মোটা চাদর জড়িয়ে রাখতেন। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমার ত ব্রহ্মলাভ হয়েছে, সিদ্ধি হয়েছে, তবে আবার রোজ ধ্যান অভ্যাস কর কেন?

তোতা তাঁর লোটাটি দেখিয়ে জবাব দিয়েছিলেন, এটা কেমন ঝকঝকে দেখছ ত? কিন্তু রোজ যদি একে না মাজি তাহলে? কালো, ময়লা হয়ে যাবে—কেমন ত? মনও জানবে এই রকম। ধ্যানাভ্যাস করে মনকে নিত্য মেজে ঘসে না রাখলে তা মলিন হয়ে পড়ে।

তোতা কঠোর বেদান্তী ছিলেন, শক্তি মানতেন না। শিষ্য বলতেন, ব্রহ্ম ও শক্তি এক। গুরু তা রামকৃষ্ণের মনের ভুল বলে উড়িয়ে দিতেন। তিনি ভক্তিমার্গকে একটা কিম্ভূতকিমাকার কিছু বলে ভাবতেন। ভক্তি ভালবাসা যে মানুষকে প্রেমাস্পদের জন্য সংসারের সকল বিষয় এমন কি আত্মতৃপ্তি পর্যন্ত ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, ভক্তসাধক যে চরম বিকাশের স্তরে শুদ্ধঅদ্বৈতজ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন—একথা তিনি বুঝতেন না। এ নিয়ে তাঁদের দুজনে মাঝে মাঝে তর্ক হত। একদিন দুজনে অনেকক্ষণ ধরে নানা আলোচনা করছিলেন। দেখতে দেখতে সন্ধ্যার ছায়া চারিদিকে ঘনিয়ে এল। ছেলে বয়স থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যাস ছিল হাততালি দিয়ে ভগবানের নাম করা। অভ্যাস মত সন্ধ্যা হতেই তিনি তোতার সামনে তালি দিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন, হরিবোল, হরিবোল, হরি গুরু, হরি গুরু। জগৎ তুমি, জগৎ তোমাতে। আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী। তা দেখে অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী আর নিজেকে চেপে রাখতে পারলেন না। নির্দোষ বিদ্রূপের ছলে জিজ্ঞাসা করলেন, আরে কেঁও রোটি ঠোকতে হো?

পশ্চিমা লোকেরা অনেক সময় চাকিবেলন না নিয়ে আটার নেচি হাতে

চাপড়ে চাপড়ে রুটি তৈরি করে। তোতা শ্রীরামকৃষ্ণকে তালির সঙ্গে নাম করতে দেখে তাই বলেছিলেন, রুটি তৈরি করার মতন অমন চাপড়ে চাপড়ে শব্দ করছ কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বললেন, দূর শালা, আমি ভগবানের নাম করছি আর তুমি কিনা বলছ রুটি ঠুকছি !

গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ ছিল খুব নিবিড়। আর একদিন সন্ধ্যার সময় দুজনে ধুনির ধারে বসে আছেন। দুজনের মন অদ্বৈতজ্ঞানে তন্ময়। পাশে ধুনির শিখা লক্‌লক্ করে জ্বলছে। এমন সময় একটা লোক তামাক খাবার উদ্দেশ্যে ধুনির কাঠ টেনে কল্‌কেতে আগুন নিতে লাগল। প্রথমে দুজনে এত তন্ময় ছিলেন যে কারুরই দৃষ্টি এদিকে পড়ে নি। হঠাৎ তোতা চোখ চেয়ে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে রাগে অধীর হয়ে গেলেন। ধুনি তাঁর কাছে সংসারে সব চেয়ে পবিত্র জিনিস। রাগে তিনি লোকটাকে গালিগালাজ করতে লাগলেন, শেষে চিমটে তুলে মারতে গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সেই দৃশ্য দেখে অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন।

তোতা অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি অমন করে হাসছ যে ? দেখ ত লোকটার কি অন্যায় !

—তাত বটে। কিন্তু এই সঙ্গে তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের দৌড়টাও দেখছি। এই মাত্র না তুমি বলছিলে, ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় সত্তা নেই, সংসারে সকল বস্তু ও মানুষ তাঁরই প্রকাশ। অথচ সে সব কথা ভুলে এখন মানুষকে মারতে উঠেছ ! তাই হাসছি যে মায়ার কি প্রভাব।

আত্মবিশ্লেষণে উৎসাহী অদ্বৈতবাদীর রাগ নিমেষে পড়ে গেল। তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে আপনাকে সংবরণ করে নিলেন। বললেন, ঠিক বলেছ। রাগ বড় পাজী জিনিস। সব ভুলিয়ে দেয়। আজ থেকে রাগ ত্যাগ করলুম।

ক্রমে বাঙলার অস্বাস্থ্যকর জলহাওয়ার স্পর্শে তোতার পশ্চিমী দৃঢ় শরীর খারাপ হতে লাগল। তিনি কঠিন রক্ত আমাশা রোগে ভুগতে লাগলেন। ভাবলেন, বাঙলা দেশে আর থাকা উচিত নয়, তিন দিনের বদলে বহুদিন কেটে গেছে। এবার রামকৃষ্ণের কাছ থেকে চিরবিদায় নেবেন। তবু যাই যাই করেও কিছুদিন কেটে গেল, শিষ্যের পরম সংসর্গ ত্যাগ করতে পারলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরামোহনকে বলে তোতার যথাযোগ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তিনি নিজে যতদূর সম্ভব তাঁর সেবাযত্ন করতেন। কিন্তু কিছুতেই অসুখ কমল না, বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। একদিন রাতে এমন বাড়াবাড়ি হল যে যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠল। বসে সোয়াস্তি নেই, শুয়ে নিস্তার নেই। অদ্বৈতবাদী ভাবলেন, শরীর হাড়মাসের খাঁচা। এর যন্ত্রণায় মন অস্থির। তা কথনই হতে দেব না। মনকে ধ্যানমগ্ন করে রাখি। কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও তিনি মনকে সকল বিষয় থেকে গুটিয়ে আনতে পারলেন না। নিজের উপর বিরক্তিতে তাঁর মন ভরে গেল। তিনি শেষে ঠিক করলেন, এই দেহটা সত্যিকার আমি নই। তবে এই পচা দেহটাকে আর রাথার দরকার কি! একে আজ গঙ্গায় বিসর্জন দিই।

রাত আরও গভীর হলে সঙ্কল্পমত তোতা গঙ্গার মধ্যে নেমে পড়লেন। এক পা এক পা করে ক্রমেই তিনি ডুব জলের আশায় এগিয়ে চললেন কিন্তু কোথায় ডুব জল! মাঝ গঙ্গা পার হয়ে তিনি পরপারের দিকে আসতে লাগলেন তবু হাঁটুর উপরে জল নেই। রহস্যবাদীর মন সৃষ্টিরহস্যের নিবিড়তায় সহসা ভরে গেল। তিনি ভাবলেন, একি দৈবী মায়া। ডুবে মরবার মত জলও আমি পাব না? তাঁর অন্তরে জেগে উঠল এক নতুন আলো। তিনি উপলব্ধি করলেন, উপরে নীচে পাশে সামনে চারিদিকে মা, মা,—বিশ্বজননী মা। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ। গভীর নিশীথে তোতা জগদম্বার নাম করতে করতে পঞ্চবটীতে ফিরে এলেন। দেহের যন্ত্রণা আর তাঁর অনুভবে নেই। পরম পুলকে মনপ্রাণ ভরে গেছে।

সকালে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখা করতে আসতেই তোতা তাঁকে সব কথা বললেন। শিষ্য তা শুনে খুব আনন্দিত হলেন। বললেন, মাকে যে আগে মানতে না, শক্তি ঝুট বলে আমার সঙ্গে যে তর্ক করতে! এখন দেখলে ত?

তোতা জবাব দিলেন, হাঁ, এতদিন এ আমার অজানা ছিল। কাল রাতে জগদম্বার দর্শন পেয়েছি, তাঁর কৃপায় আমার অসুখ ভাল হয়েছে।

রোগমুক্ত তোতার নতুন অনুভূতির আনন্দে বিভোর অবস্থায় কয়েক দিন কেটে গেল। এবার দক্ষিণেশ্বরের পালা তাঁর শেষ হল। পথের ডাকে চিরপথিক মন তাঁর ভয়ঙ্কর চঞ্চল হয়ে উঠল। তোতা একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বিদায় নিয়ে পশ্চিম যাত্রা করলেন। এর পর আর কখনও তাঁর সঙ্গে শিষ্যের সাক্ষাৎ হয় নি।

সিদ্ধির চরম শীর্ষে

তোতার মনে যে দ্বন্দ্ব জেগেছিল তা ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাসে এক পুরাতন দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের চাঞ্চল্যে যুগে যুগে বহু সাধকের চিত্ত সংশয়াকুল হয়ে উঠেছে, বহু সাধককে নিবিড় অনুভূতির সংস্পর্শে এই প্রশ্নের মীমাংসা জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এই প্রশ্ন দ্বন্দ্ব হিসাবে কখনও জাগে নি। তিনি জন্মেছিলেন জীবনসমুদ্রের সব কিছু মণিমুক্তাকে লাভ করার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে—এই আকাঙ্ক্ষা তাঁর অন্তরে জাগিয়ে তুলেছিল এক বিরাট ঔদার্য। নিজের চারিদিকে সীমার বন্ধনে গণ্ডী সৃষ্টি করতে তিনি চাইতেন না। সব কিছুকে প্রথমে গ্রহণ করে জীবনে পরীক্ষা করব—এই ছিল তাঁর অন্তরের স্বাভাবিক চেষ্টা। তাই অসাবধানে বর্জনের আবর্তে পড়ে কোন দিন তাঁকে মিথ্যা হাবুডুবু খেতে হয় নি —জীবনের কোন রত্নকে হারাতেও হয় নি।

শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, অদ্বৈতভাব সব চেয়ে উঁচু স্তরের পথ। তিনি উপমাচ্ছলে বলতেন: "ওটা সব শেষের কথা। কি রকম জানিস্? যেমন অনেক দিনের পুরোনো চাকর। মনিব তার গুণে খুশী হয়ে তাকে সকল কথায় বিশ্বাস করে সব বিষয়ে পরামর্শ করে। একদিন খুব খুশী হয়ে তার হাত ধরে নিজের গদিতেই বসাতে গেল। চাকর সঙ্কোচ হয়ে কি কর, কি কর বললে। মনিব কিন্তু জোর করে টেনে বসিয়ে বললে, আঃ, বস্ না। তুইও যে আমিও সে।—সেই রকম হচ্ছে অদ্বৈত ভাব।" *

কিন্তু পথ বিভিন্ন হতে পারে, লক্ষ্য তাবলে বিভিন্ন নয়। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার। "যিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনিই কালী।" তবে একের অনুভূতি সাধক ভেদে বিভিন্ন কেন? শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ জীবনের বিকাশের মধ্যে সে প্রশ্নেরও মীমাংসা পেয়েছিলেন: "কি জান রুচিভেদ আর যার যা পেটে সয়। তিনি নানা ধর্ম, নানা মত করেছেন অধিকারী বিশেষের জন্যে। সকলে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী নয়, তাই আবার তিনি সাকার পূজার ব্যবস্থা করেছেন। মা ছেলেদের জন্যে বাড়িতে মাছ এনেছে। সেই মাছে ঝোল অম্বল ভাজা আবার পোলাও করলেন। সকলের পেটে কিছু পোলাও সয় না। তাই কারুর সাধ অম্বল খায় বা মাছ ভাজা খায়। প্রকৃতি আলাদা আবার অধিকারী ভেদ।" †

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্দ্ধ।

† শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, তৃতীয় ভাগ।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষা স্বকীয়, উপমা সম্পূর্ণ নতুন কিন্তু তাঁর মীমাংসার মধ্যে নতুনত্ব কিছু ছিল না। তোতা এবং যুগে যুগে আরও সাধকশ্রেষ্ঠও এই মীমাংসার সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু তোতার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের এক বিষয়ে পার্থক্য ছিল। তোতা হয়ত অবস্থার যোগাযোগে ক্ষণিকের জন্য এই সত্যের অনুভূতি পেয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের চেষ্টায় প্রত্যেক পথে খুঁটিনাটি বিধি মেনে সাধনা করে বিশেষ বিশেষ উপলব্ধির দ্বারা বারে বারে চরম উপলব্ধির রসাস্বাদন করেছিলেন। তাই তাঁর মুখের কথা এত জীবন্ত, তাঁর জীবন সারা বিশ্বের আকর্ষণের বস্তু। এখানে তোতা বড় কি শ্রীরামকৃষ্ণ বড় সে প্রশ্ন উঠছে না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষত্ব হচ্ছে বিচিত্র পথকে তিনি সত্য বলে মেনে নিয়ে নানা মতে সাধনা করেছিলেন। বিচিত্র সিদ্ধির সমষ্টিতে গড়ে উঠেছিল এই মহাবাউলের চরম জয়ের মালা। ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-ইতিহাসে আর কোন মহামানুষের জীবনে তা দেখা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃতি ছিল জটিল উপাদানে গড়া। তাঁর অন্তরের মানুষটির মধ্যে ছিল একের আকারে বহুর সমাবেশ। বাইরে থেকে তাঁকে দেখ্‌লে মনে হত তিনি যেন নিতান্ত সাদাসিদা সরল মানুষটি। উপর থেকে হিমালয়ের এক রঙা আবরণ দেখে কে বুঝতে পারে গুহায় গুহায় তার কত না বিচিত্র রত্নরাজি লুকিয়ে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতরে বিচিত্র ছিলেন বলেই এমন অপরূপ-ভাবে তিনি বিচিত্রকে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন,—মধুরভাব ও অদ্বৈতভাবের মধ্যে নিখুঁতভাবে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পেরেছিলেন। কোন উপায়ে বিভিন্ন পথের সমন্বয় তিনি করতে চান নি,—আকবরের মত নানা ধর্মের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বগুলি ও নানা পথের শ্রেষ্ঠ নির্দেশগুলি নিয়ে এক নতুন মতধারা গড়তে চান নি। সকল পথের স্বকীয় রূপ ও সৌন্দর্য তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কোন একটিকে লোপ করে কোন একটির প্রতিষ্ঠা করতে চান নি। তিনি সাধন বলে বুঝেছিলেন, যত মত তত পথ। কেননা, সকল পথই তাঁর জীবনে এক চরম লক্ষ্যে এসে পরিণতি লাভ করেছিল।

যত মত তত পথ-এর অনুভূতি

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে অদ্বৈতসাধন পরিচ্ছেদ শেষ হলে আর একটি সাধনার সুযোগ উপস্থিত হল। এ সাধনা প্রাচীন বা আধুনিক আর কোন ভারতীয় সাধক কোন কালে আপন জীবনে স্বইচ্ছায় গ্রহণ করে সিদ্ধিলাভ করেন নি। এ দিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবনকে অদ্বিতীয় বলা যেতে পারে। এমন করে বিচিত্রভাবে নিঃশেষে জীবনকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন বলেই সাধক জীবনের শেষে তাঁর অন্তর মানুষের প্রতি পরম করুণায় রসঘন হয়ে উঠেছিল।

শ্রীগোবিন্দ রায় জাতিতে ক্ষত্রিয়। পারসী ও আরবী ভাষায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। ধর্মজিজ্ঞাসু হয়ে নানা সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এসে শেষে তিনি ইসলাম মতে আকৃষ্ট হন এবং যথারীতি দীক্ষা নেন। স্বভাবতঃ তিনি ভক্তি-মার্গের পথিক ছিলেন। সুফী সম্প্রদায়ের ভাবধারা তাঁর ভাল লেগেছিল। তিনি সুফী দরবেশদের মত ভাবসাধন করতেন।

ফকির বেশে ঘুরতে ঘুরতে তিনি এই সময়ে এসে ওঠেন দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে। তখন কালীবাড়িতে অতিথি সেবায় জাতিধর্মের বিচার করা হত না। সকল রকম সাধুফকিরদেরই সমাদরে ভিক্ষা দেওয়া হত। ফকিরকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের মনে সাড়া জাগল। কত পথেই তিনি ত সাধন করলেন, —এ পথটাই বা বাকী থাকে কেন! এ পথেও ত কত লোক দেশে দেশে সিদ্ধিলাভ করেছেন।

কোন কোন লেখকের ধারণা, সর্বধর্ম সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ এ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তখন জগদম্বার শরণাগত হিসাবে এমনই বালকস্বভাব পেয়েছেন যে নিজের চেষ্টায় আগে থেকে পরিকল্পনা করে কোন কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ সময়ে কি পরবর্তী সময়ে কৃত্রিম উপায়ে ধর্মসমন্বয়ের কোন চেষ্টা কোনদিন তিনি করেন নি। তাই মনে হয়, ইসলাম মতে সাধনার ইচ্ছা তাঁর জেগেছিল ব্রহ্ম উপলব্ধির নব রস আস্বাদন করার দুর্বার আগ্রহের জন্যই।

তিনি এসে গোবিন্দকে ধরলেন। গোবিন্দ রাজী হলেন। মথুরামোহন সব শুনলেন,—যা যা দরকার সেইমত ব্যবস্থা করা শেষ হল। শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরামোহনের কুঠিতে উঠে এলেন। যথাবিধি ইসলাম ধর্মে তাঁর দীক্ষা হল। মুখে

আল্লাহ নাম, ধ্যান করতে—জপ করতে লাগলেন আল্লাহ। মন থেকে হিন্দুভাব লুপ্ত হয়ে গেল, হিন্দু দেবদেবীকে প্রণাম করা বন্ধ করলেন। এমন কি এত যে আদরের মা—তাঁকেও মুছে দিলেন মন থেকে। মার মন্দিরে যাওয়া ছাড়লেন। শুধু মূল তত্ত্বের সম্বন্ধে নয়, বাইরের আঙ্গিক সম্বন্ধেও তিনি সব সময়ে খুব হুঁশিয়ার থাকতেন। এই সময়ে কাছা না দিয়ে কাপড় পরতেন, ত্রিসন্ধ্যা নমাজ করতেন, মুসলমানদের প্রিয় খাদ্য সকল খেতেন। তাঁর মধ্যে তিলমাত্র ফাঁকি ছিল না। অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে গোমাংসও আস্বাদন করা ত চাই। তিনি সে ব্যবস্থাও করতে বললেন। রসদদার মথুরামোহন কিন্তু এবার আর চুপ করে থাকতে পারলেন না! সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে লাগলেন যেন এ ইচ্ছা তিনি সম্বরণ করেন। শেষে তাঁর বারবার অনুনয় বিনয়ের ফলে শ্রীরামকৃষ্ণ সে সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন।

তারপর কিছুদিন তিনি নতুন সাধনায় ডুবে রইলেন। একদিন হঠাৎ ধ্যানে এক লম্বা দাঁড়িগোঁফভরা মুখ, সুগম্ভীর দিব্য পুরুষকে দেখতে পেলেন। দেখতে দেখতে সগুণ বিরাট ব্রহ্মের উপলব্ধি ক্রমে ঘনীভূত হয়ে তুরীয় নির্গুণ ব্রহ্মের অনুভূতিতে লীন হয়ে গেল। অদ্বৈতবাদী শ্রীরামকৃষ্ণ নব রসাস্বাদনের উল্লাসেতে বিভোর হয়ে উঠলেন।

*

* *

প্রায় সাত বছর পরে এমনি ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ খ্রীষ্টমতেও সাধনা করেছিলেন। তখন শ্রীশম্ভুচরণ মল্লিক তাঁর রসদদার। তিনি কলকাতার বিখ্যাত ধনী। সমাজে তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ির দক্ষিণ পাশে তাঁর বাগান ছিল। তখন তিনি বাগানে প্রায়ই এসে দুএক দিন কাটিয়ে যেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। বাগানে এলেই তিনি মন্দির থেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে ডেকে নিয়ে গিয়ে নানা আলাপ আলোচনায় কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে তাঁর বাগানে বেড়াতে যেতেন। শম্ভু না থাকলেও কর্মচারীরা তাঁর সঙ্গে খুব সশ্রদ্ধ ব্যবহার করতেন। একদিন এমনি শ্রীরামকৃষ্ণ বাগানে গেছেন, কর্মচারীরা বৈঠকখানা ঘর খুলে দিয়ে তাঁকে বসিয়েছেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল

দেওয়ালে টাঙানো একটি ছবির উপর। ছবিখানিতে ছিল মার কোলে ঈশার বালগোপাল মূর্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশার বিষয়ে জানতেন। লেখাপড়া তিনি বিশেষ করেন নি বটে কিন্তু তাঁর অনন্যসাধারণ অনুসন্ধিৎসা জীবনের প্রধান প্রধান বিষয়ে তাঁকে অজ্ঞ থাকতে দেয় নি। পরে বিশ্ববিদ্যালয়েপড়া, ইংরেজীজানা কোন কোন ভক্ত তাঁর খবরাখবরের পরিধির পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করতেন, মশাই, আপনি লেখাপড়ার কখন ধার ধারেন নি, এত সব জানলেন কোথা থেকে? শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে জবাব দিতেন, নিজে পড়ি নি বটে কিন্তু ঢের সব যে শুনেছি গো। সে সব মনে আছে। অপরের কাছ থেকে—ভাল ভাল পণ্ডিতের কাছ থেকে বেদবেদান্ত, দর্শন, পুরাণ সব শুনেছি। শুনে তাদের ভেতর কি আছে জেনে তারপর সেগুলোকে দড়ি দিয়ে মালা গেঁথে গলায় পরে নিয়েছি। তারপর এই নে তোর শাস্ত্রপুরাণ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দে বলে মার পাদপদ্মে ফেলে দিয়েছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশার ত্যাগোজ্জ্বল জীবনের গল্প জানতেন—তিনি তাঁকে বিশেষ ভক্তি করতেন। তাই ছবিখানিতে ঈশার মধুমাখা বালমূর্তি দেখতে দেখতে তাঁর জীবনকথা ভাবছিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ যেন সেই মূর্তি জ্যোতির্ময়, জীবন্ত, দিব্য শিশুরূপে জেগে উঠলেন। মা ও খোকার দেহ থেকে আলোক-মালা বিচ্ছুরিত হয়ে যেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরে এসে উপস্থিত হল,—তাঁর মনের মধ্যে এক তুমুল আলোড়নে সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল। জন্মগত হিন্দু-সংস্কার সকল লীন হয়ে নতুন সংস্কারের দল যেন জেগে উঠল। অর্দ্ধচৈতন্য শ্রীরামকৃষ্ণ নানাভাবে আপনাকে সামলাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কাতর হয়ে জগদম্বাকে স্মরণ করে বলতে লাগলেন, মা, আমাকে আজ এ কি করছিস্? কিন্তু সব প্রার্থনাই নিষ্ফল হল। নতুন ভাবের প্রবল বন্যায় পুরোতন ভাব সব তলিয়ে গেল। হিন্দুর দেবদেবীর প্রতি তাঁর সকল অনুরাগ বিলীন হয়ে খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, ভাব ও অনুষ্ঠানআঙ্গিকের প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠল। তিনি যেন দেখতে লাগলেন, তাঁর সামনে ঈশাভক্ত পাদ্রীরা পরম ভক্তির সঙ্গে ছবির সামনে ধূপদীপ সাজিয়ে রেখে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা জানাচ্ছেন। এমনি আনমনা অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ কালীবাড়িতে ফিরে এলেন, তিন দিন সেই ভাবতরঙ্গে ডুবে রইলেন। মার পূজা আরাধনা ও অন্যান্য ত্যর কথা একেবারে ভুলে গেলেন। তিন দিন পরে পঞ্চবটী তলায় বেড়াতে

বেড়াতে হঠাৎ তিনি দর্শন পেলেন এক গৌরবর্ণ, জ্যোতিঃস্নাত, চাপানাসা, বিদেশী পুরুষ মূর্তির। মুখে তাঁর কি অপরূপ দেবভাব! কে ইনি? শ্রীরামকৃষ্ণ অবাক্ হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। ক্রমে সেই মূর্তি এগিয়ে আসতে লাগল,—আরও কাছে, আরও কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরের মধ্যে কার যেন কথা শুনতে পেলেন, ইনিই ঈশামসি, পরম যোগী, মানুষের প্রেমে আত্মহারা ঈশামসি। দিব্য মূর্তি এসে শ্রীরামকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করতে করতে তাঁর শরীরে লীন হয়ে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে চৈতন্যসাগরে ডুবে গেলেন।

অনেক দিন পরে যখন দেশদেশ থেকে ভক্তের দল দক্ষিণেশ্বরে দিব্য পুরুষের কাছে মহাজীবনের অমৃত কথা শুনতে আসতেন তখন সকলেই লক্ষ্য করতেন তাঁর ঘরে একখানি যীশুর ছবি আর জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের একটি শ্বেত পাথরের মূর্তি সাজানো রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় ইষ্ট নাম করতে করতে এঁদের সামনে ধূপধুনা দিতেন।

সিদ্ধি ও সিদ্ধাই

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন জীবনের লক্ষ্য ছিল সিদ্ধি,—সিদ্ধাই নয়। পৃথিবীর নানা দেশে খুব পুরাকাল থেকেই সাধারণ মানুষের ধারণা, আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে আধিভৌতিক শক্তির নিবিড় যোগাযোগ আছে। একের সিদ্ধি মানেই আর এককে পাওয়া। শ্রেষ্ঠ ভক্ত মানে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধাইএর অধিকারী ; সাধারণ মানুষ বস্তুজগতে যে শক্তির প্রকাশ দেখতে না পায় তা সহজে ধারণা করতে পারে না। আধ্যাত্মিক শক্তি মূলতঃ মনোজগতের ব্যাপার। কিন্তু তা ত প্রত্যক্ষ করা যায় না। বস্তুজগতে যা স্বাভাবিক তাকে যে শক্তি চোখের সামনে উলটিয়ে দিতে পারে তাকেই লোকে মানে, ভয় করে। এ শুধু সাধারণ লোকের ধারণা নয়, ভারতবর্ষে বহু ধর্মসম্প্রদায় আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে এই আধিভৌতিক শক্তির সাধনাও করে এসেছেন। শোনা যায়, তন্ত্রপন্থীরা সিদ্ধিলাভের সঙ্গে সঙ্গে নানা সিদ্ধাই লাভ করেন। শ্রীমৎ তোতা একজন উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন। তিনি যে সন্ন্যাসীমণ্ডলীর মহান্ত ছিলেন তাঁরা অদ্বৈত সাধক। শোনা যায়, তাঁদের মত সাধকেরাও সিদ্ধাইএ বিশ্বাস করতেন। তোতা বিদ্যাপ্রভাবে তামা প্রভৃতি ধাতুকে সোনা করে দিতে পারতেন। তাঁর সম্প্রদায়ের প্রাচীন পরমহংসেরা এ বিদ্যার চর্চা রাখতেন। তিনি নিজে গুরুপরম্পরায় এই শক্তি পেয়েছিলেন। তিনি নাকি বলতেন, নিজের স্বার্থে বা ভোগবাসনার জন্য এই বিদ্যা প্রয়োগ করতে মানা আছে,—তাতে গুরুর অভিসম্পাত দেওয়া আছে। তবে তাঁদের মণ্ডলীতে অনেক সাধু থাকতেন। মহান্তকে কখন কখন তাঁদের নিয়ে তীর্থ ভ্রমণে যেতে হত, তাঁদের খাবার বন্দোবস্ত রাখতে হত। গুরুর হুকুম ছিল, সেই সব কাজে টাকার অভাব পড়লে তখন যেন এই বিদ্যা প্রয়োগ করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ইচ্ছা করলে তোতার কাছে এই বিদ্যা শিখতে পারতেন। কিন্তু সিদ্ধাই লাভে তাঁর মন ছিল না। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল, যারা হীনবুদ্ধি তারাই সিদ্ধাই চায়। সাধকের পক্ষে নিষ্কাম, অহেতুকী ভক্তিই শ্রেষ্ঠ কামনার বস্তু। সংসারে সচ্চিদানন্দলাভই পরম লাভ। যে বিদ্যা তা লাভে সাহায্য করে তা-ই যথার্থ বিদ্যা, যা করে না তা সর্বদা বর্জনীয়।

যীশুর জীবনকাহিনী 'মিরাকেল'-এর গল্পে সমৃদ্ধ। বাইবেলে কত যে এমন ঘটনার উল্লেখ আছে তার সংখ্যা নেই। যীশু যেখানেই গেছেন তাঁর কাছে

আগে এসে হাজির হত কোন না কোন দুরারোগ্য রুগী। যীশুর দিব্যশক্তির প্রভাবে তাদের অচিরে রোগমুক্তি হত। মানুষের প্রেমে পাগল এই মহা-মানুষ অবশ্য যা কিছু আধিভৌতিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন সর্বত্রই তা মানুষের উপকার করার প্রেরণায় করেছিলেন। কিন্তু কারুর উপকারের জন্যও শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধাইএর সাহায্য নিতে চাইতেন না। সিদ্ধাই সম্বন্ধে প্রথম থেকেই তাঁর অন্তরে তীব্র বিতৃষ্ণা ছিল। হৃদয় তখন তাঁর সেবায় নিযুক্ত। তিনি মামার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাঁর ছিল তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধি। সংসারীদের কাছে সিদ্ধাইএর প্রভাব যে কত বড় তা তিনি বুঝতেন। মামার অদ্ভুত আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা দেখে এক সময়ে তিনি বার বার মামাকে বলতে লাগলেন, মামা, মার কাছে একটু ক্ষমতা চেও।

শ্রীরামকৃষ্ণ রাজী নন।

হৃদয় কিছুতেই ছাড়েন না, রোজ মামাকে অনুনয়বিনয় করে বোঝান।

বালকস্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণের তখন মার কাছে সব কথা না বলে নিস্তার নেই। সব বিষয়েই মার সঙ্গে আলোচনা করা চাই। একদিন হৃদয়ের বিশেষ পীড়া-পীড়িতে তাঁর ইচ্ছে হল মাকে ক্ষমতা দেবার কথা একবার বলে দেখবেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি কালীঘরে ঢুকলেন। কিন্তু মুখ দিয়ে মনের কথা জানাবার আর সুযোগ পেলেন না,—হঠাৎ তাঁর মনের মধ্যে এক বিশ্রী ছবি ফুটে উঠল। শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধাইলাভের অসারতা বুঝতে পারলেন, ভিতর থেকে যেন একটা দুশ্চিন্তার বোঝা নেমে গেল। তিনি মন্দির মধ্যেই জগজ্জননীর গভীর ধ্যানে তন্ময় হয়ে গেলেন।

পরে তিনি শিষ্যদের বলতেন, ও সব সিদ্ধাইএ আছে কি? ও সবের বন্ধনে পড়ে মন সচ্চিদানন্দ থেকে দূরে চলে যায়। গল্পে আছে, একজনের দুই ছেলে ছিল। বড়র যৌবনেই বৈরাগ্য হল, সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেল। আর ছোট লেখাপড়া শিখে বিয়ে করে সংসারধর্ম করতে লাগল। সাধুদের নিয়ম আছে, বার বছর অন্তে ইচ্ছে হলে একবার জন্মভূমি দর্শন করতে যায়। ঐ সন্ন্যাসীও তাই বার বছর পরে ছোট ভাইয়ের কাছে ফিরে এল। ভায়ে ভায়ে দেখা হতে দুজনের কত না আনন্দ হল। ছোট ভাই দাদাকে প্রাণপণ যত্নে সেবা করতে লাগল। তারপর একদিন ছোট বড়কে জিজ্ঞাসা করলে, দাদা তুমি যে এই সংসারের ভোগসুখ সব ত্যাগ করে এতদিন সন্ন্যাসী হয়ে ফিরলে, এতে কি পেলে আমাদের বল। ছোট ভাইয়ের কথা শুনে দাদা

বললে, দেখবি কি পেয়েছি? তবে আমার সঙ্গে আয়। দুজনে এসে হাজির হল নদীর তীরে। সেখানে দাঁড়িয়ে বড় বললে, এই দেখ। এই বলে সে জলের ওপর দিয়ে হনহন করে হেঁটে পরপারে চলে গেল। ওপারে গিয়ে বললে এবার দেখলি কি পেয়েছি? ছোট আধ পয়সা দিয়ে খেয়া নৌকায় পার হয়ে, এসে বললে, কি দেখলুম? বড় বললে, কেন, এই যে হেঁটে নদী পেরিয়ে আসা? তখন ছোট হেসে জবাব দিলে, দাদা, এই এর জন্যে তুমি এত কষ্ট সহ্য করে বার বছর নষ্ট করেছ? আমি ত আধ পয়সায় ও কাজ করলুম। তোমার ক্ষমতার দাম ত আধ পয়সা।

শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধাই সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তোলবার জন্যে আরও একটি রূপক গল্প বলতেন: একজন যোগী যোগ সাধনায় বাক্‌সিদ্ধি পেয়েছিল। যাকে যা বলত তাই তৎক্ষণাৎ হত। এমন কি কারুকে যদি বলত মর ত অমনি সে মরে যেত। আবার যদি তখনি বলত বেঁচে ওঠ ত মড়া জ্যান্ত হয়ে উঠত। একদিন ঐ যোগী পথে যেতে যেতে এক ভক্ত সাধুকে দেখতে পেলে। দেখলে, তিনি সব সময় জপধ্যান করছেন। লোকের মুখে শুনলে, সাধুটি ঐ-ভাবে ঐখানে অনেক বছর ধরে তপস্যা করছেন। দেখে শুনে অহঙ্কারী যোগী সাধুর কাছে গিয়ে বললে, ওহে, এতকাল ধরে ত ভগবান্ ভগবান্ করছ, কিছু পেলে বলতে পার? ভক্ত সাধু বললে, কি আর পাব ভাই, তাঁকে পাওয়া ছাড়া ত আমার অন্য কোন কামনা নেই। আর তাঁকে পাওয়া তাঁর কৃপা ছাড়া হয় না। তাই পড়ে পড়ে তাঁকে ডাকছি, দীন হীন বলে যদি কোনদিন আমাকে কৃপা করেন। যোগী তা শুনে জবাব দিলে, যদি কিছু নাই পেলে তবে এ পণ্ডশ্রম করা কেন? যাতে কিছু পাও তার চেষ্টা কর। ভক্ত প্রথমটা চুপ করে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, আচ্ছা ভাই, তুমি কি পেয়েছ শুনতে পাই কি? যোগী বললে, শুনবে আর কি, এই দেখ। এই বলে কাছে একটা মোটা গাছের গুঁড়িতে একটা হাতী বাঁধা ছিল। তার দিকে চেয়ে বললে, হাতী তুই মর্। অমনি হাতীটা মরে পড়ে গেল। যোগী দম্ভভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, দেখলে? আচ্ছা আবার দেখ। তারপর হাতীর দিকে ফিরে বললে, হাতী তুই বেঁচে ওঠ। সঙ্গে সঙ্গে হাতীটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। যোগী আবার বললে কি হে, দেখলে ত? সাধু এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি। এবার মুখ খুললেন, কি আর দেখলুম, ভাই! হাতীটা একবার মলো আবার বেঁচে উঠল। কিন্তু আপনার হল কি? হাতীর মরাবাঁচায় আপনার

কি এসে গেল! আপনি কি ঐ শক্তি পেয়ে জন্ম মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন? জরাব্যাধির কবল থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন? না, আপনার অখণ্ড সচ্চিদানন্দের স্বরূপ দর্শন হয়েছে?

আগেই বলেছি চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরে কোন দিন দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংশয় জাগে নি। সাধনার লক্ষ্য স্থির করতেই কত না সাধকের কত দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মেছিলেন অপূর্ব ধারণা শক্তি ও অসামান্য ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে। তাঁকে ছোটখাটো দ্বিধাসংশয় সমাধানের কাজে শক্তি ও সময় নষ্ট করতে হয় নি বলেই এক জীবনের সামান্য পরিসরে তিনি যাত্রাপথের চরম প্রান্তে পৌছতে পেরেছিলেন। তাঁর ধারণাশক্তির তীক্ষ্ণতা ও বিরাটতার কথা ভেবে বিস্মিত না হয়ে থাকা যায় না। তিনি যে যুগে জন্ম নেন তখন হিন্দুসাধনার বড় দুঃসময়। বাংলাদেশের প্রতিভাবান্ মানুষেরা অনেকেই ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির মোহে অন্ধ। অপরদের মধ্যে যদি বা কারুর কারুর হিন্দু অধ্যাত্ম সম্পদের দিকে দৃষ্টি ছিল তাঁরা সিদ্ধাইকেই চরম লক্ষ্য বলে মনে করতেন। এমনকি ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী প্রথম দেখার দিনে যে দুজন শ্রেষ্ঠ যোগীর কথা শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন—পূর্ববঙ্গের সাঁধক সেই চন্দ্র এবং গিরিজাও সিদ্ধাই পরম বস্তু বলে আয়ত্ত করেছিলেন। এমনি পরিমণ্ডলের মধ্যে বাস করেও শ্রীরামকৃষ্ণ কোনদিন বিপথে পা বাড়ান নি,—শক্তিসাধনা ছেড়ে শক্তিলাভের অপসাধনায় মন দেন নি। তাঁর অন্তর ছিল স্বকীয়তায় মহীয়ান্, কোন কিছুকে তিনি অন্ধভাবে নিতে পারতেন না,—আচরিত আদর্শকে শুধু আচরিত বলে মেনে নিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর অপরিসীম স্বকীয়তায়। বাইরের স্পর্শমণির লোভে তিনি অন্তরের স্পর্শমণির সন্ধান ত্যাগ করেন নি। "যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মান না মণি"—সেই সম্পদকেই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে স্বীকার করে তিনি সুকঠোর সাধনায় বছরের পর বছর কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

তীর্থপথে নতুন ঠাকুরদর্শন

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস। রক্ত আমাশা ভাল হয়ে গেছে কিন্তু তখনও শরীর দুর্বল। সামনে বর্ষাকাল, গঙ্গার নোনা, ঘোলাটে জল খেয়ে পাছে আবার আমাশা হয় এই ভেবে ঠিক হল, শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয় ও ভৈরবীর সঙ্গে কয়েক মাস কামারপুকুরে থাকবেন। মথুরামোহন ও তাঁর স্ত্রী জগদম্বা দেবী সব ব্যবস্থা করে দিলেন। এবার প্রায় আট বছর পরে শ্রীরামকৃষ্ণ দেশে ফিরলেন। তাঁর দক্ষিণেশ্বরের গল্প কামারপুকুর অঞ্চলে অনেকেরই কানে গেছল। তাই দলে দলে লোক তাঁকে দেখবার জন্য আসতে লাগল। রাতদিন যেন চন্দ্রাদেবীর সংসারে আনন্দের হাট বসে গেল।

আত্মীয়েরা জয়রামবাটীতে লোক পাঠালেন সারদামণিকে আনবার জন্য। তাঁর তখন বয়স চোদ্দ। বিয়ের পর শ্রীরামকৃষ্ণের আর তাঁর সঙ্গে দেখা নি। সংসারের সকল চাওয়াপাওয়ার পারে আজ শ্রীরামকৃষ্ণের মন। দীর্ঘ সাধন-জীবনের তন্ময়তার মধ্যে স্ত্রীর কথা চিন্তা করবার সুযোগ তাঁর ঘটে নি। এতদিন পরে হঠাৎ সারদা দেবীকে পেয়ে কি করবেন তিনি! আত্মীয়দের মনে মনে বিশেষ দুর্ভাবনা ছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আচারব্যবহার দশজনের মত ছিল না। ধরাবাঁধা মাপকাঠি দিয়ে তাঁর চালচলনের বিচার করা যেত না। স্ত্রীকে কাছে পেয়ে তিনি অতি সহজভাবে গ্রহণ করলেন। সকলে তা দেখে অবাক হয়ে গেল।

পৃথিবীতে এই অসাধারণ মানুষটি অতিসাধারণ মানুষের যা কিছু অবশ্য করণীয় তা সবই পরম যত্নের সঙ্গে করে গেছেন। দেবজীবনের সূর্যতাপে তিনি সাধারণ জীবনটিকে পুড়িয়ে নষ্ট করে দেন নি। তাই মানুষের এতবড় দরদী বন্ধু পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কম দেখা যায়।

একদিন রামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীর এক সাধুর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করছিলুম। আমরা কথাপ্রসঙ্গে বললুম, শ্রীরামকৃষ্ণদেব মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আকাশ ছুঁয়েছিলেন—মাটি থেকে পা সরিয়ে নেন নি। তাই লোকে তাঁকে অবতার বলে ভক্তি করে,—ভালবাসে।

সাধু উত্তর দিলেন, না, শ্রীরামকৃষ্ণ আকাশ থেকে এসে মাটিতে তাঁর চরণ রেখেছিলেন তাই তিনি অবতার।

অবশ্য এ সমস্যার মীমাংসা করা সহজ নয়। যিনি বিরাট তাঁকেই নানা লোকে নানা ভাবে দেখে—নানা নামে ডাকে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি মানবলোকের উর্দ্ধে উঠেও মানুষের সমাজে বাস করে গেছেন। মানুষের সঙ্গে জাগতিক সকল সম্বন্ধপাশ ছিন্ন করেও তিনি সহস্রপাশে আপনাকে বেঁধে রেখেছিলেন। অদ্বৈতবাদী তোতার কোন জাগতিক বন্ধন ছিল না। এগার মাস দক্ষিণেশ্বরে একত্রে বাস করলেও কেউ তাঁর মাভাইবোনের পরিচয় কোনদিন পায় নি। তাঁর মধ্যে অবশ্য সাধারণ মানুষের জীবন নিঃশেষে ভস্মীভূত হয় নি কারণ তাঁর ক্ষুধাতৃষ্ণা ছিল। যতদিন দেহে ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকবে ততদিন জড়জগতের স্বাভাবিক নিয়মের পাশ নিঃশেষে ছেদন করা কোন মানুষেরই পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ইহলোকে সাধারণ জড়-জীবনকে যতদূর লুপ্ত করে দেওয়া সম্ভব তার জন্য তোতা নিরন্তর চেষ্টা করে গেছেন। নিজেকে যত সামান্যই হোক তবু তিলমাত্র সমাজবন্ধনে জড়িয়ে পড়তে দেবেন না বলেই তিনি মহান্তের গদি পাবামাত্র মঠ ত্যাগ করে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে অদ্বৈতবাদের রুদ্র মরুর মধ্যে কোথায় যেন এক খণ্ড মানবিকতার মরু-উদ্যান নিত্য বিরাজিত ছিল। তাই মানুষের ঋণ তিনি কোন দিন ভুলতে পারেন নি, যার যা প্রাপ্য তা যথাসাধ্য দিয়ে গেছেন।

বৈরাগী স্ত্রীকে কাছে পেয়ে দিব্যসঙ্গ দান ও নিঃস্বার্থ আদর যত্ন করতে লাগলেন। একদিন অগ্নিসাক্ষী করে ইহসংসারে তাঁর সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। দেবতা, গুরু, অতিথি প্রভৃতির সেবা ও গৃহকাজে তিনি যাতে বিশেষ সুপটু হয়ে ওঠেন, সমাজে আত্মীয়বন্ধু সকলের সঙ্গে যথাসাধ্য ব্যবহার করতে পারেন, যেটুকু সংসারীপনা না জানলে পৃথিবীতে বাস করা দুরূহ—সেই সব বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ ধৈর্যের সঙ্গে শিক্ষা দিতে লাগলেন। স্বামীর আদর-যত্ন, সুসঙ্গ এবং শিক্ষায় সারদামণি নতুন মানুষটি হয়ে গেলেন। এই সময়কার অনির্বচনীয় আনন্দের কথা তিনি প্রায় পরবর্তী জীবনে শিষ্যশিষ্যাদের কাছে গল্প করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্ত্রীর সঙ্গে এমনই সহজবৎ ব্যবহার করতেন যে কয়েক বছরের অন্তরঙ্গ পরিচয় থাকা সত্ত্বেও ভৈরবী যোগেশ্বরী পর্যন্ত তাঁকে ভুল বুঝেছিলেন। তিনি বার বার সাবধান করে দিয়েছিলেন। এই সব আলোচনার ফলে কিছুকাল পরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করে কাশী যাত্রা করেন।

এবার কামারপুকুরে আসার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শরীর সারানো। শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিকে উদাসীন ছিলেন না। আধ্যাত্মিক জীবনের খুঁটিনাটির দিকে যেমন তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল লৌকিক জীবনের খুঁটিনাটির সম্বন্ধেও তেমনি তিনি সজাগ ছিলেন। দরকার হলে এ বিষয়ে মোটেই তিনি অমনোযোগী হয়ে থাকতেন না। পঙ্গু শরীরটাকে যাতে পুনরায় সবল করে তোলা যায় তার জন্য খাওয়ার সম্বন্ধে এ সময়ে বিশেষ সাবধানে থাকতেন। শাক খাওয়া আমাশা রোগীর পক্ষে খুব দরকার, তিনি শাক খেতে ভালও বাসতেন। প্রত্যেক দিন ভোরে যখন বিছানা থেকে উঠতেন তখনও বেশ অন্ধকার থাকত। সেই সময়ে রোজ স্ত্রীকে বলে দিতেন, আজ এই সব রান্না করো গো। আজ অমুক শাকটা আনিও।

সাধারণতঃ দেখা যায়, জীবনে যাঁরা গভীর কিছু নিয়ে ব্যাপৃত থাকেন, নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের ছোটখাটো ব্যাপারে তাঁদের অনেকের মন থাকে না। হয়ত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিজের খাওয়ার সম্বন্ধে উদাসীন। হয়ত গঠন কাজে সুদক্ষ রাজনৈতিক নেতার সংসার সব চেয়ে বিশৃঙ্খল। হয়ত নামজাদা চিত্রকরের আঁকার ঘরখানি সব চেয়ে ময়লাভরা। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন এঁদের সম্পূর্ণ বিপরীত মানুষ। এই সময় থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নিরন্তর ভাবমুখে থাকতেন কিন্তু তা বলে রোজকার জীবনের সামান্য সামান্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে বেহুঁশ হয়ে থাকতেন না। অবশ্য সমাধিস্থ হয়ে যখন একেবারে চৈতন্য হারাতেন সেই সময়ে বাইরের কোন বিষয়েই তাঁর হুঁশ থাকত না। প্রতিদিনের বাস্তবজীবনে তিনি খুব গোছালো মানুষ ছিলেন। দৈনন্দিন জীবনের অতি দরকারী জিনিসপত্রের খোঁজ নিজেই রাখবার চেষ্টা করতেন। তাঁর চার পাশে যেখানে যে জিনিসটি রাখতেন কোন কাজের জন্য তা নিলে কাজের শেষে আবার সেইখানেই ফিরে রেখে দিতেন। নিজের কাপড়চোপড়ের খোঁজ রাখবার জন্য অপর কারুর উপর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে ভালবাসতেন না। বাইরে যাবার সময় প্রায়ই একটি বেটুয়া সঙ্গে থাকত। কখন কোথাও সেই বেটুয়া ফেলে আসতেন না। একবার কলকাতায় ভক্তদের বাড়িতে এসেছেন। সঙ্গে ছিলেন প্রতাপ বলে একজন ভক্ত। নানা আলোচনার পর শ্রীরামকৃষ্ণ যথাসময়ে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন। এসে শুনলেন প্রতাপ তাঁর গামছাখানি শহরে ভক্তদের বাড়িতে ফেলে এসেছেন। সে কথা শুনে ভক্তকে ভৎর্সনা করে বললেন, ভগবানের নামে আমার পরনের কাপড়ের হুঁশ

থাকে না কিন্তু আমি ত একদিনও নিজের গামছা বা বেটুয়া কলকাতায় ভুলে আসি না। আর তোর একটু জপ করেই এত ভুল।

আমাদের দেশে ব্যক্তিগত জীবনে এ সব বিষয়ে এরূপ সজাগ দৃষ্টি খুব কম দেখা যায়। বরং ঐ বিষয়ে উদাসীন থাকাটাই আমরা সাংসারিকতাশূন্যতার পরিচয় হিসাবে গণ্য করে প্রশংসার বস্তু মনে করি। শ্রীরামকৃষ্ণের এই গুণ তাঁর সমসাময়িক চারপাশের সমাজজীবন থেকে আপনা হতে পাওয়া শিক্ষার ফল নয়,—এ তাঁর আপন চেষ্টায় লাভ করা অভ্যাস। তাঁর জীবনকাহিনী থেকে যদি আধ্যাত্মিক মহিমার কথা বাদ দেওয়া যায় তবুও তা লৌকিক জীবনের দীপ্তিতে যে অসামান্য—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রায় সাত মাস কামারপুকুরে থাকার পর সুস্থশরীরে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন। সেই সময়ে মথুরামোহন সদলবলে পশ্চিমাঞ্চলে তীর্থ ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর বিশেষ পীড়াপীড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ, হৃদয় ও চন্দ্রাদেবী তাঁদের সঙ্গে যাত্রা করলেন। তখন ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ। একে একে বৈদ্যনাথ, কাশী, প্রয়াগ ও বৃন্দাবন দেখা শেষ হল। এই তীর্থ পরিক্রমা সম্বন্ধে পরে তিনি একদিন গল্প করেছিলেন, "কাশীতে সেজবাবুদের সঙ্গে রাজাবাবুদের বৈঠকখানায় গিছিলুম। সেখানে দেখি তারা বিষয়ের কথা কচ্ছে!—টাকা জমি এই সব কথা। সে কথা শুনে আমি কাঁদতে লাগলুম। বললুম, মা, এ কোথায় আনলি? দক্ষিণেশ্বরে আমি যে বেশ ছিলুম। প্রয়াগে দেখলুম, সেই পুকুর সেই দূর্বা, সেই গাছ, সেই তেঁতুল পাতা। কেবল তফাত এই যে, পশ্চিমে লোকের ভুষির মত বাহ্যে। * * *

"তবে তীর্থে উদ্দীপন হয় বটে। সেজবাবুর সঙ্গে বৃন্দাবনে গেলুম। কালীয়দমন ঘাট দেখবামাত্রই উদ্দীপন হত, আমি বিহ্বল হয়ে যেতুম। হৃদে আমাকে যমুনার সেই ঘাটে ছোট ছেলেটির মত নাওয়াত। * * যমুনার তীরে সন্ধ্যের সময় বেড়াতে যেতুম। যমুনার চড়া দিয়ে সেই সময় গোষ্ঠ হতে গরু সব ফিরে আসত। দেখবামাত্র আমার কৃষ্ণের উদ্দীপন হল, উন্মত্তের মত আমি দৌড়তে লাগলুম কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই বলতে বলতে। * * * পালকি করে শ্যামকুণ্ডু রাধাকুণ্ডুর পথে যাচ্ছি, গোবর্দ্ধন দেখতে নামলুম। গোবর্দ্ধন দেখবামাত্রই একেবারে বিহ্বল, দৌড়ে গিয়ে গোবর্দ্ধনের উপরে দাঁড়িয়ে পড়লুম আর সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যশূন্য হয়ে গেলুম। তখন ব্রজবাসীরা গিয়ে আমায় নামিয়ে আনে। শ্যামকুণ্ডু রাধাকুণ্ডুর পথে সেই মাঠ আর গাছপালা, পাখি, হরিণ—এই সব

দেখে বিহ্বল হয়ে গেলুম। চক্ষের জলে কাপড় ভিজে যেতে লাগল। মনে হতে লাগল, কৃষ্ণরে, সবই রয়েছে, কেবল তোমায় দেখতে পাচ্ছি না। পালকির ভিতরে বসে, কিন্তু একবারও একটি কথা কইবার শক্তি নেই, চুপ করে বসে। হৃদে পালকির পিছনে আসছিল, বেহারাদের বলে দিসল, খুব হুঁশিয়ার।* * * গঙ্গামায়ী বড় যত্ন করত। অনেক বয়স। নিধুবনের কাছে কুটিরে একলা একলা থাকত। আমার অবস্থা আর ভাব দেখে বলত, ইনি সাক্ষাৎ রাধা, দেহধারণ করে এসেছেন। আমায় দুলালী বলে ডাকত। তাকে পেলে আমার খাওয়াদাওয়া, বাসায় ফেরার কথা সব ভুল হয়ে যেত। হৃদে এক একদিন বাসা থেকে খাবার এনে খাইয়ে যেত। সেও খাবার জিনিস তয়ের করে খাওয়াত। গঙ্গামায়ীর ভাব হত। তার ভাব দেখবার জন্যে লোকের মেলা লেগে যেত। ভাবেতে একদিন হৃদের কাঁধে চড়েছিল। গঙ্গামায়ীর কাছ থেকে দেশে চলে আসবার আমার ইচ্ছে ছিল না। সব ঠিক ঠাক, আমি সিদ্ধ চালের ভাত খাব, গঙ্গামায়ীর বিছানা ঘরের এদিকে হবে, আমার বিছানা ও দিকে হবে। সব ঠিক ঠাক। হৃদে তখন বললে, তোমার এত পেটের অসুখ, কে দেখবে? গঙ্গামায়ী বললে, কেন আমি দেখব, আমি সেবা করব। হৃদে এক হাত ধরে টানে আর গঙ্গামায়ী আর এক হাত ধরে টানে। এমন সময় মাকে মনে পড়ল। মা তখন সেই একলা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ির নবতে। আর থাকা হল না। তখন গঙ্গামায়ীকে বললুম, না, আমায় যেতে হবে।"*

কাশীতে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গস্বামীর দেখা হয়েছিল। তীর্থে তীর্থে সাধকসাধিকার সংস্রবে ও আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের সংস্পর্শে তিনি বার বার গভীর সমাধির মধ্যে ডুবে যান। কিন্তু বৈদ্যনাথ ধামে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। এই নির্বিকল্প সমাধির অধিকারী মহামানুষ এক অদ্ভুত কাজ করে বসেন। শহরের কাছাকাছি এক গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় তিনি দেখতে পেলেন, রোগা শুকনো সাঁওতাল ছেলেমেয়ের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে, গাঁয়ের লোকদের চরম দারিদ্র্য, গায়ে ছেঁড়া কাপড়, অনাহারে বিষণ্ণ মুখ।

পরম কারুণিক তিনি। মানুষের এত বড় দুর্দশা চোখের উপর দেখে কি উদাসীন হয়ে থাকতে পারেন! অদ্বৈতের আগুনে তোতার এ দৃষ্টি পুড়ে ছাই হয়ে গেছল—মানুষ হয়ে চার পাশের মানুষের দুঃখে তিনি কোনদিন কাঁদতে পারেন নি। তাইত তোতার অদ্বৈতলাভ তাঁর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ফল

*শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, তৃতীয় ভাগ।

হয়ে গেছে আর তাঁর শিষ্যের অদ্বৈত জ্ঞান আজ বিশ্ববাসীর জীবনভাণ্ডারে অক্ষয় হয়ে বিরাজ করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরকে ডেকে বললেন, এদের বড় কষ্ট। তুমি এদের এক মাথা করে তেল আর একখানা করে কাপড় দাও। আর পেটটা ভরিয়ে একদিন খাইয়ে দাও।

বিষয়ী মথুর কুণ্ঠিত ভাবে জবাব দিলেন, বাবা!

শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন তাঁর আপত্তির ইঙ্গিত। বললেন, তুমি ত মার সম্পত্তির দেওয়ান,—সম্পত্তি ত তোমার নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি মথুরের চিরদিন ছিল প্রগাঢ় ভক্তি। বাবার জন্য পয়সা খরচ করতে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হতেন না। কিন্তু এই প্রবাসে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে এতগুলি টাকা খরচ করা যে মুস্কিল। তিনি সবিনয়ে জানালেন, বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে। এও দেখছি এক গাঁ লোক—এদের সকলকে খাওয়াতে গেলে আমাদের টাকার অভাব পড়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় আপনি কি— ?"

অদ্বৈত সাধকের ছু চোখ বেয়ে তখন ঝরঝর করে জল পড়ছে। তিনি বালকের মত গোঁ ভরে বললেন, দূর শালা, তোর কাশী আর আমি যাব না। এদের কাছেই থাকব। এদের যে কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাব না।

মথুর নিরুপায় হয়ে শেষে বাবার নির্দেশ মত সব ব্যবস্থা করলেন। পেটপুরে খেতে পেয়ে গরিব দুঃখীদের কি আনন্দ! তাদের আনন্দ দেখে শ্রীরামকৃষ্ণও আনন্দে আটখানা।

আর একবার এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে মথুরামোহন বাবাকে তাঁর রানাঘাটের কাছে জমিদারীতে বেড়াতে নিয়ে গেছেন। সেখানে পর পর দুবছর অনাবৃষ্টি হয়েছিল, ফসল হয় নি। চাষীদের দুর্দশার সীমা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ তা দেখে আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। মথুরকে বললেন, এবার আর খাজনা নিও না। এরা মার প্রজা। এদের তুমি সাহায্য কর।

সেবারও বাবার হুকুম মথুরামোহন এড়াতে পারেন নি। গরিব প্রজাদের স্ত্রী পুরুষ সকলকে একদিন নেমন্তন্ন করে এক মাথা তেল ও এক একখানি করে নতুন কাপড় দান করেছিলেন আর পেট ভরে খাইয়েছিলেন।

নতুন বেশে মাটির দেশে ফিরে আসা

যাত্রীদল প্রায় চার মাস তীর্থে তীর্থে ঘুরে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন। এর পর কয়েক বছর কেটে গেল। এর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ দুজন অতি কাছের মানুষকে হারান। তাঁর ভাইপো অক্ষয় মারা যান ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি কাকার খুব প্রিয়জন ছিলেন, কালীবাড়িতে পূজারীর কাজ করতেন। আর ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পরম ভক্ত মথুরামোহন চোদ্দ বছর অকুণ্ঠিত মনে বাবার সেবা করে পরলোকে চলে যান। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের যাতে ভবিষ্যতে কষ্ট না হয় সেই উদ্দেশ্যে একটা আর্থিক সংস্থান করে রেখে যাবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের নামে একটা তালুক লিখে দেবেন এই সঙ্কল্প করেন। একদিন এ বিষয়ে হৃদয়ের সঙ্গে পরামর্শ করছেন, মন্দিরের ভিতর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের কথাবার্তা শুনতে পান। তিনি বাইরে এসে বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, না, এমন কাজ কখনও করো না।

ভক্ত করুণভাবে বললেন, কেন বাবা? না কিছু করলে যে আমি স্থির হতে পাচ্ছি না।

—না অমন বুদ্ধি করো না, ওতে আমার হানি হবে।

শত চেষ্টা করেও মথুর শ্রীরামকৃষ্ণকে কিছুতেই রাজী করাতে পারেন নি।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে অদ্বৈতঅনুভূতির অমৃতরসে ডুব দিয়ে ছ মাস কাটাবার পর ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা দেখা যায়। এতদিনে প্রস্তুতির স্তর এসে পৌছয় পরিণতির স্তরে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে হোমা পাখি আকাশের আলো লক্ষ্য করে ছুটেছিল, আলোর রাজ্যে পৌছে সে তার গতি পরিবর্তন করলে। গতিহীন জড় হয়ে ত সে থাকতে পারে না। চলাই তার ধর্ম, চলার আনন্দই তার পরম কামনার ধন। তাই আবার সে নেমে এল মাটির দেশে। পুরাতন আকার তার আর নেই, তবু সে পুরাতন হোমা পাখিই। দেহ তার দিব্য আলোয় ভরা, কণ্ঠে তার অজানা সুরের মাতন। তার অতি অদ্ভুত পাখা দুটি মাটিতে বসেই আলোর আকাশ পর্যন্ত সেতু সৃষ্টি করে তুললে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই আদর্শ নিয়ে দিব্যসাধনা শুরু করেছিলেন যে ভগবান নিত্য,

জগৎ মিথ্যা। যখন তিনি আদর্শের চরম অনুভূতির রাজ্যে পৌঁছলেন তিনি দেখলেন, ভগবান নিত্য, জগৎই ভগবান্। অবশ্য যুক্তি হিসাবে দুটি প্রতিপাদ্যই এক কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে অনুভূতি হিসাবে দুই এক নয়। একই বস্তুকে যে যে রঙের চশমা দিয়ে দেখে তার মনে সেই রঙের ছোপ পড়ে, অবশ্য তাতে বস্তুর পরিবর্তন কিছু হয় না। তোতা তাঁর অনুভূতির চরম স্তরে পৌঁছে বুঝেছিলেন, ভগবান নিত্য, জগৎ মিথ্যা। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাময় মন সেই অনুভূতিতেই দেখেছিলেন, ভগবান নিত্য, জগতই ভগবান। চরম অনুভূতির পর তোতার কাছে মানুষ শূন্য হয়ে গেল—তিনি মানুষগোষ্ঠীর কোন খোঁজ নিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ লোকগুরু হয়ে মাটির দেশে ফিরে এলেন। সেই ফিরে আসা কয়েক বছর ধরে ধীরে ধীরে ঘটেছিল।

মথুরামোহনের মৃত্যুর পর তাঁকে কালীবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয় নি। ভক্তের মৃত্যুর কয়েক বছর আগে একদিন ভাবাবিষ্ট হয়ে তিনি বলেছিলেন মথুর, তুমি যতদিন থাকবে ততদিনই আমি দক্ষিণেশ্বরে থাকব।

নিজের পরিবারবর্গের সঙ্গে মহাপুরুষের সম্পর্কচ্ছেদের কথা ভেবে মথুরামোহন বড় কষ্ট অনুভব করেছিলেন। তিনি শিউরে উঠে বলেছিলেন, কেন বাবা, আমার স্ত্রী, ছেলে,—ওরাও যে তোমাকে খুব শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে।

মথুর বেঁচে থাকতেই রানী রাসমণির সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়দের মধ্যে নানা গোলযোগ লেগেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তা আরও বেড়ে যায়। তবু তাঁর স্ত্রী জগদম্বা দেবী স্বামীর অবর্তমানে "বাবা"র যতদূর সাধ্য সেবাযত্ন করেছিলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে জগদম্বা দেবীর মৃত্যুর পর প্রায় আরও তিন বছর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁর লোকগুরু জীবনের প্রায় পুরোভাগই এখানে কাটে। মথুরামোহনের মৃত্যুর পর কয়েক বছর শ্রীশম্ভু মল্লিক পরম ভক্তিভরে তাঁর সুখসুবিধার ভার গ্রহণ করেছিলেন।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ। তখন মার্চ মাস। ইষ্টের নাম ধ্যান জপ ও ভগবানের কথা আলোচনা করে এবং বেশির ভাগ সময় নিবিড় সমাধিতে ডুবে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের দিন কাটছিল। তখন মন্দিরের উঠানের উত্তর পশ্চিম কোণে তিনি থাকেন। মাত্র একখানি ঘর, সামনে একটি বারন্দা। হঠাৎ একদিন রাত নটার সময় দেশ থেকে সারদামণি এসে কালীবাড়িতে উপস্থিত হলেন। পথশ্রমে তাঁর জ্বর হয়েছিল। চকিতে শ্রীরামকৃষ্ণ আপন কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন। একখানি মাত্র ঘর, রোগী কোথায় শোবে—

কেই বা তার শুশ্রূষা করবেন। শেষে তিনি নিজের ঘরে রুগ্ন স্ত্রীর বিছানা করিয়ে দিলেন। পরিচর্যা ও যত্নের অভাবে পাছে সারদামণির মনে কষ্ট হয় সেই ভয়ে বার বার করে বলতে লাগলেন, তুমি এতদিনে এলে? আর কি আমার সেজবাবু আছে যে তোমার যত্ন হবে? দরদীর মনে আজ বার বার মথুরামোহনের অকুণ্ঠিত সেবার কথা মনে পড়তে লাগল।

পরের দিন সকাল বেলা ডাক্তার ডাকিয়ে রোগীর যথাসাধ্য ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়ে দিলেন। তাঁর ব্যবস্থার গুণে কয়েক দিনের মধ্যেই সারদামণি সুস্থ হয়ে উঠলেন। পাশাপাশি অনেকের মনে প্রশ্ন উঠল, সন্ন্যাসী এবার যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে কি করবেন? শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝলেন, সারদামণি আর ছেলেমানুষ নেই। আর তিনি দূরে দূরে থাকতে চান না। স্বামীর সেবা করার উদ্দেশ্যে দক্ষিণেশ্বরে সংসার পাততে চান। জীবনপথে যখন যে দায়িত্ব এসে পড়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও তা হেলাভরে এড়িয়ে যান নি। সেই নতুন কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে জীবনকে সেইভাবে ভেঙে গড়ে নিয়েছেন। এই ভাঙাগড়ার কাজ করতে গিয়ে তাঁর জীবনের কোন অমূল্য সম্পদ খোয়া যেত না, বরং বারেবারেই তিনি নতুন নতুন সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন।

সারদামণিকে পেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝলেন, জীবনে এ এক নতুন পরীক্ষা। স্ত্রীকে নিয়ে শেষে কালীবাড়ির এক অংশেই তাঁর দিব্য সংসার পাতলেন। সে এক অপরূপ সংসার—বাঁধনশূন্যতাই তার সব চেয়ে বড় বাঁধন, নির্লিপ্ত নিরাসক্তিই সব চেয়ে বড় স্বার্থ। ছেলে বয়স থেকে সমাজের বাইরে উদাসীন সন্ন্যাসীদের মঠে প্রতিপালিত তোতার মত শ্রীরামকৃষ্ণ অসাংসারিক ছিলেন না। সংসারের সব কিছু দুঃখযন্ত্রণা, অভাবঅসুবিধার কথা তিনি বুঝতেন। অন্তর্জীবনের পরীক্ষার কথা ছেড়ে দিলেও স্ত্রীকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে সংসার পাতায় বাস্তব জীবনে যে কত বিপদ, কত অসুবিধা আসতে পারে তা তাঁর ধারণা ছিল। সাধারণ লোকে তাঁর অলৌকিক সংসারের কথা বুঝবে না। সন্ন্যাসজীবনের সম্বন্ধে তাদের ধারণা নিতান্ত বাইরের ব্যাপার—লঘু ও ভাসাভাসা। তাদের মধ্যে যারা স্বভাবতঃ খুঁতমার্গী তারা হয়ত বিদ্রূপ করবে, পরমহংস রামকৃষ্ণ এবার পরমহংসী নিয়ে এসেছেন। অভাবের দিনে অর্থের চিন্তা হয়ত অদ্বৈতমার্গী মনকে ঘিরে ফেলবে। তবু তিনি পিছিয়ে যান নি। মহাবীর বীরের মতই জীবনের খণ্ড পরীক্ষাগুলিতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তাঁর পরম নির্ভর স্থল ছিলেন তাঁর ইষ্টদেবী। তিনি যে মায়ের

শরণাগত। মা লীলাচ্ছলে যেমন খেলা খেলাবেন সেই খেলাই তিনি খেলবেন। তিনি ফুলের কুঁড়ি, দখিন হাওয়া আপন স্পর্শে আপনভাবে তাঁকে রঙেগন্ধে ভরিয়ে তুলবে। যিনি যন্ত্রী তিনিই যন্ত্র পরিচালনার ভার নেবেন।

দুজনের পরম আনন্দে দিন কাটে। শ্রীরামকৃষ্ণের পেটের গোলমাল প্রায়ই হত। স্ত্রী তাঁর প্রতিদিনের শারীরিক অবস্থার উপযুক্ত খাবার তৈরি করে দিতে লাগলেন। ভাবাবিষ্ট অবস্থায় খাবার নাইবার সম্বন্ধে তাঁর হুঁশ থাকত না, সারদামণি সযত্নে সে বিষয়ে তদারক করতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও একান্ত ধৈর্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে স্ত্রীকে নিজের পথে আকর্ষণ করতে লাগলেন। তিনি সাধারণ সাধকদের মত নারী বলে তাঁকে কোনদিন নিজের সাধনপথের বিঘ্ন হিসাবে গণ্য করেন নি। সারদামণি যেন তাঁর জীবনতীর্থপথের সঙ্গী,— অপরূপকে লাভ করার সন্ধানে দুজনেই যেন পাশাপাশি চলেছেন। পথেই শুরু হয়েছে তাঁদের পরিচয়, পথেই ঘনিয়ে উঠেছে পরস্পরের মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধ।

শ্রীরামকৃষ্ণ আগেই বার বার সে পথের শেষে ঘুরে এসেছেন তাই সঙ্গিনীকে সেই ঘুরে আসা পথের সম্বন্ধে নানা গল্প বলতেন যাতে সঙ্গিনীর স্বাভাবিক উৎসাহ শতগুণে বেড়ে যায়। একদিন বললেন, হরিণের নাভিতে কস্তুরী হয়, তখন তার গন্ধে হরিণগুলো দিকে দিকে ছুটে বেড়ায়। জানে না, কোথা থেকে গন্ধটি আসছে। তেমনি ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন। মানুষ তাঁকে জানতে না পেরে ঘুরে মরছে।

তাঁদের দুজনের স্বামীস্ত্রীর আলাপ হত এমনি কত মনমাতানো, আগুন-ভরা কথায়। শ্রীরামকৃষ্ণের এই সব গল্পের মধ্যে উপদেশ দেবার নিছক দাম্ভিক চেষ্টা থাকত না। তিনি সারদামণিকে কোন কিছুতে জোর করতেন না। স্ত্রীর ব্যক্তিমর্যাদায় কোনদিন আঘাত দিতেন না; পৃথিবীতে জীবন ত শুধু আদর্শ ও ভাব নিয়ে চলে না। তাঁর স্ত্রী বাংলাদেশের হিন্দুসমাজের সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে। স্বভাবতঃই তাঁর জীবনে অনেক বাধা,—অনেক জট। বিশেষ শিক্ষা ও দক্ষতা ছাড়া সাংসারিক জীবনে মেয়েদের সুখে শান্তিতে দিন কাটানো খুবই কঠিন। শ্রীরামকৃষ্ণ তা জানতেন। তাই সারদামণিকে সারাজীবন নানাভাবে লৌকিক শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি নিজে টাকা ছুঁতে পারতেন না, লোকের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দানে তাঁর খরচ চলত। কারুর কাছে কোনদিন তিনি কিছু চাইতেন না। এমন অবস্থায় সারদামণি যদি খুব নির্লোভ, সাবধানী, গোছালো ও কৌশলী না হয়ে উঠতেন তাহলে মর্যাদা রক্ষা

করে সংসার করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ত। নানাভাবের মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণের মহাজীবনের আশ্রয়ে এসে হাজির হতেন। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে ব্যবহার করার জন্য যে কোন মেয়ের পক্ষেই খুব দক্ষতার দরকার ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ স্ত্রীকে সেই দক্ষতা লাভ করার কাজে সুনিপুণভাবে সাহায্য করতেন। তিনি পরম যত্নে তাঁকে আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক জীবনের উপযুক্তরূপে গড়ে তোলবার চেষ্টা করতেন। তিনি সারদামণিকে এ বিষয়ে যে সব কথা বলতেন তা চরম লৌকিক জ্ঞানে দীপ্ত। শিক্ষা দেবার তাঁর কত না কৌশল ছিল। একদিন দুপুরে সারদামণি চুপ করে বসে আছেন, হাতে কোন কাজ নেই, মনটা আনমনা। অবশ্য এ ঘটনা ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের অনেক পরের ব্যাপার। শ্রীরামকৃষ্ণ স্ত্রীকে সেই ভাবে দেখে কতকগুলো পাট যোগাড় করে এনে বললেন, এগুলো দিয়ে আমাকে শিকে পাকিয়ে দাও ত, আমি সন্দেশ রাখব ছেলেদের জন্যে। তারপর স্ত্রীর কাজ শেষ হলে হাসতে হাসতে বললেন, সব সময়ে কোন না কোন কাজে হাত দিয়ে থাকতে হয়। মেয়েমানুষের বসে থাকতে নেই। বসে থাকলে নানা রকম বাজে চিন্তা—কুচিন্তা সব আসে।

তিনি নিজের মধ্যে চিরদিন একজন আত্মবিচারককে জাগিয়ে রাখতেন; স্ত্রীকে কাছে রেখে একদিকে যেমন তাঁকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে শিক্ষা দিতে লাগলেন আর একদিকে নিজেকে কঠোরভাবে পরীক্ষা করতে লাগলেন। একদিন তিনি স্ত্রীকে বললেন, আমি সব মেয়েকে সাক্ষাৎ আনন্দময়ী মা বলে জ্ঞান করি। তোমাকেও তাই করি। কিন্তু তোমায় বিয়ে করেছি। তুমি যদি আমাকে মায়ার মধ্যে টানতে চাও ত আমাকে আসতেই হবে।*

সারদামণি স্বামীর উপযুক্ত আধার ছিলেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিনী হবার পথই বেছে নিয়েছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি স্বামী সে কথা বুঝতে পেরে তিন মাস যেতে না যেতেই এক অদ্ভুত কাজ করে বসলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস। সেদিন ঘোর অমাবস্যা। ফলহারিণী কালীপূজার পুণ্য তিথি। শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়কে দিয়ে নিজের ঘরে চুপিচুপি পূজার বিশেষ আয়োজন করালেন। দেবীর আসনের জন্য আলপনাআঁকা একটি পিঁড়ে পাতা হল। সারদামণিকে আগে থেকে খবর দেওয়া ছিল, পূজার সময় হলে তিনি ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজায় বসলেন। একে একে প্রথম কৃত্য

* "মাই মাষ্টার" —স্বামী বিবেকানন্দের লেখা।

শেষ হল। স্ত্রী একমনে বসে বসে দেখছেন,হঠাৎ স্বামীর ইঙ্গিত পেলেন আলপনা-আঁকা পিঁড়ের উপর বসবার জন্য। এ কি অদ্ভুত ইঙ্গিত! কিন্তু বিশেষ বিচার করবার চৈতন্য আর তাঁর রইল না। কে যেন তাঁর চারিদিক আচ্ছন্ন করে দিলে এক রহস্যজালে। অর্দ্ধচেতন অবস্থায় মন্ত্রমুগ্ধের মত তিনি গিয়ে বসলেন দেবীর আসনে। স্বামী তাঁকেই দেবীজ্ঞানে মন্ত্র পড়তে লাগলেন, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী, মা ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধির দ্বার খুলে দাও। এঁর দেহমন পবিত্র করে এঁর মধ্যে আবির্ভূত হয়ে কল্যাণ কর।

ষোড়শোপচারে পূজা শেষ হলে সারদামণি সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। শ্রীরামকৃষ্ণও ভোগের মন্ত্র পড়বার সময় সমাধির মধ্যে ডুবে গেলেন। সেই অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। নিশুতি রাত গভীরতর হয়ে উঠল। শেষে পূজারী চৈতন্যের রাজ্যে ফিরে এসে আরাধ্য মূর্তির পাদপদ্মে নিজের সর্বস্ব সমর্পণ করলেন।

এই ঘটনার পর স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ হয়ে উঠল আরও নিবিড়। কিন্তু তখনও শ্রীরামকৃষ্ণের নিজেকে নিয়ে পরীক্ষার শেষ হয় নি। এ সময় তারা রাতে একসঙ্গে শুতেন। ভাবসমাধির মাতন তখন শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে খুব প্রবল। দিব্যভাবে রাতের পর রাত কেটে যেত। কখন আবার রাতভোর স্ত্রীর সঙ্গে নানা সদ্‌ আলোচনা করতেন। একদিন রাতে সারদামণি ঘুমিয়ে পড়েছেন, হঠাৎ সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের চৈতন্য হল। তিনি চেয়ে দেখলেন পাশে স্ত্রী শুয়ে। তা দেখে নিজের মনকে উদ্দেশ্য করে বার বার বলতে লাগলেন, মন, এর নাম নারীদেহ। লোকে একে পরম ভোগ্য বলে মনে করে। একে ভোগ করবার জন্যে নিত্য লালায়িত হয়ে থাকে। কিন্তু এই ভোগের মধ্যে মজলে দেহ নিয়েই পড়ে থাকতে হবে,—সচ্চিদানন্দ ভগবানকে পাওয়া যাবে না। মন, তুমি ভাবের ঘরে চুরি করো না। ঠিক করে বল তুমি ভগবানকে চাও না এই ভোগ চাও? যদি কিছুমাত্র ভোগের বাসনা থাকে ত এই সামনে রয়েছে, ভোগ কর। বিচার করতে করতে শ্রীরামকৃষ্ণের মন সহসা কামনাতীত রাজ্যে উঠে সমাধিস্থ হয়ে গেল। সে রাতে আর হুঁশ ফিরে এল না। পরের দিন সকাল বেলা তাঁর কানে নাম শোনাতে শোনাতে তবে চৈতন্য ফিরে এল।

আর একদিন রাতে সারদামণিও স্বামীকে পরীক্ষা করেছিলেন। সেদিন

শ্রীরামকৃষ্ণ শুয়ে আছেন, পাশে বসে স্ত্রী পা টিপে দিচ্ছেন। হঠাৎ প্রশ্ন হল, আচ্ছা, বলত, আমাকে তোমার কি বলে বোধ হয়?

স্বামীর দিব্য অন্তরে ভাবের ঘরে চুরি ছিল না। তাই উত্তর দিতে তাঁর বেশি ভাবতে হয় নি। প্রশ্ন করা মাত্রই তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, যে মা মন্দিরে, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন। তিনিই নবতে এসে বাস করছেন। তিনিই এখন আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমাকে সত্যিসত্যি দেখতে পাই।

এইভাবে এক বছর আট মাস কেটে গেল। যত্নে আদরে শিক্ষায়, মধুর ব্যবহার ও দিব্য সঙ্গদানে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণিকে আপন পথের পথিক করে নিলেন। এর পর প্রায় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরেই তাঁদের দুজনের কাটে। মাঝে মাঝে কয়েকবার অল্প কিছুদিনের জন্য কামারপুকুর বা জয়রামবাটী ছাড়া আর কোথাও সারদামণি যাননি।

শ্রীরামকৃষ্ণসারদামণির দিব্যসংসারে ভারের চেয়েও দীপ্তি ছিল বেশি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই তাতে ছিল না,—না স্থান, না সম্পদ, না আসক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের উত্তরে ফুলের বাগান। তার পারে নহবৎ-খানা। সেই নহবতের নীচের ঘরে থাকতেন সারদামণি। এই ছোট ঘরখানিই তাঁর ভাঁড়ার, শোবার বসবার ঘর—তাঁর সারা সংসার। খরচের জন্য তাঁকে নির্ভর করতে হত মন্দিরের দপ্তর থেকে মাসিক গুটিকয়েক টাকার দানের উপর। পরে অবশ্য ভক্তের দল এসে হাজির হলে আরও কয়েকজন সামান্য মাসিক সাহায্য করতেন। তাঁদের সংসার প্রথমে শুরু হয় তিনজনকে নিয়ে—স্বামী, স্ত্রী ও চন্দ্রা দেবী। কিন্তু তখন থেকেই গুণমুগ্ধ স্ত্রীপুরুষ ভক্তদের আসাযাওয়া আরম্ভ হয়েছিল, তাই প্রতিদিনই অতিথির সমাগম হত। তবু অতি সামান্য উপকরণ নিয়ে এবং প্রায় নিঃসম্বলতা পাথেয় করে তাঁরা দিব্য বেদেবেদিনীর অপরূপ নীড় গড়ে তুলেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মন ত জড়জগতের চাওয়াপাওয়ার অনেক উপরে উঠে গেছল। সারদামণিও ক্রমশঃ স্বামীর মধ্যে নিজেকে এমন ভাবে নিঃশেষে উৎসর্গ করেছিলেন যে স্বামীর সেবা ছাড়া তাঁর জীবনে আর কোন চাওয়া ছিল না। তাই তাঁদের আনন্দভরা সংসারে আসক্তির ঝড়ো হাওয়া কোনদিন জাগে নি,—সেখানকার দ্যুতিময় শান্তির আলোও কোনদিন নিবে যায় নি। সেই সংসারের পরিধির মধ্যে যে যেভাবেই এসে পৌছক না কেন, সকলেরই অন্তরে জলে উঠেছিল দীপ।

জীবনের সব সংশয়, স্বার্থবিচার, জৈবিক জীবনের সুখআরামের চিন্তা ত্যাগ করে সারদামণি যেমন নিঃশেষে নিজেকে স্বামীর মধ্যে দান করেছিলেন, তীক্ষ্ণবোধ শ্রীরামকৃষ্ণের তেমনি ছিল স্ত্রীর প্রতি অপরিসীম বাৎসল্য ও মাধুর্য। তিনি একবার লক্ষ্য করলেন সারদামণি নিজের ছোট ঘরটিতে সংসারের কাজকর্ম, পূজাসেবা নিয়ে বদ্ধ হয়ে সারাদিন কাটিয়ে দেন। এতে তাঁর স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে,—একঘেয়ে জীবনের স্রোতে মন অবসন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীরামকৃষ্ণ এসে স্ত্রীকে বললেন, দেখ, বুনো পাখি খাঁচায় রাতদিন থাকলে বেতে যায়। মাঝে মাঝে তুমি পাড়ায় বেড়াতে যাবে। কিন্তু সঙ্গিনী কেউ নেই, মন্দিরের নানা পরিচিত লোকের সামনে দিয়ে একলা একলা সারদামণি পাড়ায় বেড়াতে যেতে পছন্দ করতেন না। অপরের তুলনায় তিনি স্বভাবতঃ খুব লজ্জাশীলা ছিলেন। অসুবিধার কথা জানতে পেরে শ্রীরামকৃষ্ণ শেষে নিজেই মাঝে মাঝে স্ত্রীকে সঙ্গে করে দুপুরে মন্দিরের ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতে লাগলেন।

স্ত্রীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে তাঁর যে সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ ছিল তা অতিআধুনিক, স্বাধিকারসচেতন নরনারীকেও বিস্ময়ে অভিভূত করে দেয়। একদিন সারদামণি স্বামীর ঘরে খাবার রাখতে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পিছন ফিরে বসেছিলেন, তাঁকে দেখতে পান নি। মনে করেছিলেন ভাইঝি লক্ষ্মীমণি বুঝি ঘরে এসেছেন। তিনি মুখ না তুলেই বললেন, যাবার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস্।

সারদামণি জবাব দিলেন, আচ্ছা।

স্ত্রীর গলার স্বর শুনে তিনি চমকে উঠলেন; মুখ তুলে মধুর কণ্ঠে বললেন, কে—তুমি! তুমি এসেছ তা আমি বুঝতে পারি নি। মনে করেছিলুম লক্ষ্মী এসেছে। কিছু মনে করোনি ত?

পরবর্তী কালে এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে সারদামণি প্রায়ই গদগদ কণ্ঠে বলতেন, আহা, তিনি আমার সঙ্গে কি ব্যবহারই করতেন! একদিনও মনে ব্যথা পাবার মত কিছু বলেন নি। কখনও ফুলটি দিয়েও ঘা দেন নি। কখনও আমাকে তুমি ছাড়া তুই বলেন নি।

অদ্বৈতসাধনার চরম উপলব্ধির পর শ্রীরামকৃষ্ণের মন মানুষের দেশে যতই ধীরে ধীরে নেমে আসতে লাগল, ততই তিনি সাধক মানুষের সংসর্গলাভের জন্য আকুলতা অনুভব করছিলেন। তাঁর সাধক জীবনের স্তরে স্তরে নানা সাধুসন্ন্যাসীভক্তের সমাগম হয়েছিল, তাঁদের সঙ্গসুধা তিনি আকণ্ঠ পান করে তৃপ্তিলাভ করেছিলেন। এবার কিন্তু নতুনভর মানুষদলের সন্ধান চাই। কে তাঁরা, কি রকম ধরণের তাঁরা—সে সম্বন্ধে প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণের কোনই ধারণা ছিল না। তাঁর ভিতরে শুধু একটা তীব্র আকুলতা জেগে উঠছিল মনের মানুষের জন্য। তাঁদের সন্ধান না পেলে সংসারের শুধু বিষয়ী মানুষের সংসর্গে তিনি দিন কাটাবেন কেমন করে?

এই সময়ে হয়ত তিনি ভাবমুখে তাঁর ভবিষ্যৎ লীলাময় জীবনের কিছু আভাস পেয়েছিলেন। একদিন মথুরামোহনকে কথায় কথায় বলেছিলেন, দেখ, মা আমায় সব দেখিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। 'এখান'কার (শ্রীরামকৃষ্ণের) সব ঢের অন্তরঙ্গ আছে, তারা সব আসবে। তারা 'এখান' থেকে ভগবানের বিষয় জানবে, শুনবে, প্রত্যক্ষ করবে, প্রেমভক্তি লাভ করবে। এ খোলটা দিয়ে মা অনেক খেলা খেলাবে, তাই এ খোলটা এখনও ভেঙে দেয় নি,—রেখে দিয়েছে।

এখনও কিন্তু তাঁর মনে বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে উঠতে পারে নি। স্বভাবসিদ্ধ সরল বালকের মত তিনি তাঁর ভাবমুখে দর্শনের কথা বিবৃত করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আচ্ছা, তুমি কি বল? এ সব কি মাথার ভুল, না ঠিক দেখেছি?

গুরুর ভবিষ্য জীবনের অসামান্য সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভক্তের ছিল নিবিড় বিশ্বাস। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, মাথার ভুল কেন হবে বাবা? মা যখন তোমায় এ পর্যন্ত কোনটাই ভুল দেখান নি, তখন এটাই বা কেন ভুল হবে? এটাও ঠিক হবে।

কিছু ক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলেন। তারপর নানা গুণীজনের সঙ্গমে গুরুর জীবনে বিচিত্র লীলাতরঙ্গ দেখার আগ্রহে মথুরামোহন বললেন, এখনও

তারা সব দেরি করছে কেন বাবা? তোমার অন্তরঙ্গরা শিগগির শিগগির আসুক না, তাদের নিয়ে আনন্দ করি।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গেরা তখন দক্ষিণেশ্বরের কয়েক মাইলের মধ্যে জীবনের স্পর্শমণির সন্ধানে ঘুরে মরছিলেন। দুপক্ষের মাঝখানে অপরিচয়ের দুর্ভেদ্য অন্ধকার। সেই অন্ধকার যবনিকার অপর পারে ভোরের আলো তখন তাঁর মধ্যাহ্নলীলার জন্য অংশুমালা ধীরে ধীরে দিকবিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে প্রস্তুত হচ্ছিল, —বিরাট শাল্মলী ক্রমে ক্রমে চারিদিকে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে তুলছিলেন।

এই অন্ধকার যবনিকা অপসরণের প্রথম সূত্রপাত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের মিলনে। কিন্তু এর কিছুদিন আগে থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতা শহরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে মনের মানুষের সন্ধান করছিলেন। মথুরামোহনের সঙ্গে একদিন তিনি জোড়াসাঁকোয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যান। তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। ধর্মসাধনায় তাঁর প্রবল অনুরাগের জন্য সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। হয়ত সেই অনুরাগের কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণের মহর্ষির সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা হয়। মথুরামোহন ছিলেন মহর্ষির সহপাঠী, হিন্দু স্কুলে এক সঙ্গে পড়তেন। তাই তিনি আগে কোন খবর না দিয়েই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তখন দেবেন্দ্র ব্যস্ত ছিলেন, বাড়িতে ডাক্তার এসেছিলেন।

মথুরামোহন শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়ে বললেন, ইনি তোমায় দেখতে এসেছেন, ইনি ঈশ্বর ঈশ্বর করে পাগল।

দেবেন্দ্র এ কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণকে বিশেষ খাতির করে বসালেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরে ভক্তদের কাছে এই সাক্ষাতের গল্প করতেন: আমি লক্ষণ দেখবার জন্য দেবেন্দ্রকে বললুম, দেখি গা তোমার গা। দেবেন্দ্র গায়ের জামা তুললে। দেখলুম গৌর বর্ণ তার উপর সিঁদুর ছড়ানো। তখন দেবেন্দ্রের চুল পাকে নাই। * * * প্রথম যাবার পর একটু অভিমান দেখেছিলুম। তা হবে না গা? অত ঐশ্বর্য, বিদ্যা, মানসম্ভ্রম? অভিমান দেখে সেজবাবুকে বললুম, আচ্ছা, অভিমান জ্ঞানে হয় না অজ্ঞানে হয়? যার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে, তার কি আমি পণ্ডিত, আমি জ্ঞানী, আমি ধনী বলে অভিমান থাকতে পারে? * * * দেবেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমার সেই অবস্থাটি হল। তখন কে কেমন লোক দেখতে পাই। আমার ভিতর থেকে যেন হী হী করে একটা হাসি উঠল। যখন ঐ অবস্থাটা হয় তখন পণ্ডিত ফণ্ডিত তৃণ জ্ঞান হয়।

যদি দেখি পণ্ডিতের বিবেকবৈরাগ্য নাই, তখন তাকে খড়কুটোর মত বোধ হয়। তখন দেখি শকুনি যেন উঁচুতে উঠেছে তবু তার নজর ভাগাড়ের দিকে। * * * দেখলুম যোগ ভোগ দুইই আছে। অনেক ছেলেপুলে ছোট ছোট; ডাক্তার এসেছে। তবেই হল, অত জ্ঞানী হয়ে সংসার নিয়ে সর্বদা থাকতে হয়। বললুম, তুমি কলির জনক। জনক এদিক উদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি। তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরে মন রেখেছ শুনে তোমায় দেখতে এসেছি। আমায় ঈশ্বরীয় কথা কিছু শোনাও। * * * বেদ থেকে দেবেন্দ্র কিছু কিছু শোনালে। বললে, এই জগৎ যেন একটি ঝাড়ের মত আর জীব হয়েছে এক একটি ঝাড়ের দীপ। আমি এখানে পঞ্চবটীতে যখন ধ্যান করতুম ঠিক ঐ রকম দেখেছিলুম। দেবেন্দ্রের কথার সঙ্গে মিল দেখে ভাবলুম, তবে ত খুব বড় লোক। তখন ব্যাখ্যা করতে বললুম। তা বললে, এ জগৎ কে জানত? ঈশ্বর মানুষ করেছেন তাঁর মহিমা প্রকাশ করবার জন্য। ঝাড়ের আলো না থাকলে সব অন্ধকার, ঝাড় পর্যন্ত দেখা যায় না।

এর পর তাঁদের দুজনের আরো অনেক কথাবার্তা হল। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে ভগবদ্ আলোচনা শুনে মহর্ষি খুব খুশী হলেন। সামনেই ব্রহ্মোৎসবের দিন ছিল। তিনি বললেন, সেদিন আমাদের উৎসবে আপনাকে আসতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমার ত এই অবস্থা দেখছ। কখন কি ভাবে তিনি রাখেন!

—না, আসতেই হবে। তবে ধুতি আর উড়োনি পরে আসবেন। আপনাকে এলোমেলো দেখে কেউ কিছু বললে আমার কষ্ট হবে।

বালকস্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, তা পারব না। আমি বাবু হতে পারব না।

দেবেন্দ্রনাথ ও মথুরামোহন তাঁর কথা শুনে খুব হাসতে লাগলেন। কিন্তু যথাযোগ্য পোশাক পরে সমাজে বার হওয়া সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের মনে একটি অদ্ভুত সংস্কার ছিল। তিনি এই অদ্ভুত মানুষটির দিব্যভাবে মুগ্ধ হয়েও তাঁর মনের সংস্কারের পাশ কাটাতে পারেন নি, পরের দিন মথুরামোহনকে লিখে-ছিলেন, রামকৃষ্ণ যেন সমাজে না আসেন। তাঁর গায়ে আচ্ছাদন থাকবে না, অভব্যতা হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবেন্দ্র মিলন থেকে আকাঙ্ক্ষিত ফল ফলে নি। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে খুব উচ্চ স্তরের সাধক বলে ধারণা করতে পারেন নি। দেবেন্দ্রও এই

নতুন মানুষটির দিব্য জীবনের পুরো রূপটি দেখতে পান নি। কেননা, প্রথম সাক্ষাতের পর পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টির আগ্রহ দুজনের কারুর মধ্যেই দেখা যায় নি। কয়েক বছর পরে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে একজন ভক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন, কেন, গৃহস্থের কি ত্যাগ হয় না? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর?

শ্রীরামকৃষ্ণ দু তিন বার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্র দেবেন্দ্র বলতে বলতে উদ্দেশে প্রণাম করলেন। তারপর একটি রূপক গল্প বলে তাঁর মতামত প্রকাশ করলেন: তা জান, একজনার বাড়িতে দুর্গোৎসব হত, উদয়াস্ত পাঁটাবলি হত। কয়েক বছর পরে আর বলির সে ধূমধাম রইল না। একজন জিজ্ঞাসা করলে? মশাই, আজকাল যে আপনার বাড়িতে বলির ধূমধাম নেই? সে বললে, আরে, এখন যে দাঁত পড়ে গেছে। দেবেন্দ্রও এখন ধ্যানধারণা করছে, তা করবেই ত।—তা কিন্তু খুব মানুষ! সংসারীরা একেবারে ডুবে থাকে, তাদের তুলনায় খুব ভাল।

এই রূপক গল্পের মধ্যে কোন বিদ্রূপের চেষ্টা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ভক্ত সম্বন্ধে ধারণা খুব উঁচু ছিল। তিনি বলতেন, ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত আর সংসারী ভক্ত অনেক তফাত। ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী,—ঠিক ঠিক ত্যাগীভক্ত মৌমাছির মত। মৌমাছি ফুল বই আর কিছুতে বসবে না। মধুপান বই আর কিছু পান করবে না। সংসারী ভক্ত অন্য মাছির মত সন্দেশেও বসছে, আর পচা ঘায়েও বসছে। বেশ ঈশ্বরের ভাবেতে রয়েছে, আবার কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে মত্ত হয়। * * * ঠিক ঠিক ত্যাগীভক্ত চাতকের মত। চাতক স্বাতী নক্ষত্রের মেঘের জল বই আর কিছু খাবে না। সাত সমুদ্র নদী ভরপুর। সে অন্য জল খাবে না। কামিনীকাঞ্চন স্পর্শ করবে না। কামিনীকাঞ্চন কাছে রাখবে না পাছে আসক্তি হয়। মনে হয়, এই উচ্চ আদর্শের মাপ কাঠিতে বিচার করে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রনাথকে খুব বড় ত্যাগী সাধক বলে স্বীকার করে নিতে পারেন নি। কিন্তু তাই বলে দেবেন্দ্রের জীবনে ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয়চেষ্টা, তাঁর শক্তি ও গুণের সম্বন্ধে কোন দিন অন্ধ ছিলেন না। যখনই তাঁর কথা গল্প করেছেন তাঁকে অসাধারণ লোক বলে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছেন। "তা কিন্তু খুব মানুষ"—এই অল্প কয়টি কথার মধ্যে সেই গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় রয়েছে।

মনে হয়, জীবনবিধাতা যে শুভ ক্ষণটির জন্য এতদিন প্রতীক্ষা করেছিলেন

শ্রীরামকৃষ্ণদেবেন্দ্র মিলনের মধ্যে সেই ক্ষণটির প্রকাশ চান নি। দেবেন্দ্রের বয়স হয়েছিল, শ্রেষ্ঠ অভিজাত কুলে পরম অভিজাত মন নিয়ে তিনি পৃথিবীতে জন্মেছিলেন। তাঁর প্রভাব বিস্তারের পরিধি ছিল ছোট, তিনি বাছা বাছা কয়েকজনের মধ্যে নিজের ভাবধারা ছড়াতে পেরেছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বাংলা ও ভারতবর্ষের ইংরেজীশিক্ষিত, আধুনিক সমাজের যোগ ঘটাবার জন্য প্রয়োজন ছিল একজন তরুণ বয়সের জননায়ক। সেকালে কেশবচন্দ্র ছিলেন এ কাজের উপযুক্ত পাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম সাক্ষাতে দেবেন্দ্রনাথকে দেখেছিলেন সংসারজীবনের তুচ্ছ কাজের ব্যস্ততার মধ্যে। কিন্তু কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয় সম্পূর্ণ বিপরীত সমাবেশের মধ্যে।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। মার্চ মাস। কেশব তখন শিষ্যদের সঙ্গে বেলঘরিয়ায় এক নামজাদা বাগান বাড়িতে সাধনভজন করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ খবর পেয়ে একদিন কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের গাড়িতে করে হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে সেই বাগানে এসে উপস্থিত হলেন। হৃদয় কেশবের সঙ্গে দেখা করে বললেন, আমার মামা হরিকথা আর হরিকীর্তন শুনতে বড় ভালবাসেন। আপনার নাম শুনে আপনাকে দেখতে এসেছেন। তাঁকে ভিতরে নিয়ে আসব কি?

—হ্যাঁ, নিয়ে আসুন।

কেশবচন্দ্র ও শিষ্যদল এক অদ্ভুত মহাভক্তের দর্শন পাবেন আশা করে উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছেন এমন সময় সাদাসিধাভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ এসে উপস্থিত হলেন। পরনে লালপেড়ে ধুতি, কোঁচার খুঁটটি বাঁ কাঁধের উপর দিয়ে পিঠের দিকে ঝুলছে। এসে বললেন, বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বরের দর্শন পেয়ে থাক? সেই দর্শন কেমন তা জানবার জন্যে তোমাদের কাছে এসেছি।

দুচারটি কথার আদানপ্রদানের পর শ্রীরামকৃষ্ণ গান ধরলেন:

"কে জানে কালী কেমন।
ষড়দর্শনে না পায় দরশন॥
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।
কালী পদ্মবনে হংসসনে হংসীরূপে করে রমণ॥
আত্মারামের আত্মাকালী প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন॥

প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু তরণ।
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন॥"

গাইতে গাইতে গভীর সমাধি। নিঃস্পন্দ দেহ, মুখে সুমধুর হাসির দীপ্তি, ডান হাতখানি উপরের দিকে তোলা। কিছুক্ষণ পরে কানে ওম্, ওম্ ধ্বনি শুনতে শুনতে অর্দ্ধবাহ্যাবস্থা হলে তিনি বলতে লাগলেন, কতকগুলো কানা একটা হাতীর কাছে এসে পড়েছিল। একজন লোক বলে দিলে, এ জানোয়ারটির নাম হাতী। তখন কানাদের জিজ্ঞাসা করা হল, হাতীটা কি রকম? তারা হাতীর গা স্পর্শ করতে লাগল। একজন বললে, হাতী একটা থামের মত। সে কেবল হাতীর পা ছুঁয়েছিল। আর একজন বললে, হাতীটা একটা কুলোর মত। সে কেবল একটা কানে হাত দিয়ে দেখেছিল। এই রকম যারা শুঁড় কি পেটে হাত দিয়ে দেখেছিল তারা নানা প্রকার বলতে লাগল। ঈশ্বর সম্বন্ধেও তেমনি। যে যতটুকু দেখেছে সে মনে করে ঈশ্বর এমনি, আর কিছু নয়।* * * * একজন বাহ্যে গিছিলি। দেখতে পেলে, গাছের উপর একটি সুন্দর জানোয়ার রয়েছে। সে ক্রমে আর একজনকে বললে, ভাই, অমুক গাছে একটি লাল জানোয়ার দেখে এলুম। সে লোকটি জবাব দিলে, আমিও দেখছি। তা সে লাল রঙ হতে যাবে কেন,—সে যে সবুজ রঙ। আর একজন বললে, না, না, সে সবুজ হতে যাবে কেন,—কাল। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক বসে আছে। জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি। তোমরা যা যা বলছ সব সত্যি। সে কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হলদে, কখন নীল, আরও কত কি হয়। আবার কখন দেখি কোন রঙই নাই। * * ব্রহ্ম যে কি তা মুখে বলা যায় না। সব জিনিস এঁটো হয়ে গেছে— বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়দর্শন সব এঁটো হয়ে গেছে, মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ করা হয়েছে, তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই। সে জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি আজ পর্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারে নাই। এক বাপের দুটি ছেলে। ব্রহ্মবিদ্যা শেখবার জন্যে ছেলে দুটিকে বাপ আচার্যের হাতে দিলেন। কয়েক বছর পরে তারা গুরুগৃহ হতে ফিরে এল, এসে বাপকে প্রণাম করলে। বাপের ইচ্ছে, দেখেন ব্রহ্মজ্ঞান কি রকম হয়েছে। বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাপু, তুমিত সব পড়েছ, ব্রহ্ম কি রকম বল দেখি? বড় ছেলেটি বেদ থেকে নানা শ্লোক বলে বলে ব্রহ্মের স্বরূপ

বোঝাতে লাগল। বাপ চুপ করে রইলেন। যখন ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে হেঁটমুখে চুপ করে রইল। মুখে কোন কথা নাই। বাপ তখন প্রসন্ন হয়ে ছোট ছেলেটিকে বললেন, বাপু, তুমিই একটু বুঝেছ। ব্রহ্ম যে কি মুখে বলা যায় না। * * * মানুষে মনে করে, আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিছিল। একটা দানা খেয়ে তার পেট ভরে গেল। আর একটা দানা মুখে করে বাসায় যেতে লাগল। যাবার সময় ভাবছে, এবার এসে সব পাহাড়টি লয়ে যাব। ক্ষুদ্র জীবেরা এই রকম মনে করে। জানে না, ব্রহ্ম বাক্যমনের অতীত। ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না, সব চুপ হয়ে যায়। অনন্তকে কে মুখে বোঝাবে? পাখি যত ওপরে ওঠে—তার ওপর আরও আছে। * * * * সমাধিস্থ হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, ব্রহ্মদর্শন হয়। সে অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ চুপ হয়ে যায়। ব্রহ্ম যে কি বস্তু তা মুখে বলবার শক্তি থাকে না। নুনের ছবি সমুদ্র মাপতে গিছিল। কত গভীর জল তাই খবর দেবে। খবর দেওয়া তার হল না, যেই নামা অমনি গলে যাওয়া।

এমনি নানাভাবের অমৃত বাণী শুনতে শুনতে কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। সকলে খাওয়াদাওয়ার কথা ভুলে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বাহ্য চৈতন্য ফিরে এলে বললেন: গরুর পালে অন্য জানোয়ার এলে তাকে সকলে গুঁতোতে যায়। কিন্তু গরু এলে গা চাটাচাটি করে। আমাদেরও আজ তেমনি হয়েছে। তারপর কেশবচন্দ্রের দিকে ফিরে বললেন, তোমার লেজ খসেছে।

শিষ্যেরা সকলে অবাক্ হয়ে গেলেন। এর মানে কি? শ্রীরামকৃষ্ণ একটু থেমে নিজেই সে কথার ব্যাখ্যা করে দিলেন, দেখ ব্যাঙাচির যতদিন লেজ থাকে ততদিন সে জলেই থাকে। সে ডাঙায় উঠতে পারে না। কিন্তু লেজ যখন খসে পড়ে তখন জলেও থাকতে পারে, ডাঙাতেও বেড়াতে পারে। তেমনি মানুষের যতদিন অবিদ্যা রূপ লেজ থাকে ততদিন সে সংসার জলেই কেবল থাকতে পারে। সেই লেজ খসে পড়লে সংসার ও সচ্চিদানন্দ দুয়েতেই ইচ্ছেমত সে বেড়াতে পারে। কেশব, তোমার মন এখন সেই রকম হয়েছে, সংসারেও থাকতে পারে, সচ্চিদানন্দেও যেতে পারে।

সেদিন নানা আলোচনার পর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন। এদিকে কেশবচন্দ্র তাঁর দিব্য আকর্ষণে মেতে উঠলেন। তিনি ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত, বিখ্যাত বাগ্মী। তাঁর বক্তৃতায় সারা বাংলা

দেশের শিক্ষিত তরুণসমাজ তখন মুগ্ধ। কিন্তু এই লেখাপড়া-না-জানা সাধক মানুষটি সভায় বক্তৃতা দিতেও পারেন না, তাড়াতাড়ি কথা বলতেও পারেন না। অথচ এমন দিব্য কথা কে কবে শুনেছে? কি মনমাতানো স্বর, মুখে কি অলৌকিক হাসি! পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্রবে বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হলেও কেশবচন্দ্রের অন্তরে ছিল ভগবদ্‌প্রীতির অনির্বাণ শিখা। আধ্যাত্মিক অনুভূতিলাভের জন্য তাঁর ভিতরে ছিল আকুলতা। চরম আধ্যাত্মিক বিভূতিভরা মানুষের সন্ধান পেয়ে তিনি মুগ্ধ হলেন। আভিজাত্যের বাঁধন, লৌকিক উচ্চশিক্ষার অভিমান, সমাজগুরুর মর্যাদাবোধ—কিছুই তাঁর অভিষ্ট সিদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করলে না। গুণী গুণীকেই চান। কেশবচন্দ্র একান্ত আগ্রহবশে কয়েকবার কয়েকজন ভক্তকে দক্ষিণেশ্বরে পাঠিয়ে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনধারা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ খবর নেবার জন্য। তাঁরা একে একে এসে খবর দিলেন। তিনি যখন শুনলেন যে এই মানুষটির মধ্যে ভণ্ডামি ও গোঁড়ামির লেশমাত্র নেই, দিব্য আনন্দে তাঁর দিন কাটে, তিনি আর দূরে রইলেন না। অচিরে কেশবচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন। ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নিবিড় হয়ে উঠল। যে মহাজীবনের লক্ষ্য নিয়ে তিনি যাত্রাপথে বার হয়েছিলেন সেই পথের এক অপূর্ব পথিককে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে দেখতে পেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের ফলে নতুন আলো তাঁর জীবনকে দীপ্ত করে তুললে। কেশবচন্দ্র লোকগুরু হয়ে জন্মেছিলেন, তাই এই নব রত্ন আবিষ্কারের অপার আনন্দ স্বার্থসর্বস্ব লোকের মত আপনার মধ্যে লুকিয়ে ভোগ করেন নি, যাতে অপর সন্ধানী লোকেরাও এর ভাগ পায় সেই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজের বাংলা ও ইংরেজী পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও মত সম্বন্ধে পরম শ্রদ্ধাভরে আলোচনা করতে লাগলেন। ক্রমে অনেকেই তাঁর লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধানে দক্ষিণেশ্বরে আসতে শুরু করলেন। তিনি নিজেও হয় দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে এসে নাহয় কলকাতায় সমাজগৃহে বা তাঁর নিজের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে গিয়ে তাঁর দিব্য সঙ্গ উপভোগ করার ব্যবস্থা করতেন। কয়েকবার শিষ্যদের সঙ্গে জাহাজে করে গিয়ে গঙ্গার বুকে রোজকার সংসারের পরিমণ্ডলের বাইরে প্রাকৃতিক সমাবেশের মধ্যে সেই দিব্যসঙ্গ লাভের আয়োজন করেছিলেন। অপরূপ স্থান, অপরূপ মানুষ, অপরূপ তাঁর কথা। গঙ্গার বুকে পরম আনন্দে ভক্তদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। শ্রীরামকৃষ্ণের বিরাম নেই। কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ অন্তরঙ্গভাব। তাঁর সংসর্গে তিনি বিশেষ উদ্দীপনা পেতেন।

তাই তিনিও অবিশ্রাম ভগবদ্ আলোচনায় বিশেষ আনন্দ অনুভব করতেন। তাঁর সেই আলোচনার মধ্যে একঘেয়েমির লেশমাত্র থাকত না। একটি সামান্য কথা থেকে বিচিত্র বিষয়, বিচিত্র জ্ঞান, বিচিত্র অনুভূতির কথা এসে পড়ত।

সেদিন কোজাগর লক্ষ্মীপূজা। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ, শুক্রবার ২৭ অক্টোবর। কেশবচন্দ্র দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে জাহাজে তুলে নিয়ে এসেছেন। মাঝ গঙ্গায় পড়ে জাহাজ এগিয়ে চলেছে। দিন প্রায় শেষ বেলায় এসে পৌঁচেছে। শরতের নীল আকাশ ভরে কোজাগরী জ্যোৎস্নার মেলা। দূরে পরপারে আবছা আলোঅন্ধকারে বাড়ি ও গাছের সারি দেখা যাচ্ছে। সংসারের সীমার বাইরে যেন ভক্তেরা এক অলৌকিক রাজ্যে এসে পৌঁচেছেন, সামনে জাহাজের কেবিনের মণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়িয়ে এক দিব্য পুরুষ। সদ্য সমাধির স্তর থেকে মন তাঁর ধীরে ধীরে চৈতন্যের রাজ্যে ফিরে আসছে। তিনি বলতে লাগলেন: জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে আর ভক্তেরা তাঁকেই বলে ভগবান। একই ব্রাহ্মণ যখন পূজা করে তার নাম পূজারী। যখন রাঁধে তখন রাঁধুনি বামুন। যে জ্ঞানী, জ্ঞানযোগ ধরে আছে, সে নেতি নেতি এই বিচার করে, ব্রহ্ম এ নয়, ও নয়, জীব নয়, জগৎ নয়। বিচার করতে করতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। নানা রূপ —এ সব স্বপ্নবৎ। ব্রহ্ম যে কি তা মুখে বলা যায় না। তিনি যে ব্যক্তি তাও বলবার জো নাই। জ্ঞানীরা এই রকম বলে—যেমন বেদান্তবাদীরা। ভক্তেরা কিন্তু সব অবস্থাই লয়। তারা বলে, এই জগৎ ভগবানের ঐশ্বর্য। আকাশ, নক্ষত্র চন্দ্র, সূর্য, পর্বত, সমুদ্র, জীব, জন্তু—এ সব ঈশ্বর করেছেন। তাঁরই ঐশ্বর্য, তিনি অন্তরে, হৃদয় মধ্যে—আবার বাইরে। তিনিই এই জীব-জগৎ হয়েছেন। ভক্তের সাধ যে চিনি খায়—চিনি হতে সে ভালবাসে না। * * * ভক্তের ভাব কি রকম জান? হে ভগবান, তুমি প্রভু আমি তোমার দাস, তুমি মা আমি তোমার সন্তান। আবার তুমি আমার পিতা বা মাতা, তুমি পূর্ণ আমি তোমার অংশ। ভক্ত এমন কথা বলতে চায় না যে আমি ব্রহ্ম। * * * * যোগীও পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করতে চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য—জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ। যোগী বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে লয় ও পরমাত্মাতে মন স্থির করতে চেষ্টা করে। তাই প্রথম অবস্থায় নির্জনে স্থির আসনে অনন্যমন হয়ে ধ্যানচিন্তা করে। কিন্তু একই বস্তু। নাম ভেদমাত্র। যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্তের ভগবান।

প্রসঙ্গ ক্রমশঃ গড়িয়ে এল ব্রহ্ম ও শক্তির সম্বন্ধ বিচারে: বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, জীবজগৎ—এ সব শক্তির খেলা। বিচার করতে গেলে, এ সব স্বপ্নবৎ। ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু। শক্তিও স্বপ্নবৎ অবস্তু। কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হলে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার জো নাই। আমি ধ্যান করছি, আমি চিন্তা করছি—এ সব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্যের মধ্যে। তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা-শক্তি। অগ্নিকে মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না। আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না। সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না। * * * * দুধ কেমন? না, ধোবো ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না। আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না। * * * আদ্যাশক্তি লীলাময়ী, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করেছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু! যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোন কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কাজ করেন তখন তাঁকে কালী বলি,—শক্তি বলি। একই ব্যক্তি, নাম রূপ ভেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবার রূপকের সাহায্যে এই তত্ত্বটিকে বোঝাতে লাগলেন: যেমন জল, ওআটার, পানি। এক পুকুরে তিন চার ঘাট। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খায়, তারা বলে জল। এক ঘাটে মুসলমানরা জল খায়, তারা বলে পানি। আর এক ঘাটে ইংরেজরা জল খায়, তারা বলে ওআটার। তিনিই এক, কেবল নামে তফাত। তাঁকে কেউ বলছে আল্লা, কেউ গড্। কেউ বলছে ব্রহ্ম, কেউ কালী।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথার মধ্যে কেমন যেন একটা মাদকতা ছিল। বারে বারে শুনেও ভক্তের তাতে অরুচি হত না, বারেবারেই তা প্রাণে গভীর সাড়া জাগাত। কেশবচন্দ্র ব্রহ্ম ও কালী অভেদ শুনে তাঁকে বললেন, কালী কত ভাবে লীলা করছেন সেই কথাগুলি একবার বলুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন: তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না,—নিবিড় আঁধার, তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী মহাকালের

সঙ্গে বিরাজ করছিলেন।* * * শ্যামাকালীর অনেকটা কোমল ভাব—বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থ বাড়িতে তাঁর পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি হয়, তখন রক্ষাকালীর পূজো করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহার মূর্তি,—শব, শিবা, ডাকিনী, যোগিনী মধ্যে শ্মশানের উপর তিনি থাকেন। রুধির ধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজসকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নির কাছে যেমন একটা ন্যাতাক্যাতার হাঁড়ি থাকে আর সেই হাঁড়িতে গিন্নি পাঁচ রকম জিনিস তুলে রাখে।

শ্রোতাদের মধ্যে মৃদু হাসির ঢেউ বহে গেল। তা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে লাগলেন : হাঁগো, গিন্নিদের ঐ রকম একটা হাঁড়ি থাকে। ভিতরে সমুদ্রের ফেনা, নীল বড়ি, ছোট ছোট পুঁটলিবাঁধা শশা বীচি, কুমড়ো বীচি, লাউ বীচি—এই সব রাখে। দরকার হলে বার করে। মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টিনাশের পর ঐ রকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন। সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে, ঊর্ণনাভের কথা। মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা ভিতর থেকে জাল বার করে আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে। ভগবান জগতের আধার আধেয় দুইই।* * * বন্ধন আর মুক্তি। দুয়েরই কর্তা তিনি। তাঁর মায়াতে সংসারী জীব কামিনীকাঞ্চনে বদ্ধ, আবার তাঁর দয়া হলেই মুক্ত। তিনি ভববন্ধনের বন্ধনহারিণী তারিণী। তিনি লীলাময়ী—এ সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী। লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন।

একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি ত মনে করলে সকলকে মুক্ত করতে পারেন। কেন তবে আমাদের সংসারে বদ্ধ করে রেখেছেন?

—তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা যে তিনি এই সব নিয়ে খেলা করেন। বুড়ীকে আগে থেকে ছুঁলে দৌড়দৌড়ি করতে হয় না। সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে, খেলা কেমন করে হয়? সকলেই ছুঁয়ে ফেললে বুড়ী অসন্তুষ্ট হয়। খেলা চললে বুড়ীর আহ্লাদ। তাই 'ঘুঁড়ি লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাতচাপড়ি।' * * * * তাঁরই মায়াতে ভুলে মানুষ সংসারী হয়েছে। প্রসাদ বলে, 'মন দিয়েছ মনেরি আঁখিঠারি।'

একজন ভক্ত আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। সংসারী মানুষের

চিরন্তন ব্যাকুল জিজ্ঞাসাটি তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, সব ত্যাগ না করলে তবে কি ভগবানকে পাওয়া যাবে না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ মৃদু হেসে জবাব দিলেন, না গো, তোমাদের 'সব ত্যাগ করতে হবে কেন ? তোমরা রসে বশে আছ। সারে মাতে বেশ আছ। নকশা খেলা জান ? আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গেছি। তোমরা খুব সেয়ানা। কেউ দশে আছ, কেউ ছয়ে আছ, কেউ পাঁচে আছ। বেশি কাটাও নাই। তাই আমার মত জ্বলে যাও নাই। খেলা চলছে। এ ত বেশ।—সত্যি বলছি, তোমরা সংসার করছ, এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হলে হবে না। এক হাতে কর্ম কর, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক। কর্ম শেষ হলে দুহাতেই ঈশ্বরকে ধরবে। * * * মন দিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে রঙে ছোপাবে, সেই রঙে ছুপবে। যেমন ধোপাঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজ রঙে ছোপাও সবুজ, যে রঙে ছোপাও সেই রঙেই ছুপবে। দেখনা যদি একটু ইংরেজী পড়ে ত অমনি মুখে ইংরেজী কথা এসে পড়ে— ফুটফাট, ইটমিট। আবার পায়ে বুট জুতো, শিস দিয়ে গান করা—এই সব এসে জুটবে। আবার যদি সংস্কৃত পড়ে ত অমনি শ্লোক ঝাড়বে। মনকে যদি কুসঙ্গে রাখ ত সেই রকম কথাবার্তা, চিন্তা হয়ে যাবে। যদি ভক্তের সঙ্গে রাখ ঈশ্বরচিন্তা, হরিকথা এই সব হবে। মন নিয়েই সব। এক পাশে পরিবার, এক পাশে সন্তান। স্ত্রীকে একভাবে সন্তানকে আর একভাবে আদর করে। কিন্তু একই মন।

জাহাজ ছুটে চলেছে। কিন্তু সেদিকে কারুর মন নেই। সকলেই চৈতন্যের এক উর্দ্ধলোকে এসে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছেন। সংসার, স্ত্রীপুত্র, ঘর-বাড়ির চিন্তা শূন্য হয়ে গেছে। তারা সকলে যেন এক মহা পথিকের সঙ্গে পথে বার হয়েছেন, তাঁর মধুর বাণী শুনতে শুনতে অজানিত পথে এগিয়ে চলেছেন। মহাপথিকের ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই, তিনি অবিশ্রাম আশার বাণী বলে চলেছেন : মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। আমি মুক্ত পুরুষ, সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কি ? আমি ঈশ্বরের সন্তান, রাজাধি-রাজের ছেলে। আমায় আবার বাঁধে কে ? যদি সাপে কামড়ায়, বিষ নেই জোর করে বললে বিষ ছেড়ে যায়। তেমনি আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত—এ কথাটি রোক করে বলতে বলতে তাই হয়ে যায়। মুক্তই হয়ে

যায়। * * * * খ্রীষ্টানদের একখানা বই একজন দিলে। আমি পড়ে শোনাতে বললুম। তাতে কেবল পাপ আর পাপ। তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও কেবল পাপী—পাপী। যে লোক আমি বদ্ধ, আমি বদ্ধ বারবার বলে সে শালা বদ্ধই হয়ে যায়। যে রাতদিন আমি পাপী, আমি পাপী এই করে সে তা-ই হয়ে যায়। * * * ঈশ্বরের নামে এমনি বিশ্বাস হওয়া চাই, কি, আমি তাঁর নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাকবে! আমার আবার পাপ কি? আমার আবার বন্ধন কি? কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু, সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। সে বৃন্দাবনে গিছিল। একদিন বেড়াতে বেড়াতে তার জল তেষ্টা পেলে। একটা কুয়োর কাছে গিয়ে দেখলে, একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বললে, ওরে তুই এক ঘটি আমায় জল দিতে পারিস্? তুই কি জাত? সে বললে, ঠাকুর, আমি মুচি। কৃষ্ণকিশোর বললে, তুই বল শিব। নে, এখন জল তুলে দে। * * * * ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহমন সব শুদ্ধ হয়ে যায়। কেবল পাপ আর নরক—এ সব কথা কেন? একবার বল, অন্যায় কাজ যা করেছি আর করব না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর। * * * * * সংসারে ঈশ্বরলাভ হবে না কেন? জনকের হয়েছিল। সংসার ধোকার টাটি, রামপ্রসাদ বলেছিল। তাঁর পাদপদ্মে ভক্তিলাভ করলে 'এই সংসারই মজার কুটি, আমি খাই দাই আর মজা লুটি। জনক রাজা মহাতেজা, তার কিসে ছিল ত্রুটি। সে যে এদিক উদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।' * * * কিন্তু ফস করে জনক রাজা হওয়া যায় না। বিবেকবৈরাগ্য লাভ করে সংসার করতে হয়। সংসার সমুদ্রে কামক্রোধাদি কুমীর আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে কুমীরের ভয় থাকে না। বিবেক বৈরাগ্য হলুদ। সদসৎ বিচারের নাম বিবেক। ঈশ্বর সৎ, নিত্য বস্তু। আর সব অসৎ—অনিত্য, দুদিনের জন্য। এইটি বোধ। আর ঈশ্বরে অনুরাগ। তাঁর উপর টান, ভালবাসা। গোপীদের কৃষ্ণের উপর যেমন টান ছিল। রাধাকৃষ্ণ মান আর নাই মান, এই টানটুকু নাও। ভগবানের জন্য কিসে এইরূপ ব্যাকুলতা হয় চেষ্টা কর। ব্যাকুলতা থাকলেই তাঁকে লাভ করা যায়।

কেশবের সংসর্গে এমনি আনন্দের হাট বসে যেত। সে হাটে যে আসত সেই মজত। মধুর সন্ধান পেলে মৌমাছি কি আর থাকতে পারে! ব্রাহ্মভক্তেরা এই সব আসরে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী শুনে কি ভাবে উল্লসিত হতেন তার পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্তের একটি প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন,

"পঞ্চান্ন বৎসরের কথা, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী শ্রবণ করিয়াছিলাম। একটি অক্ষরও এ পর্যন্ত বিস্মৃত হইতে পারি নাই। সেই ধীর, মধুর, শ্রুতিশীতল, ভাবঘন শব্দপরম্পরা অদ্যাবধি কর্ণকুহরে লাগিয়া আছে, হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে ধ্বনিত হইতেছে। যেন কালিকার কথা। সে দৃশ্য আজ পর্যন্ত চক্ষুর সমক্ষে জাগিয়া রহিয়াছে। ভাগীরথীবক্ষে ছোট স্টীমারের উপর বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র, কেশবের পাশে আমি। চারিদিকে অপর লোক, কেশবচন্দ্রের সমাজের প্রচারকগণ এবং বাইরের দুতিনজন। বক্তা একজন আর সকলেই শ্রোতা। কথা কহিতেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, স্তব্ধ হইয়া সকলে শুনিতেছিল। সর্বলোকবিশ্রুত বাগ্মী কেশবচন্দ্র নীরব, এক দৃষ্টে রামকৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁর কথামৃত পান করিতেছিলেন। গঙ্গার কলকল, ছলছল স্রোতের সহিত পরমহংসদেবের বাক্যস্রোত মিশ্রিত হইতেছিল। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ত্বরা নাই, সেই অমৃতময়ী বাণী শ্রোতাদের হৃদয়ে পীযূষধারার ন্যায় প্রবেশ করিতেছিল। প্রেমের কথা, জ্ঞানের কথা, সাধনার কথা, গভীর তত্ত্বের কথা, সাক্ষাৎ দিব্য অনুভবের কথা মুগ্ধ তন্ময় হইয়া আমরা শ্রবণ করিতেছিলাম। প্রহরের পর প্রহর অতীত হইতেছিল, কিন্তু আমাদের কালের জ্ঞান ছিল না, শ্রবণে হৃদয়ের অতৃপ্তি মিটিতেছিল না। সেইদিন বুঝিতে পারিয়াছিলাম, লোকগুরু কাহাকে বলে, শিক্ষক কে। * * * * পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবই যে বিচিত্র অলৌকিক ব্যাপার, একথা আমরা বুঝিতে পারি না কেন? ইংরেজী উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এ দেশের অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখ। সর্বত্র বিদ্যার অভিমান, বিশেষ বিদেশী ভাষার গৌরব। যে ইংরেজী লিখিতে পড়িতে বলিতে জানে না, সে যেন মানুষের মধ্যেই নয়। বাঙালী বক্তৃতা করে ইংরেজীতে, ইংরেজীমিশ্রিত কথা কয়, বাঙালী বন্ধুদিগকে চিঠি-পত্র লেখে ইংরেজীতে। এই সমাজের মধ্যে অভ্যুদয় হইল পরমহংস রাম-কৃষ্ণদেবের। দরিদ্র পাড়াগেঁয়ে ব্রাহ্মণ, দেবমন্দিরে পূজারীর কাজ করিতেন, অবশেষে সে কাজও তাঁহাকে দিয়া হইত না। ইংরেজী ত জানিতেনই না, বাংলাও না জানার মধ্যে। গ্রাম্য ভাষায় কথা কহিতেন; সমাজের কায়দা জানিতেন না, রাখিয়া ঢাকিয়া বলা তাঁহাকে দিয়া হইত না। এই অশিক্ষিত ব্রাহ্মণের মুখের কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইত কাহারা? কোন্ শিক্ষিত ইংরেজী অথবা সংস্কৃত পণ্ডিত তেমন কথা কহিতে পারে? চাষাভূষা, মাঝিমাল্লা তাঁহার কথা শুনিতে আসিত না, শিক্ষিত সমাজের প্রধান

ব্যক্তিগণ তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহার কথা শুনিয়া বিস্মিত, চমৎকৃত হইত।"*

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং নববিধান—সকল সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মেরাই শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী ছিলেন। তাঁদের সমাজগৃহে নানা উৎসব অনুষ্ঠানে তাঁকে নিয়ে গিয়ে তাঁরা আনন্দ পেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মদের খুব স্নেহ করতেন। যাতে তাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় তার জন্য তিনি শুধু সমাজ-গৃহে নয়, কোন কোন ব্রাহ্মভক্তদের বাড়িতে গিয়েও মহানন্দে কীর্তন, সদ্-আলোচনা করতেন।

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী, ইংরেজীশিক্ষিত লোকেরা অনেকেই তখন হয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য, না-হয় অনুরাগী ছিলেন। বাংলাদেশের দিকে দিকে তখন যে নবজাগরণের আলোড়ন জেগেছিল মূলতঃ এই বুদ্ধিজীবী ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজই ছিল তার কেন্দ্র। সেই দিক থেকে বলা যেতে পারে, তখনকার ব্রাহ্মসমাজ ছিল বাংলার প্রাণকেন্দ্র। রেনেসাঁসের যে একটি মূল লক্ষণ জানবার আগ্রহ—তাই ছিল এই ব্রাহ্মভক্ত ও তাঁদের অনুরাগীদের বিশিষ্টতা। সত্য প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের মধ্যে জীবনকে তাঁরা বুঝতে চেয়ে-ছিলেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংঘর্ষে নিজেদের জীবনের আদর্শ, জন্মের সঙ্গে পাওয়া ধর্মমত ও সামাজিক পরিবেশকে নির্বিবাদে স্বীকার করে নিতে পারেন নি। অথচ তা সব বর্জন করে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ও ধর্মমতকে জীবনে অনুসরণ করতে যাওয়া যে মূঢ় অনুকরণ করা হবে এ বোধও তাঁদের ছিল। ফলে প্রাচীনের মধ্যে তাঁরা নূতনকে জাগাবার চেষ্টা করছিলেন। তাঁদের অনেকেরই মধ্যে ছিল তাজা প্রাণের আবেগ। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে অপূর্ব প্রাণময়তার সন্ধান পেয়ে অনেক ব্রাহ্মই মুগ্ধ হয়েছিলেন। বাইরের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন তাঁদের থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত মানুষ। তিনি ইংরেজী জানতেন না, শহরের মানুষ ছিলেন না, প্রতিমাপূজার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, শহুরে সমাজের নতুন ভব্যতার কোন ধার ধারতেন না। তখনকার ব্রাহ্মসমাজে যদি তাজা প্রাণের সংস্রব না থাকত তাহলে কিছুতেই এমন বিপরীত ব্যক্তিত্বের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও শ্রদ্ধা দান করা ব্রাহ্মদের পক্ষে সম্ভব হত না। অবশ্য তাঁদের মনের সংস্কার সহজে দূর হয় নি। সাকার ও নিরাকারের সমস্যা ব্রাহ্মমতের একটি মূল সমস্যা। সেই সমস্যা সম্বন্ধে অনেকেই নিজেদের সংস্কার ছাড়তে পারতেন

* মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন, ১৪৫২।

না। আচার্য শ্রীবিজয় গোস্বামী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান ছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে ক্রমশঃ ধ্যানতপস্থার পথে নেমে এসে পরে সন্ন্যাসগ্রহণ করেছিলেন। ব্রাহ্মভক্তেরা কেউ কেউ তাঁর সাকারবাদীদের সঙ্গে নিবিড় অন্তরঙ্গতা সহ্য করতে পারতেন না, এক সময়ে বিশেষ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন তাঁকে বলেছিলেন, তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশ বলে তোমার নাকি বড় নিন্দা হয়েছে? যে ভগবানের ভক্ত তার কূটস্থ বুদ্ধি হওয়া চাই। যেমন কামারশালের নাই। হাতুড়ির ঘা অনবরত পড়ছে তবু নির্বিকার। অসৎ লোকে তোমাকে কত কি বলবে, নিন্দা করবে। তুমি যদি আন্তরিক ভগবানকে চাও তাহলে তুমি সব সহ্য করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন সম্প্রদায়েরই কোন ব্যাপক গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিতেন না। সাকারবাদীদের সাকার সম্বন্ধে সংস্কার যেমন সহ্য করতে পারতেন না তেমনি নিরাকারবাদীদের সঙ্কীর্ণতারও নিন্দা করতেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ মার্চ। একজন গোঁড়া বৈষ্ণব ভক্তের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে বলেছিলেন, তা ঈশ্বরকে শুধু সাকার বলে মানলে হবে কেন? তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মানুষের দেহ ধারণ করে আসেন, এও সত্য। আবার তিনি নিরাকার, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, এও সত্য। বেদে তাঁকে সাকার নিরাকার দুইই বলেছে। কি রকম জান? সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত সাগর। ঠাণ্ডার গুণে সাগরের জল বরফ হয়ে ভাসে, নানা রূপ ধরে বরফের চাঁই সাগরের জলে ভাসে। তেমনি ভক্তিহিম লেগে সচ্চিদানন্দ সাগরে সাকার মূর্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্য সাকার। জ্ঞানসূর্য উঠলে বরফ গলে আগেকার যেমন জল তেমনি জল। অধঃ উর্দ্ধে পরিপূর্ণ। চারিদিকে জলে জল।

ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল বিশেষ প্রীতি। তাই তাঁদের কল্যাণ কামনায় তাঁদের সমাজে সাকারনিরাকারের গোঁড়ামি সম্বন্ধে বারবার আলোচনা করতেন। বলতেন, আমি বলি,সকলেই তাঁকে ডাকছে। দ্বেষাদ্বেষির দরকার নাই। কেউ বলছে সাকার, কেউ বলছে নিরাকার। আমি বলি, যার সাকারে বিশ্বাস, সে সাকারই চিন্তা করুক, যার নিরাকারে বিশ্বাস সে নিরাকারই চিন্তা করুক। তবে মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়। এ কথা বলা ভাল নয় যে আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের ভুল। বরং একথা ভাবা ভাল যে আমার ধর্ম ঠিক, আর ওদের ধর্ম ঠিক কি ভুল, সত্য কি মিথ্যে তা আমি বুঝতে পাচ্ছিনে। কেন না, ভগবানকে সাক্ষাৎকার না করলে তাঁর স্বরূপ বোঝা যায়

না। কবীর বলত, সাকার আমার মা আর নিরাকার আমার বাপ। কাকো নিন্দো কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী।***হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী আর ইদানীং কালের ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা,—সকলেই এক বস্তুকে চাইছ। তবে যার যা পেটে সয় মা সেইরূপ ব্যবস্থা করেছেন। মা যদি বাড়িতে মাছ আনেন আর পাঁচটি ছেলে থাকে, সকলকেই তিনি পোলোয়া কালিয়া করে দেন না। সকলের পেট সমান নয়। কারুর জন্যে মাছের ঝোলের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মা সকলকেই সমান ভালবাসেন। আমার ভাব কি জান? আমি মাছ সব রকম খেতে ভালবাসি। আমার মেয়েলী স্বভাব। আমি মাছ ভাজা, হলুদ দিয়ে মাছ, টকের মাছ, বাটিচচ্চড়ি—সব তাতেই আছি। আবার মুড়িঘণ্টতেও আছি, কালিয়া-পোলোয়াতেও আছি।* * কি জান? দেশকালপাত্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু সব মতই পথ। মত কিছু ঈশ্বর নয়।—তবে আন্তরিক ভক্তি করে একটা মত আশ্রয় করলে তাঁর কাছে পৌঁছানো যায়। যদি এমন কোন মত আশ্রয় করে থাক যাতে ভুল আছে, আন্তরিকভাবে আশ্রয় করলে ভগবান নিজেই সে ভুল শুধরিয়ে দেন। যদি কেউ আন্তরিক জগন্নাথ দর্শনে বেরোয় আর ভুলে দক্ষিণ দিকে না গিয়ে উত্তর দিকে যায়, তাহলে অবশ্য পথে কেউ না কেউ বলে দেয়, ওহে, ওদিকে যেও না, দক্ষিণ দিকে যাও। সে লোক কখন না কখন জগন্নাথ দর্শন করবেই।*** তবে অন্যের মত ভুল— এ কথা ভাববার আমাদের দরকার নাই। যাঁর জগৎ তিনি ভাবছেন। আমাদের কর্তব্য, কিসে যো সো করে, জগন্নাথ দর্শন হয়। তা তোমাদের মতটি বেশ ত। তাঁকে নিরাকার বলছ এত বেশ। মিছরির রুটি সিধে করে খাও, আর আড় করে খাও, মিষ্টি লাগবেই। তবে মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়। *** ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার। আবার সাকার নিরাকারেরও পার। তাঁর ইতি করা যায় না।* * * *দুইই সত্য। সাকার নিরাকার দুইই সত্য। শুধু নিরাকার বলা কি রকম জান? যেমন রসুন চৌকির একজন পোঁ ধরে থাকে তার বাঁশীর সাত ফোকর থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু আর একজন দেখ কত রাগরাগিনী বাজায়। সেই রকম সাকারবাদীরা দেখ ভগবানকে কত ভাবে সম্ভোগ করে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর নানাভাবে। * * * * তোমরা সাকার মান না, বেশ। তোমাদের পক্ষে মূর্তি নয়— ভাব। তোমরা টানটুকুকে নেবে, যেমন কৃষ্ণের উপর রাধার টান— ভালবাসা। সাকারবাদীরা যেমন মা কালী, মা দুর্গার পূজা করে মা মা

বলে কত ডাকে, কত ভালবাসে, সেই ভাবটি তোমরা লবে, মূর্তি নাই বা মানলে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে ব্রাহ্মসমাজে নিরাকার সংস্কারের উগ্রতা যে দূর হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর আগে পাশ্চাত্যভাবের প্রভাবে নিরাকার সংস্কারকে উপলক্ষ্য করে ব্রাহ্মেরা অনেকেই নিজেদের হিন্দু-সমাজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বলে ভাববার চেষ্টা করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য অবস্থা চোখের সামনে দেখে গোঁড়া হিন্দুসমাজের চালচলনের প্রতি তাঁদের তীব্র বিতৃষ্ণা ক্রমশঃ লুপ্ত হয়েছিল। কুসংস্কারবোধে সাকার উপাসনাপ্রণালির উপর যে একটা ঘৃণার ভাব ছিল তা সাধারণভাবে দূর হয়েছিল। প্রতিমাপূজা যে পৌত্তলিকতা নয়, সে বোধ তাঁরা লাভ করেছিলেন। সেদিন পৌত্তলিক বোধে হিন্দুদের প্রতি বিতৃষ্ণা ক্রমশঃ ঘুচে গেছল বলেই ব্রাহ্মসমাজে আপন স্বাতন্ত্র্যবোধের উগ্রতা আজ আর নেই। ঠিক এই ধরণের হিন্দুসমাজের একটি কুসংস্কারও দূর হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন, শিক্ষা ও ব্রাহ্মদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা দেখে শিক্ষিত গোঁড়া হিন্দুদের অনেকের মন থেকে নিরাকারবাদ সম্বন্ধে অন্ধ অসহিষ্ণুতা বিলুপ্ত হয়েছিল। তাঁরা বুঝেছিলেন, নিরাকারবাদ বিদেশের ধারকরা বস্তু নয়, এ খ্রীষ্টানী ঢং নয়—এ হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ মত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিকতা লাভ ও ধর্মসাধন সম্বন্ধে ধারণা ব্যাপক ও গভীর হয়েছিল। ব্রহ্ম ও শক্তি যে অভেদ—এ বিষয়ে তাদের ধারণা বিকাশ লাভ করেছিল। তাছাড়া, ভগবান আনন্দস্বরূপ, সচ্চিদানন্দ, তাঁর মধ্যে ডুব দেওয়াই আধ্যাত্মিকতার চরম লক্ষ্য। ব্রাহ্ম আচার্যেরা সাধারণতঃ ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করতেন তাঁর ঐশ্বর্যের বর্ণনা করে। চিদানন্দের উৎস যিনি তাঁর ঐশ্বর্য ও শক্তির মহিমায় শুধু মুগ্ধ হবার চেষ্টা আধ্যাত্মিক রাজ্যে স্থূল বুদ্ধির পরিচায়ক। শ্রীরামকৃষ্ণ এ বিষয়ে বারবার ব্রাহ্মদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তিনি বলতেন, হ্যাঁগা, তোমরা ভগবানের ঐশ্বর্য অত বর্ণনা কর কেন? আমি কেশব সেনকে ঐ কথা বলেছিলুম। একদিন তারা সব ওখানে কালীবাড়িতে গিছিল। আমি বললুম, তোমরা কি রকম লেকচার দাও শুনব। তা গঙ্গার ঘাটে চাঁদনীতে সভা হল। কেশব বলতে লাগল। বেশ বললে, আমার ভাব হয়ে গিছিল। পরে কেশবকে আমি বললুম, তুমি এগুলো এত বল কেন? হে ঈশ্বর, তুমি

কি সুন্দর ফুল করিয়াছ, তুমি আকাশ করিয়াছ, তুমি তারা করিয়াছ, তুমি সমুদ্র করিয়াছ—এই সব? এ সব কথা এত কি দরকার? মদ খাওয়া হলে শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে তার হিসাবে আমার কি দরকার! আমার এক বোতলেই কাজ হয়ে যায়। নরেন্দ্রকে যখন দেখি কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই, তোর বাপের নাম কি, তোর বাপের কখানা বাড়ি? কি জান? মানুষ নিজে ঐশ্বর্যের আদর করে বলে ভাবে ভগবানও আদর করে। ভাবে, তাঁর ঐশ্বর্যের প্রশংসা করলে তিনি খুশী হন। শম্ভু বলেছিল, এখন এই আশীর্বাদ কর যাতে এই ঐশ্বর্য তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পারি। আমি বললুম, এ তোমার পক্ষেই ঐশ্বর্য, তাঁকে তুমি কি দেবে? তাঁর পক্ষে এগুলো কাঠ মাটি। * * * যখন বিষ্ণুঘরের গয়না সব চুরি গেল তখন সেজবাবু আর আমি ঠাকুরকে দেখতে গেলুম। সেজবাবু বললেন, দূর ঠাকুর, তোমার কোন মুরোদ নেই। তোমার গা থেকে সব গয়না নিয়ে গেল আর তুমি কিছু করতে পারলে না। আমি তখন বললুম, এ তোমার কি কথা! তুমি যেগুলো গয়না গয়না করছ তাঁর পক্ষে এগুলো মাটির ঢেলা। লক্ষ্মী যাঁর শক্তি, তিনি তোমার গুটি কতক টাকা চুরি গেল কি না তা নিয়ে কি হুঁ। করে আছেন? এ রকম কথা বলতে নাই। * * * * ভগবান কি ঐশ্বর্যের বশ? তিনি ভক্তির বশ। তিনি কি চান? টাকা নয়, —ভাব, প্রেম, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য—এই সব চান। সন্তান কি তার বাপের সামনে বসে ভাবে, বাবার কত বাড়ি, কত ঘোড়া, কত গরু, কত বাগবাগিচা। অত করে তাঁর ঐশ্বর্যের কথা ভাবলে ভগবানকে খুব আপনার বলে ভাবা যায় না, তাঁর উপর জোর করা যায় না। তিনি কত মহান্, আমাদের কাছ থেকে কত দূরে—এই সব ভাব আসে। ভগবানকে খুব আপন বলে ভাব, তবে ত তাঁকে পাওয়া যাবে। ঈশ্বরের মাধুর্য রসে ডুব দাও। তাঁর অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত ঐশ্বর্য। অত খবরের আমাদের কাজ কি!

বাইরের অনুষ্ঠানকে ধর্ম বলে বিশ্বাস করে যাতে ব্রাহ্মেরা মত্ত না থাকেন তাই শ্রীরামকৃষ্ণ সাবধান করে তাঁদের মনে সত্যিকার ভগবদ্ভক্তি জাগাবার চেষ্টা করতেন। তিনি বলতেন, ব্রাহ্ম সভা না শোভা? ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত উপাসনা হয়, সে খুব ভাল। কিন্তু ডুব দিতে হবে। শুধু উপাসনা লেকচারে হয় না। তাঁকে প্রার্থনা করতে হয় যাতে ভোগাসক্তি চলে গিয়ে তাঁর পাদ-পদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়। হাতীর বাইরের দাঁত আছে আবার ভিতরেরও দাঁত

আছে। বাইরের দাঁতে শোভা, কিন্তু ভিতরের দাঁতে খায়। তেমনি ভিতরে কামিনীকাঞ্চন ভোগ করলে ভক্তির হানি হয়। বাইরে লেকচার দিলে কি হবে? শকুনি উপরে ওঠে কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর। হাউই হুস করে প্রথমে আকাশে উঠে যায় কিন্তু পরক্ষণেই মাটিতে পড়ে যায়। ভোগাসক্তি ত্যাগ হলে শরীর যাবার সময় ভগবানকেই মনে পড়বে। তা না হলে এই সংসারের জিনিস সব মনে পড়বে—স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ধন, মান, সম্ভ্রম। পাখি অভ্যাস করে রাধাকৃষ্ণ বোল বলে কিন্তু বেড়ালে ধরলে ক্যাঁ ক্যাঁ করে ডাকে। তাই সর্বদা অভ্যাস করা দরকার। তাঁর নাম গুণকীর্তন, তাঁর ধ্যান চিন্তা আর প্রার্থনা—যেন ভোগাসক্তি যায় আর তোমার পাদপদ্মে মন হয়।

ভগবদ্‌ভক্তি সম্বন্ধে ব্রাহ্মদের হিসেববুদ্ধিকে তিনি বিদ্রূপ করতেন। অবশ্য এ বিদ্রূপের মধ্যে আঘাত দেবার চেষ্টা থাকত না। একদিনের ঘটনার সম্বন্ধে তিনি নিজেই গল্প বলতেন, কেশব সেন বাড়িতে লেকচার দিলে। আমি শুনেছিলুম। অনেক লোক বসেছিল। চিকের ভিতর মেয়েরা ছিল। কেশব বললে, হে ঈশ্বর, তুমি আশীর্বাদ কর যেন আমরা ভক্তি নদীতে একেবারে ডুবে যাই। আমি হেসে কেশবকে বললুম, ভক্তি নদীতে যদি একেবারে ডুবে যাবে তাহলে চিকের মধ্যে যাঁরা রয়েছেন ওঁদের দশা কি হবে? তবে এক কাজ কর। ডুব দেবে আর মাঝে মাঝে আড়ায় উঠবে। একেবারে ডুবে তলিয়ে যেও না।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে পিপাসু ব্রাহ্মদের অনেকেই সাধনভজনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আগেই বলেছি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা আচার্য বিজয়কৃষ্ণ ত আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে একান্তভাবে ডুব দিয়েছিলেন। আর কেশবচন্দ্রের জীবনে এসেছিল নব সাধনার অপূর্ব বন্যা। তিনি জন্মেছিলেন একদিকে অনন্যসাধারণ প্রতিভা আর একদিকে আধ্যাত্মিকতার তীব্র প্রেরণা নিয়ে। তাঁর মনের সহজগতি ছিল ভক্তি পথে। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মূলতঃ ভক্তিপথের পথিক। তাঁর সঙ্গে মিলনে কেশবচন্দ্রের অন্তরের সহজ ভক্তি সহস্রগুণে অনু-প্রাণিত হয়ে উঠেছিল। তিনি লক্ষ্যে পৌঁছবার উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্যের তর্ক-বিচারমূলক পদ্ধতি পরিহার করে বিশ্বজননীর সাধনায় প্রবৃত্ত হন। এর আগে ব্রাহ্মসমাজে আর কেউ এমনভাবে ভগবানকে মাতৃরূপে কল্পনা করে ব্রহ্ম উপলব্ধির চেষ্টা করেন নি। শোনা যায়, তিনি মৃত্যুর পূর্বে মা মা বলতে বলতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আকাশে কক্ষচ্যুত দুই গ্রহের হঠাৎ মিলন হয়। বড় গ্রহের সংস্পর্শে ছোট গ্রহের গতি হয় ক্ষীপ্রতর। একের তাপে অপরের তেজ হয় তীব্রতর। তেমনি ভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল। তাঁদের মধ্যে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ ছিল কি না সে প্রশ্ন অবান্তর। কারণ কেশব কোন দিন মুখে বা লিখিতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরুরূপে বরণ করেন নি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ কোন দিন কারুর কাছে নিজেকে কেশবের গুরুরূপে জাহির করার চেষ্টা করেন নি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরে যে কেশবের জন্য ছিল অকৃত্রিম, সুনিবিড় প্রীতি এবং কেশবের হৃদয়ে যে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আন্তরিক সুগভীর শ্রদ্ধা—তা অস্বীকার করা যায় না। একে অপরকে দেখে দিব্য আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠতেন। কেশবের ভক্তি এমন গভীর ছিল যে একদিন তিনি সমাজে বেদীতে বসে ভক্তদের উপদেশ দিচ্ছেন এমন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এসে সেখানে উপস্থিত হলেন। কেশবের বক্তৃতা আর শেষ করা হল না। তিনি বেদী থেকে নেমে এসে পরম শ্রদ্ধাভরে অতিথিকে অভ্যর্থনা করলেন। তারপর দিব্য পুরুষের সঙ্গে কীর্তনানন্দে তাঁদের সেদিনকার উপাসনার উপসংহার হল।

কেশবের তিরোধানের কিছুদিন আগে তাঁদের দুজনের শেষসাক্ষাৎ হয়। সেই সাক্ষাতের সময়ে যে কথাবার্তা হয়েছিল তার বিবরণী পড়লে বোঝা যায়, একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে কত উচ্চস্তরের সাধক বলে মান্য করতেন, অপরদিকে কেশব ও তাঁর পরিবারবর্গ শ্রীরামকৃষ্ণকে কিভাবে দিব্য পুরুষ বলে গণ্য করতেন। তা না হলে কেশবচন্দ্রের মা ব্যাকুলভাবে পুত্রের আরোগ্য কামনায় তাঁর কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করতেন না। বড় অপরূপ সেই শেষবিদায়ের দৃশ্যটি। খুব নিবিড় সম্বন্ধ না থাকলে এমন করে এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী মনের মানুষের মৃত্যুশয্যায় দেখা করতে ছুটে আসেন না এবং একজন দেশমান্য, বাগ্মীশ্রেষ্ঠ জননায়ক এমন ভাবে রোগযন্ত্রণা ভুলে দুর্বল দেহে দেওয়াল ধরে ধরে বৈঠকখানায় এসে শেষপ্রণাম জানিয়ে যান না। এই নিবিড়, সহজ অন্তরঙ্গতার কাছে মনে হয় গুরুশিষ্যের বাঁধাধরা সম্পর্কের প্রশ্ন অতি তুচ্ছ বস্তু। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ নভেম্বর। দক্ষিণেশ্বর থেকে তিনি এসেছেন কলকাতায় "কমলকুটিরে"। কেশবচন্দ্রের সঙ্কটাপন্ন অসুখ, বুঝি আরোগ্যের আশা নেই। কেশবের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর আকুলতা। কিন্তু তাঁকে দেখামাত্র সব আকুলতা ভুলে গেলেন—মুখ দিয়ে সাধারণ কোন কথাবার্তা বার হল না। ভাবমুখে অপূর্ব জ্ঞানের দীপ্তিতে উজ্জ্বল

কথার ধারা উৎসরিত হয়ে উঠতে লাগল। কেশবকে দেখে তিনি গর্গর মাতোয়ারা। একটু প্রকৃতিস্থ হবার পর অসুখের সম্বন্ধে উল্লেখ করে অপরূপ সান্ত্বনার বাণী বলতে লাগলেন, তোমার অসুখ হয়েছে কেন তার মানে আছে। যখন ভাব হয় তখন কিছু বোঝা যায় না, অনেকদিন পরে শরীরে আঘাত লাগে। আমি দেখেছি বড় জাহাজ গঙ্গা দিয়ে যখন চলে গেল তখন কিছু টের পাওয়া গেল না। ও মা, খানিকক্ষণ পরে দেখি, কিনারার উপরে জল ধপাস্ ধপাস্ করছে। আর তোলপাড় করে দিচ্ছে। হয়ত কিনারার খানিকটা ভেঙে জলে পড়ল। কুঁড়ে ঘরে হাতী প্রবেশ করলে ঘর তোলপাড় করে ভেঙে চুরে দেয়। ভাবহস্তী দেহঘরে প্রবেশ করে আর তোলপাড় করে। হয় কি জান? আগুন লাগলে কতকগুলো জিনিস পুড়িয়ে টুড়িয়ে ফেলে। আর একটা হৈহৈ কাণ্ড আরম্ভ করে দেয়। জ্ঞানাগ্নি প্রথমে কামক্রোধ এই সব রিপু নাশ করে, তারপর অহংবুদ্ধি নাশ করে। তারপর একটা তোলপাড় আরম্ভ করে। তুমি মনে করছ সব ফুরিয়ে গেল। কিন্তু যতক্ষণ রোগের কিছু বাকি থাকে ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না। হাঁসপাতালে যদি নাম লেখাও আর চলে আসবার জো নাই। যতক্ষণ রোগের একটু কসুর থাকে ততক্ষণ ডাক্তারসাহেব চলে আসতে দেবে না। তুমি নাম লিখালে কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের সাধন জীবনে উচ্চ অবস্থার কথা ইঙ্গিত করে বলছেন যে কঠোর সাধনার পথে এগিয়ে এলে সঙ্গে সঙ্গে কঠিন দৈহিক অসুখও ভুগতে হয়। অতএব অসুখের জন্য বিচলিত হলে চলবে না। তিনি নিজের সাধনজীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন, হৃদু বলত, এমন ভাবও দেখি নাই, এমন রোগও দেখি নাই। তখন আমার খুব অসুখ। সরা সরা বাহ্যে যাচ্ছি। মাথায় যেন দুলাখ পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরীয় কথা রাতদিন চলছে। নাটাগড়ের রামকবিরাজ দেখতে এল। সে এসে দেখে, আমি বসে বসে বিচার করছি। তখন সে বললে, এ কি পাগল! দুখানা হাড় নিয়ে বিচার করছে। * * * তাঁর ইচ্ছা। সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। শিশির পাবে বলে মালী বসরাই গোলাপের গাছ শিকড়সুদ্ধ তুলে দেয়। শিশির পেলে গাছ ভাল করে গজাবে। তাই বুঝি তোমার শিকড়সুদ্ধ তুলে দিচ্ছে। ফিরে ফিরতি বুঝি একটা বড় কাণ্ড হবে। * * * তোমার অসুখ হলেই আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়। আগের বারে তোমার যখন অসুখ হয়

রাত্রি শেষ প্রহরে আমি কাঁদতুম। বলতুম, মা, কেশবের যদি কিছু হয় তবে কার সঙ্গে কথা কব ?

এমনি কথাবার্তা চলছে এমন সময় কেশবচন্দ্রের মা ঘরের দরজার কাছে এসে প্রণাম করলেন। পাশের একজন ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্দেশ করে বললেন, মা বলছেন কেশবের অসুখটি যাতে সারে, ওঁকে আশীর্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সে কথা কানে তুললেন না। ভক্ত আবার চেঁচিয়ে বললেন, মা বলছেন কেশবকে আশীর্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবার গম্ভীরভাবে বললেন, আমার কি সাধ্য! তিনি আশীর্বাদ করবেন। তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি। ভগবান দুবার হাসেন। একবার হাসেন যখন দুভাই জমি বখরা করে আর দড়ি মেপে বলে, এ দিকটা আমার ও দিকটা তোমার। ভগবান আর একবার হাসেন। ছেলের অসুখ সঙ্কটাপন্ন। মা কাঁদছে। বৈদ্য এসে বলছে, ভয় কি মা, আমি ওকে ভাল করব। বৈদ্য জানে না, ভগবান যদি মারেন কার সাধ্য রক্ষা করে।

এই সময়ে কেশবচন্দ্র ভয়ঙ্কর কাশতে লাগলেন। যেন কিছুতেই বন্ধ হয় না। তাঁর ভীষণ কষ্ট হতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে কাশি একটু থামলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে আস্তে আস্তে দেওয়াল ধরে ধরে নিজের শোবার ঘরে উঠে গেলেন,—এই তাঁর শেষ প্রণাম। কিছুদিন পরে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরী মাসে তাঁর ইহলীলা শেষ হয়।

সেই খবর শ্রীরামকৃষ্ণের কানে গেলে তিনি খুব অভিভূত হয়েছিলেন, তিন দিন কারুর সঙ্গে কথা বলেন নি। পরে অন্তরঙ্গদের কাছে গল্প করে-ছিলেন, কেশবের মরণের কথা শুনে আমার বোধ হল যেন আমার একটা অঙ্গ খসে গেছে।

*

* *

ব্রাহ্মসমাজ যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে অপরূপ দান পেয়েছিল তেমনি সে শ্রীরামকৃষ্ণ-নবজীবন-আন্দোলনে দান দিয়েও ছিল। সে দান মোটেই নগণ্য বলা যায় না।

সে যুগের ইংরেজী-না-জানা, শহর থেকে বহুদূরে প্রাচীনপরিমণ্ডলেমানুষ-হওয়া এই মানুষটির মন ছিল পরম আধুনিক। নবজীবনের দীপটি হাতে নিয়ে তিনি সমাজের প্রাচীনপন্থীদের দ্বারে গিয়ে হাজির হন নি। দক্ষিণে-

শ্বরের কাছেই পাণিহাটি প্রভৃতি গ্রামে তখনও বৈষ্ণব সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলি সজাগ ছিল। ইচ্ছা করলে তিনি সেই সমাজ থেকে লোকসংগ্রহের চেষ্টা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন, প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে যত আধ্যাত্মিকতার প্রেরণা থাক তা একদিক থেকে গতানুগতিকতার মোহে আবিষ্ট, প্রাণহীন ও গতিহীন। সেই পুরানো সলতেয় নতুন আলো জ্বলবে না। তাই তিনি মনের মানুষদলকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন কলকাতা শহরের পাশ্চাত্যভাবভরা, পথভোলা নবীন সমাজে। তিনি জানতেন, যতই তারা বিপথে চলুক, তাদের তাজা প্রাণে নতুনকে নেবার আগ্রহ অশেষ, তাদের পথচলার উদ্যম সহজে স্তিমিত হবে না। মনের মানুষের সন্ধানে বার হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ক্রমে এঁদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হয়ে ওঠে। তাঁর সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের প্রবন্ধ ও বক্তৃতা এবং অন্যান্য ব্রাহ্মপ্রধানদের শ্রদ্ধার ফলেই মূলতঃ বাংলাদেশের গোপন মনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণভাবধারার সংযোগ ঘটে। তাঁদের উৎসাহ দেখেই বাংলার শিক্ষিত তরুণ হিন্দুসমাজের চোখ পড়ে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির উপর। ব্রাহ্মদের সঙ্গে সংযোগ না হলে হয়ত এত সহজে এত অল্প সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হত না।

দ্বিতীয়তঃ, ব্রাহ্মভক্তদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে আধুনিক ভারতবাসীর জীবনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম পরিচয় ঘটেছিল। এর আগে তিনি যে রাজ্যে বাস করতেন তার সঙ্গে পাশ্চাত্যভাবধারায় দীক্ষিত, আধুনিক ভারতীয় মনের কোন সংস্পর্শই ছিল না। তাঁর প্রথম জীবনের অনুরাগীদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন হয় সাধুসন্ন্যাসী নাহয় সংস্কৃত পণ্ডিত ও প্রাচীনপন্থী ধর্ম-জিজ্ঞাসু। একমাত্র মথুরামোহন ছিলেন পুরো একেলা। কিন্তু মথুরামোহন যখন বেঁচেছিলেন তখনও তাঁর মন সাধনার আনন্দে বিভোর,—লোকসমাজে নবজীবন দান করার প্রেরণা তাঁর মধ্যে তখনও আসে নি। তাই মনে হয়, আধুনিক ভারতবাসীকে বোঝার চেষ্টা তখনও তাঁর মধ্যে জাগে নি। তাছাড়া, মাত্র একজন মথুরামোহনের সংসর্গে জাতির একটা এতবড় সম্প্রদায়ের চিত্তটিকে বোঝা যায় না। ব্রাহ্মদের সংস্পর্শে এসেই শ্রীরামকৃষ্ণের সূক্ষ্ম, সজাগ মন নব্য ভারতকে জানতে পেরেছিল। এই অভিজ্ঞতা পরে তাঁর শেষ জীবনে তরুণ শিষ্যদের গড়ে তোলার কাজে খুব সাহায্য করেছিল।

কিন্তু মহাভিক্ষু ব্রাহ্মদের কাছ থেকে যে মহৎ দান প্রত্যাশা করেছিলেন

শেষ পর্যন্ত তা তারা দিতে পারেন নি। ভারতবর্ষের দিকে দিকে তখন নিদারুণ সুপ্তি,—বিরাট মানুষগোষ্ঠী আত্মবিস্মৃতির মোহে আচ্ছন্ন। ঘরে ঘরে নিপীড়িত আত্মার করুণ আর্তনাদ। নবজাগরণের সঞ্জীবন মন্ত্র জীবন দিয়ে লাভ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু সে মন্ত্র ব্যবহার করে যিনি এই মৃত্যুর মহাদেশে প্রাণসুরধুনীকে জাগাবেন—সেই ভগীরথ না এলে ত শ্রীরামকৃষ্ণের সব সাধনা নিষ্ফল হয়। ব্রাহ্মদের কাছ থেকে তিনি চেয়েছিলেন সেই ভগীরথ। ভগীরথ সৃষ্টি করার মত ব্রাহ্মদের প্রায় সবই ছিল—প্রতিভা, সাধনার আগ্রহ ও নতুনের নিষ্ঠা। কিন্তু সর্বস্ব ত্যাগের তীব্র ব্যাকুলতা তাঁদের মধ্যে পাওয়া যায় নি। তাই তাঁরা কেউ নিজেকে নিঃশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ-নবজাগরণ-আন্দোলনে দান করতে পারেন নি।

কিছুদিন কাটবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ তা বুঝেছিলেন। ব্রাহ্মগণ তাঁর কথার নতুনত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন বটে কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবের গভীরতার পূর্ণ ধারণা করতে পারেন নি। আগে থেকেই পাশ্চাত্য ভাবধারা ও সংস্কারের মোহে তাঁদের মন আচ্ছন্ন ছিল। সেই মোহ কতকটা কাটিয়ে তাঁদের মধ্যে তত্ত্বপিপাসু ভক্তেরা সাধনভজনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু নিজের মধ্যে নব ভারতের ভগীরথকে জাগাতে হলে একদিকে চাই বিশাল প্রতিভা আর একদিকে আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য ইহজগতের সর্বস্ব ত্যাগ। এমন বিরাটপ্রাণ মানুষ কি দুঃখিনী ভারতের ঘরে জন্মাবে! সে সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়ে কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। তিনি ভাবমুখে দর্শন পেয়েছিলেন, সেই ভগীরথ এসেছেন, তাঁকে পূর্ণতম করার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। শুধু ভগীরথ নন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লীলার সঙ্গীরাও এসেছেন। ব্রাহ্মদের সংস্পর্শে কয়েক বছর কাটাবার পর নিরাশায় শ্রীরামকৃষ্ণের মনে জাগল তীব্র ব্যাকুলতা, তিনি আকুল স্বরে মার কাছে জানাতে লাগলেন, মা, কোথায় তোর সেই সব ত্যাগী ভক্তের দল। তাদের এবার এনে দেনা, তাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলে আনন্দ করি। বিষয়ী লোকদের সঙ্গে আর যে থাকতে পারি না।

হতাশ হলেও তিনি ব্রাহ্মদের ত্যাগ করলেন না। অসীম করুণায় তাঁদের মধ্যে এসে সদ্‌আলোচনা করে ও কীর্তনানন্দের হাঠ বসিয়ে তাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর মন পড়ে রইল মনের মানুষদের আসার প্রতীক্ষায়। সদানন্দ মহামানুষের ভিতরটা কেবলই হু-হু করে ওঠে, অজানা ভাষায় তিনি আকাশে আকাশে ডাক পাঠিয়ে দেন, ওরে, কোথায় তোরা, আমার হোমা পাখির দল? তোরা আয়, তোদের না দেখে আর যে থাকতে পারছি না।

সে যেন বৈশাখের দিনে নববর্ষার সমাগম প্রতীক্ষায় ধরণীর বুকফাটা ব্যাকুলতা।

হোমাপাখির দলের সঙ্গে মিলন

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। হঠাৎ একদিন আকাশ ভরে উদয় হল বিদ্যুৎভরা মেঘের দল। একে একে অন্তরঙ্গদের সমাগমে দিব্যপুরুষ নতুন লীলায় মেতে উঠলেন।

এ কথা স্বীকার করতে হবে, ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শ প্রভাবেই এই অন্তরঙ্গেরা দক্ষিণেশ্বরে এসে হাজির হয়েছিলেন। প্রথম আসেন ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত ও তাঁর আত্মীয় শ্রীমনোমোহন মিত্র। রামচন্দ্র সবেমাত্র চিকিৎসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজে চাকরি করছিলেন। প্রচলিত পাশ্চাত্য ভাবধারায় মানুষ হবার ফলে তিনি জড়বাদী ছিলেন, ভগবান বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু মনে তাঁর ঘনিয়ে উঠেছিল গভীর অশান্তি। এমনি মানসিক অবস্থায় হঠাৎ কেশবচন্দ্রের সম্পাদিত একখানি পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের গল্প তাঁর চোখে পড়ল। তিনি উৎসুক হয়ে মনোমোহনকে সঙ্গে নিয়ে একদিন দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে আসেন।

কিছুদিন পরে রামচন্দ্রের পরামর্শে তাঁর বন্ধু শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র এসে হাজির হন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে আসেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। এঁর পূর্ব আশ্রমের নাম ছিল শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ। বসিরহাটে এক ধনী জমিদারপরিবারে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ধর্মে অনুরাগ ছিল। তখন কলকাতায় স্কুলে পড়েন। পড়াশোনায় বিশেষ মন নেই দেখে সংশোধনের চেষ্টায় অভিভাবকেরা তাঁর বিয়ে দেন। বিয়ে হল মনোমোহনের বোনের সঙ্গে। অদৃষ্টের এমনি বিধান, মনোমোহন একদিন ভগ্নিপতিকে নিয়ে এলেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। দেখা হবামাত্র দুজনে পরস্পরের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করলেন। মাত্র কয়েক দিন আগে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবমুখে দেখেন, শ্রীজগদম্বা যেন তাঁর কোলে একটি ছেলেকে বসিয়ে দিয়ে বলছেন, এই তোর ছেলে। সে কি! তাঁর মত সন্ন্যাসীর ছেলে! তিনি অবাক্ হয়ে ভাবলেন। তখন জবাব শুনতে পেলেন, সংসারী ভাবে নয়,—এ তোর ত্যাগী মানসছেলে। রাখালকে দেখবামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের মনে পড়ল সেই দর্শনে-পাওয়া ছেলের মুখ। তিনি বুঝতে পারলেন, ইনিই তাঁর মানসছেলে। রাখাল ছিলেন বড় নিরীহ, শান্ত ও শিশুর মত সরল প্রকৃতির মানুষ।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে আসেন "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" লেখক শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। সে সময়ে তিনি কেশবচন্দ্রের উৎসাহী ভক্ত ছিলেন।

স্বামী শিবানন্দের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ হয় এই বছরেই। তাঁর পূর্ব আশ্রমের নাম ছিল শ্রীতারকচন্দ্র ঘোষাল। বারাসতের এক গুণী, অভিজাত বংশে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবা কুচবিহার রাজ্যের সহকারী দেওয়ান ছিলেন। তিনি তন্ত্রসাধনা করতেন। ছেলেবেলা থেকেই শিবানন্দের মন ধর্মপথে আকৃষ্ট হয়েছিল। প্রথম যৌবনে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতে শুরু করেন। রামচন্দ্রের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

এই বছরে স্বামী যোগানন্দও আসেন। দক্ষিণেশ্বরের এক অভিজাত বংশে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর জন্ম।

শ্রীশরৎ চন্দ্র ও শশীভূষণ চক্রবর্তী—স্বামী সারদানন্দ ও রামকৃষ্ণানন্দ আসেন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। দুজনেই তখন কলেজে পড়তেন এবং ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতেন।

এই বছরে শ্রীহরিনাথ চট্টোপাধ্যায়—স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং শ্রীকালীপ্রসাদ চন্দ্র—স্বামী অভেদানন্দও আসেন।

এই বছরে শ্রীহরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনলাভ করেন।

শ্রীসারদাপ্রসন্ন মিত্র—স্বামী ত্রিগুণাতীত, শ্রীবাবুরাম ঘোষ—স্বামী প্রেমানন্দ, শ্রীসুবোধ ঘোষ—স্বামী সুবোধানন্দ যখন প্রথম আসেন তখন তাঁরা সকলেই মহেন্দ্রনাথের স্কুলের ছাত্র।

শ্রীগঙ্গাধর ঘটক—স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে গুরুর প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই বছরে শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষও দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন।

শ্রীনিত্যরঞ্জন ঘোষ—স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, শ্রীগোপাল সুর—স্বামী অদ্বৈতানন্দ, শ্রীদুর্গাচরণ নাগ ও বলরাম বসু এই কয় বছরের মধ্যে বা কাছাকাছি কোন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

আর স্বামী বিবেকানন্দ আসেন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে। কলকাতায় সিমুলিয়া অঞ্চলের দত্ত বংশে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। ছেলেবেলা থেকেই নরেন্দ্রনাথের প্রাণ ছিল বিদ্যুৎভরা। জন্মের সঙ্গে তিনি পেয়েছিলেন অপরূপ প্রতিভা এবং দুর্জয় আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম দেখা হবার সময় তিনি কলেজে পড়তেন, জীবনের আদর্শ সন্ধানে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতেন।

তেজী, নিবিড়, উদ্দাম ছিল তাঁর মন। তিনি চমৎকার গান করতে পারতেন। একদিন সুরেন্দ্রের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণভক্তদের আনন্দঅনুষ্ঠানের আয়োজন হল, গুরুর কাছে ভজন গাইবার জন্য তিনি পাড়ার ছেলে নরেনকে নেমতন্ন করলেন। সেই উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেনের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে।

সেদিন মুগ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে সস্নেহে অনুরোধ জানান, 'একদিন খুব শীঘ্র দক্ষিণেশ্বরে এস। কিছুদিন পরে আত্মীয় রামচন্দ্রের পীড়াপীড়িতে নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে আসেন। সেই সাক্ষাতের পরে শ্রীরামকৃষ্ণ গল্প বলতেন, পশ্চিমের গঙ্গার দিকের দরজা দিয়ে নরেন্দ্র সেদিন ঘরে ঢুকেছিল। দেখলুম, নিজের দেহের দিকে লক্ষ্য নেই, মাথার চুল ও কাপড়জামার কোন পারিপাট্য নেই, বাইরের কোন বস্তুতেই ইতরসাধারণের মত একটা আঁট নেই। সবই যেন তার আলগা। চোখ দেখে মনে হল তার মনের অনেকটা কে যেন ভিতরের দিকে সর্বদা টেনে রেখেছে। দেখে মনে হল, বিষয়ী লোকের জায়গা কলকাতায় এত বড় সত্ত্বগুণী আধার থাকা কেমন করে সম্ভব হল!

শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে নরেনকে গাইতে বললেন। তিনি বাঙলা গান বেশি জানতেন না। ব্রাহ্মসমাজের মন চল নিজ নিকেতনে গানটি তন্ময় হয়ে গাইতে লাগলেন। তাঁর তন্ময়তা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ আর নিজেকে চেপে রাখতে পারলেন না, সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। তারপর প্রকৃতিস্থ হলে নরেনের হাত ধরে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। মহারত্ন পাওয়ার আনন্দে তাঁর প্রাণ ভরপুর। সহসা চোখ দিয়ে তাঁর দরদর করে চোখের জল পড়তে লাগল, মুখে সুধাভরা হাসি। নরেন যেন তাঁর বহুযুগের পরিচিত—এমনি অন্তরঙ্গের মত পরম স্নেহে তাঁকে বলতে লাগলেন, এত দিন পরে আসতে হয়? আমি তোর জন্যে যে কতদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি তা কি ভাবতে নেই? বিষয়ী লোকের বাজে কথা শুনতে শুনতে কান যে আমার ঝালাপালা হয়ে গেল। প্রাণের কথা আর কার সঙ্গে বলি বল্? এই সব কথা বলতে বলতে হঠাৎ তাঁর সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন: জানি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ। জীবের দুর্গতি দুর করার উদ্দেশ্যে দেহধারণ করেছ।

নরেন ত এ সব ব্যাপার দেখে অবাক্। এমন অদ্ভুত ব্যাপার তাঁর জীবনে কখনও ঘটে নি। তিনি প্রথমটা এ সব পাগলের খেয়াল বলে ভাবলেন। কিন্তু পাগলের ভালবাসার ব্যবহার যে বড় মধুর, কার সাধ্য তা উপেক্ষা করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঘর থেকে মাখন, মিছরি ও কতকগুলো সন্দেশ এনে নিজের হাতে নরেনকে খাওয়াতে উদ্যত হলেন। নরেন বললেন, আমাকে ওগুলো দিন, আমি বাইরে গিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে ভাগ করে খাই।

—না না। ওরা খাবে এখন। তুমি এগুলো এখানেই খাও। শ্রীরামকৃষ্ণ পরম স্নেহভরে বললেন।

নরেনের খাওয়া হলে তিনি তাঁর হাত দুটি ধরে বললেন, বল, খুব শীঘ্র আর একদিন এখানে আসবে। সেদিন একলা এস, সঙ্গে বন্ধু কারুকে এন না।

নরেন এই সস্নেহ অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। বললেন, হ্যাঁ, আসব।

নরেন্দ্র চলে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ সারাদিন ব্যাকুল হয়ে রইলেন। যতদিন যেতে লাগল তত তাঁর মনের ব্যাকুলতা বেড়ে গেল। সময়ে সময়ে এমন যন্ত্রণা হতে লাগল যে মনে হল যেন বুকের ভিতরটাতে কে গামছা নিঙরাবার মত করে জোর করে নিঙরাচ্ছে।

*

* *

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গদের দুভাগে ভাগ করেছিলেন। তিনি অন্তরঙ্গদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব, মনের সহজগতি, ধারণাশক্তির সীমা, অভীপ্সার রূপ বিশেষভাবে বিবেচনা করে পাত্রহিসাবে আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষা দিতেন। তাই সকলকেই নির্বিচারে সন্ন্যাসের পথে আকর্ষণ করেন নি। যাঁরা বিবাহিত, যাঁদের উপর সমগ্র পরিবারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, যাঁদের মধ্যে তীব্র বৈরাগ্যের দীপ স্বাভাবিকভাবে জ্বলে ওঠে নি, তিনি তাঁদের সংসার ত্যাগ করতে বলতেন না। বাবা, মা, স্ত্রী, পুত্র এদের যে স্বাভাবিক অধিকার আছে তা উপেক্ষা করে যে ভক্ত বৈরাগ্যের পথে আসতে চাইত তিনি তাকে নিরুৎসাহ করতেন। একদিন তিনি মহেন্দ্রনাথকে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, আর তোমায় বলি, বাপ মা মানুষ করলে, ছেলেপুলেও হল, এখন মাগ নিয়ে বেরিয়ে আসা! লোকে বাপমাকে ফাঁকি দিয়ে ছেলে মাগ নিয়ে বাউলবৈষ্ণবী সেজে বেরয়। তোমার বাপের অভাব নাই বলে। তা নাহলে আমি তোমায় বলতুম ধিক্। * * * বাপমা কি কম জিনিস গা? তাঁরা প্রসন্ন না হলে ধর্মটর্ম কিছুই হয় না। কতকগুলি ঋণ আছে। দেবঋণ, ঋষিঋণ। আবার মাতৃঋণ, পিতৃঋণ, স্ত্রীঋণ। মা বাপের ঋণ পরিশোধ না করলে কোন কাজই হয় না। * * * স্ত্রীর কাছেও

ঋণ আছে। হরিশ স্ত্রীকে ত্যাগ করে এখানে এসে রয়েছে। যদি তার স্ত্রীর খাবার জোগাড় না থাকত তাহলে বলতুম, ঢ্যামনা শালা।

হরিশ স্ত্রী ত্যাগ করে এলে তিনি বাধা দেন নি কারণ তাঁর স্ত্রীর ভরণ-পোষণের অভাব ছিল না। কিন্তু আর একজন ভক্ত বিবাগী হয়ে বাড়ি ছেড়ে তাঁর কাছে চলে এলে তিনি তাঁকে আশ্রয় দিতে রাজী হন নি। এ সম্বন্ধে শিষ্যদের কাছে নিজের আচরণের ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, প্রতাপের ভাই এসে এখানে কয়েকদিন ছিল। বলে, আমি এখানে থাকব। শুনলুম মাগ ছেলে সব শ্বশুর বাড়িতে রেখেছে,অনেকগুলি ছেলেপিলে। তাকে খুব বকলুম। দেখ দেখি ছেলেপুলে হয়েছে, তাদের কি আবার ও পাড়ার লোক এসে খাওয়াবে দাওয়াবে, মানুষ করবে। লজ্জা করে না যে মাগছেলেকে আর একজন খাওয়াচ্ছে আর তাদের শ্বশুরবাড়ি ফেলে রেখেছ! অনেক বকলুম আর কাজকর্ম খুঁজে নিতে বললুম। তখন এখান থেকে চলে গেল।

লক্ষ্যলাভের জন্য সকলের পক্ষে সংসার ত্যাগ যে একান্ত প্রয়োজন—একথা শ্রীরামকৃষ্ণ কোনদিন বলতেন না। একবার একজন গৃহী ভক্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সংসারেতে থাকলে কি ভগবানকে লাভ হয়? তখুনি উত্তর এল, সে কি, সংসারে থাকবে না ত কোথায় যাবে? আমি দেখছি যেখানেই থাকি রামের অযোধ্যায় আছি। এই জগৎ সংসার রামের অযোধ্যা। রামচন্দ্র গুরুর কাছে জ্ঞানলাভ করার পর বললেন, আমি সংসার ত্যাগ করব। দশরথ তাঁকে বোঝাবার জন্যে বশিষ্ঠকে ডেকে পাঠালেন। বশিষ্ঠ এসে দেখলেন রামের তীব্র বৈরাগ্য। তখন বললেন, রাম, আগে আমার সঙ্গে বিচার কর, তারপর সংসার ত্যাগ করো। আচ্ছা বলত, সংসার কি ঈশ্বর ছাড়া? তা যদি হয় তাহলে তোমার ত্যাগ করা উচিৎ। রাম দেখলেন, ভগবানই জীবজগৎ সব হয়েছেন। তাঁর সত্তাতে সমস্ত সত্য বলে বোধ হচ্ছে। তখন রামচন্দ্র চুপ করে রইলেন।

পৌরাণিক উপমাটি শেষ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে লাগলেন, সংসারে কাম ক্রোধ এই সবের সঙ্গে লড়াই করতে হয়, নানা বাসনার সঙ্গে লড়াই করতে হয়। লড়াই কেল্লা থেকে হলেই সুবিধে। গৃহ থেকে এ লড়াই করা ভাল। গৃহ যেন কেল্লা। গৃহে খাবার মেলে। কলিতে অন্নগত প্রাণ। অন্নের জন্য সাত জায়গায় ঘোরার চেয়ে এক জায়গাই ভাল। একজন তার মাগকে বলেছিল, আমি সংসারে ত্যাগ করে চললুম। মাগটি একটু জ্ঞানী ছিল। বললে,

কেন ঘুরে ঘুরে বেড়াবে ? যদি পেটের ভাতের জন্য দশ ঘরে যেতে না হয় তবে যাও। আর যদি হয়, তাহলে এই এক ঘরই ভাল। তোমরা সংসার ত্যাগ করবে কেন ? বাড়িতে থাকাই বরং সুবিধে। আহারের জন্য ভাবতে হবে না। সহবাস স্বদারার সঙ্গে তাতে দোষ নাই। শরীরের যখন যেটি দরকার কাছে পাবে। রোগ হলে সেবা করবার লোক কাছে পাবেই।

কিন্তু সংসারে থাকতে হবে ভগবানের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, সংসারে থাক ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে। ঝড়ের এঁটো পাতাকে কখন ঘরের ভিতর লয়ে যায়, কখন আঁস্তাকুড়ে। হাওয়া যেদিকে যায় পাতাও সেদিকে যায়। কখন ভাল জায়গায়, কখন মন্দ জায়গায়। সংসারে তিনি তোমাকে রেখেছেন, তা কি করবে ? সমস্ত তাঁকে দিয়ে দাও, আত্মসমর্পণ করে সংসারের কাজ কর। তাহলে আর কোন গোল থাকবে না। তখন দেখবে তিনিই সব করছেন। সবই 'রামের ইচ্ছা'।

ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'রামের ইচ্ছা' গল্পটি কি ?

—এক গাঁয়ে একজন তাঁতি থাকত। সে বড় ধার্মিক। সকলেই তাকে বিশ্বাস করে আর ভালবাসে। তাঁতি হাটে গিয়ে কাপড় বেচে। খদ্দের দাম জিজ্ঞাসা করলে বলে, রামের ইচ্ছে সুতোর দাম এক টাকা, রামের ইচ্ছে মেহন্নতের দাম চার আনা, রামের ইচ্ছে মুনাফা দু আনা, কাপড়ের দাম রামের ইচ্ছেয় এক টাকা ছয় আনা। লোকের এত বিশ্বাস যে তার কথা শুনে তখুনি দাম ফেলে দিয়ে কাপড় কিনত। লোকটি ভারি ভক্ত, রাত্তিরে খাওয়া দাওয়া করে অনেকক্ষণ ঘরের দাওয়ায় বসে কীর্তন করত। একদিন অনেক রাত পর্যন্ত লোকটির ঘুম হচ্ছে না, বসে আছে। এক একবার তামাক খাচ্ছে। এমন সময় সেই জায়গা দিয়ে একদল ডাকাত ডাকাতি করতে যাচ্ছে। তাদের মুটের অভাব হওয়াতে তাঁতিকে বললে, আমাদের সঙ্গে আয়। এই বলে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল। তারপর একজনের বাড়ি গিয়ে ডাকাতি করলে আর কতকগুলি জিনিস তাঁতির মাথায় চাপিয়ে দিলে। এমন সময় পুলিশের লোক এসে পড়ল। ডাকাতেরা পালাল। কেবল তাঁতিটি মাথায় মোট সুদ্ধ ধরা পড়ল। পরের দিন হাকিমের কাছে তাঁতির বিচার বসল। গাঁয়ের লোক খবর পেয়ে সব এসে হাজির। তারা সকলে বললে, এ লোক কখনও ডাকাতি করতে পারে না। হাকিম তখন তাঁতিকে জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছিল তুমি সব বলত। তাঁতি বললে, হুজুর, রামের ইচ্ছে আমি রাত্তিরে

ভাত খেলুম। রামের ইচ্ছে অনেক রাত হল, আমি দাওয়ার বসে ভগবানের নাম করছিলুম। রামের ইচ্ছে এক দল ডাকাত পথ দিয়ে যেতে যেতে আমাকে ধরে টেনে নিয়ে গেল। রামের ইচ্ছে তারা একজনের বাড়িতে ডাকাতি করলে। রামের ইচ্ছে তারা আমার মাথায় একটা মোট চাপিয়ে দিলে। রামের ইচ্ছে আমি ধরা পড়লুম। আজ সকালে রামের ইচ্ছে হুজুরের কাছে এনেছে। অমন ধার্মিক লোক দেখে হাকিম তাঁতিকে ছেড়ে দিলে। তাঁতি রাস্তায় বন্ধুদের বললে, রামের ইচ্ছে আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।

গল্পটি বলে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করলেন, সংসার করা না করা সবই রামের ইচ্ছে। তাই ভগবানের উপর সব ফেলে দিয়ে সংসারের কাজ কর।

অবশ্য ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের মধ্যে লেশমাত্র ভণ্ডামি থাকলে চলবে না। "রামের ইচ্ছা"ই যে পৃথিবীতে সব—এই বিশ্বাস সত্যিকার হওয়া চাই। নিজের মনের সঙ্গে জুয়াচুরি করলে কোন কাজই হবে না। মন মুখ এক হওয়া চাই। মুখে রামের ইচ্ছা অথচ অন্তরে আমিই কর্তা ভাব থাকলে ভক্তের আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণ নিষ্ফল হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথাটি ভক্তদের গল্প দিয়ে বোঝাতেন : এক ব্রাহ্মণ খুব খেটেখুটে একটি সুন্দর বাগান তৈরি করেছিল। তাতে নানা ফলের গাছ। একদিন ব্রাহ্মণ কাজে বাইরে গেছে এমন সময় একটি গরু এসে সেই সব ফলের গাছ মুড়িয়ে খেতে লাগল। ব্রাহ্মণ ফিরে এসে গরুটাকে দেখে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তাকে এক ঘা লাঠি মারলে। মারতেই গরুটা মরে গেল। ব্রাহ্মণের তখন প্রাণে খুব ভয় হল—হিন্দু ব্রাহ্মণ হয়ে গোহত্যা করেছে, গোহত্যার পাপ যে বড় ভীষণ। তারপর তার মনে পড়ল, শাস্ত্রে আছে, ইন্দ্রের শক্তিতে মানুষের হাত চলে। সে তখন মনকে বোঝালে, আমি ত গোহত্যা করি নি, ইন্দ্রের শক্তিতে হাত কাজ করে, ইন্দ্রই গোহত্যা করেছে। এদিকে কিছুদিন পরে গোহত্যাপাপ এসে ব্রাহ্মণের কাছে হাজির হল। ব্রাহ্মণ তাকে তাড়িয়ে দিয়ে বললে, যাও, আমি কিছু করি নি। গোহত্যা ইন্দ্র করেছে, তার কাছে যাও। কাজেই পাপ দেবলোকে গিয়ে ইন্দ্রকে ধরতে গেল। ইন্দ্র সব শুনে বললেন, একটু বস, আমি ব্রাহ্মণের সঙ্গে দুটো কথা বলে আসি। তারপর আমাকে ধরো। * * * ইন্দ্র মানুষের মূর্তি ধরে ব্রাহ্মণের বাগানে ঢুকে বলতে লাগলেন, আহা কি চমৎকার বাগানটি! যেখানে যেটি দরকার সেখানে সেই গাছ পোতা হয়েছে। তারপর ব্রাহ্মণকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, মশাই, বলতে পারেন কে এই চমৎকার বাগানটি করেছে। ব্রাহ্মণ

ত নিজের প্রশংসা শুনে আনন্দে গদগদ হয়ে গেছে, বললে, আজ্ঞে, আমিই বাগানটি করেছি, এটি আমার। আসুন না, বাগানটি ভাল করে বেড়িয়ে দেখুন। ইন্দ্রকে নিয়ে ব্রাহ্মণ সারা বাগানটি বেড়িয়ে বেড়িয়ে বলতে লাগল, এটি আমি করেছি, ওটি আমি করেছি। এমন সময় তারা এসে হাজির হল যেখানে মরা গরুটা পড়েছিল। ইন্দ্র তা দেখে যেন চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কি, এখানে গোহত্যা কে করলে? ব্রাহ্মণের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, ইন্দ্র করেছে। তখন ইন্দ্র নিজের মূর্তি ধরে বললেন, তবে রে ভণ্ড, প্রশংসার বেলায় তুমি আর পাপের বেলায় আমি! নে তোর গোহত্যার পাপ। তখন পাপ এসে ব্রাহ্মণের ঘাড়ে চেপে বসল।

সংসারে থাকতে হবে পাঁকাল মাছের মত নির্লিপ্ত হয়ে। জীবনে একমাত্র ভগবানই সার বস্তু। গৃহস্থের সর্বদা সেই ভগবানের দিকে মন রাখতে হবে। ভগবানকে যতই চিন্তা করবে ততই তার ভোগের আসক্তি কমবে। ভগবদ্‌ভক্তি যতই গভীর হবে বিষয়বাসনা ততই কম পড়বে, দেহের সুখের দিকে দৃষ্টি ততই ক্ষীণ হয়ে যাবে। কিন্তু এই নির্লিপ্ততা ত সহজে লাভ করা যায় না। কোন এক অসতর্ক ক্ষণে সামান্য বাসনার পাশে বদ্ধ হয়ে কত যে মহৎ জীবন সংসারের পাঁকে ডুবে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ কৌপীনধারী সাধুর গল্প বলতেন, একজন সাধু গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র নিয়ে নির্জনে একটি চালাঘরে সাধন ভজন করত। রোজ স্নান করে সে ভিজে কাপড় আর কৌপীন ঘরের চালে শুখোতে দিত। তারপর সাধু যখন ভিক্ষেয় বেরুত তখন একটা ইঁদুর এসে সেই কৌপীন কেটে দিত। সাধু ভিক্ষেয় বেরিয়ে রোজ গাঁয়ের লোকের কাছ থেকে কৌপীন চাইত। গাঁয়ের লোকেরা বললে, রোজ রোজ আপনাকে কে কৌপীন দেবে? আপনি বরং একটা বেড়াল পুষুন। তাহলে বেড়ালের ভয়ে আর ইঁদুর আসবে না। সাধু তখুনি এক বেড়ালের বাচ্ছা নিয়ে এল। সেদিন থেকে ইঁদুরের উপদ্রব বন্ধ হল। এদিকে বেড়ালের বাচ্ছার জন্যে সাধুকে রোজ দুধ ভিক্ষে করে আনতে হত। কিছুদিন পরে একজন সাধুকে বললে, দুচার দিন ভিক্ষে করে চলতে পারে, বার মাস আপনাকে দুধ দেবে কে! বরং একটি গরু পুষুন। তার দুধ আপনিও খেতে পারবেন, বেড়ালকেও খাওয়াতে পারবেন। কিছুদিন পরে সাধু একটি গরু পুষলেন। তারপর রোজ গাঁয়ে গিয়ে গরুর জন্যে খড় ভিক্ষে করে আনতে লাগলেন। তখন গাঁয়ের লোকেরা বললে, রোজ আপনাকে খড় দেবে কে!

তার চেয়ে আপনার ঘরের সামনে যে পতিত জমি পড়ে আছে তাতে চাষবাস করুন। তাহলে আর আপনার খড়ের অভাব থাকবে না। সাধু তখন চাষ আরম্ভ করলেন। ক্রমে ঘরসংসার ফেঁদে গৃহস্থের মত সাধুর দিন কাটতে লাগল। কিছুদিন পরে গুরু এসে উপস্থিত। সব দেখে বললেন, এ সব কি? শিষ্য লজ্জা পেয়ে গুরুকে বললেন, বাবা, এ সব এক কৌপীনকে ওয়াস্তে।

গৃহস্থের পক্ষে নির্লিপ্তসাধন ও ভগবদ্‌ভক্তিলাভের পথ কি? মাঝে মাঝে নির্জন বাস, সাধুসঙ্গ, ভগবানের নামগান ও বস্তুবিচার—এই অবলম্বন করে সংসারী লক্ষ্য পথে এগিয়ে যাবে। তিনি মহেন্দ্রনাথকে একদিন এই অবলম্বন-গুলির বিষয় ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, ঈশ্বরের নামগুণগান সর্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ—ভগবানের ভক্ত বা সাধু—এদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর বিষয় কাজের মধ্যে রাতদিন থাকলে ভগবানে ভক্তি হয় না। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থার মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ভগবানে মন রাখা বড় কঠিন। যখন চারা গাছ থাকে তখন তার চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে। ধ্যান করবে মনে, কোণে আর বনে। আর সর্বদা সদসৎ বিচার করবে। ঈশ্বর সৎ কিনা নিত্যবস্তু। আর সব অসৎ কিনা অনিত্য। এই বিচার করতে করতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ করবে। **** সংসারে কি ভাবে থাকবে জান? সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী,পুত্র, বাপ, মা সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জানবে যে তারা তোমার কেউ নয়। বড় মানুষের বাড়ির দাসী সব কাজ করছে কিন্তু দেশে নিজের বাড়ির দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মত মানুষ করে। বলে, আমার রাম আমার হরি কিন্তু মনে বেশ জানে, এরা তার কেউ নয়। কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায় কিন্তু মন তার কোথায় পড়ে আছে জান? আড়ায় পড়ে আছে। সেখানে তার ডিমগুলি ফেলে গেছে। সংসারের সব কর্ম করবে কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে। ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না করে যদি সংসার করতে যাও তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ এ সবে অধৈর্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয় চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে। তেল হাতে মেখে তবে কাঁটাল ভাঙতে হয়। তা না হলে হাতে আটা জড়িয়ে যায়। ভগবদ্‌ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।

কিন্তু এই ভক্তিলাভ করতে হলে নির্জন হওয়া চাই। মাখন তুলতে গেলে নির্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপর নির্জনে বসে সব কাজ ফেলে দই মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়। আবার দেখ, এক মনে নির্জনে ঈশ্বর চিন্তা করলে জ্ঞানবৈরাগ্যভক্তি লাভ হয়। কিন্তু সংসারে ফেলে রাখলে ঐ মন নীচগামী হয়ে যায়। সংসারে কেবল কামিনীকাঞ্চন চিন্তা। * * * সংসার জল আর মনটি যেন দুধ। যদি দুধ জলে ফেলে রাখ তাহলে দুধে জলে মিশে এক হয়ে যায়। খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায় তাহলে ভাসে। তাই নির্জনে সাধনা করে আগে জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসার জলে ফেলে রাখলে মিশবে না, ভেসে থাকবে। * * * সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনীকাঞ্চন অনিত্য, ভগবানই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকার জায়গা হয়,—এই পর্যন্ত। তাতে ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের কোন উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর নাম বিচার।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন জীবনের শিল্পী,—কারিগর নন। তিনি একটা মাপাজোপা কাটামোর মধ্যে ফেলে ভক্তদের জীবন গড়তে চাইতেন না। বিধিবদ্ধ নিষেধবিধানের উপর তাঁর কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। তিনি সংসারী ভক্তদের বলতেন, সংসারে যা নিত্য,—যা একমাত্র সত্য, তাঁর দিকে ফের। যে যেখানেই থাক তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর। এই হচ্ছে মানুষের দিব্য জীবন। সংসারের মধ্যে সন্ন্যাসকে ফুটিয়ে তোল—কর্মের মধ্যে নিষ্কাম নির্লিপ্ততা। শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল যেন ভক্তদের নিয়ে ফুল ফোটানোর খেলা। দক্ষিণ হাওয়ার স্পর্শ যেমন সন্ধ্যামালতীর পাপড়ি ধরে টানা হেঁচড়া না করে শুধু তার বুকের গোপন গন্ধটিকে জাগিয়ে দেয়, শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনি সহজ পথে অন্তরঙ্গদের মনে সচ্চিদানন্দের ব্যাকুলতা জাগিয়ে তুলতেন। তারপর হৃদয়ে হৃদয়ে শতদলের দলগুলি আপন চেষ্টাতেই নিজেদের মেলে ধরত। তাঁর উপদেশের মধ্যে হ্যাঁ ও না-র বিস্তারিত তালিকা থাকত না, বিধিবাঁধা পথ এবং অবশ্য কর্তব্যের নির্দেশও থাকত না। তিনি অপরূপ ভাষায় অপূর্ব মৌলিক রীতিতে মূল কথাটিকে রঙে রেখায় মনোহর করে তুলতেন। সুনিপুণ হাতে মানুষের হৃদয় বীণার মূল তারটিকে এমনভাবে স্পর্শ করতে চাইতেন যাতে তা আপনা থেকেই আপন সুরে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে।

লীলাসঙ্গীদের জীবনে নিজেকে দান

শুধু উপদেশ নয়,—কথা নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী অন্তরঙ্গদের মত গৃহী অন্তরঙ্গদের জীবনেও নিজেকে ঢেলে দেবার চেষ্টা করতেন। ১৮৮১ থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রধানতঃ অন্তরঙ্গদের গড়ার কাজেই তাঁর জীবনস্রোত ধাবিত হয়েছিল। হৃদয়ে হৃদয়ে পাহাড় কেটে উর্বর জমি সৃষ্টি করার জন্য কি অকুণ্ঠিত তাঁর সাধনা। বেশির ভাগ অন্তরঙ্গ থাকতেন কলকাতায়। তিনি দক্ষিণেশ্বর থেকে রাম, বলরাম, অধর প্রভৃতির কলকাতার বাড়িতে গিয়ে বারে বারে সদ্‌আলোচনা ও সাধুসঙ্গের হাট বসাতেন। শুধু অন্তরঙ্গদের বাড়িতে নয়, বিশেষ বিশেষ অনুরাগী লোকদের ভবনে, ব্রাহ্মদের নানা জায়গার সমাজমন্দিরেও ছিল তাঁর যাতায়াত। আর দক্ষিণেশ্বরে ত প্রায় নিত্য—বিশেষতঃ ছুটির দিনে সারাদিন লেগে থাকত আনন্দের মহোৎসব। অন্তরঙ্গেরা আসতেন, অনুরাগীরা আসতেন, আর দেশবিদেশ থেকে রোজ আসত আর্ত ও উৎসুক মানুষের দল।

তিনি ছিলেন পরম কারুণিক। অন্তরঙ্গেরা তাঁর কাছ থেকে আনন্দসুধা খুঁজে নেবে—এই আশায় বসে থাকতে পারতেন না। তিনি নিজেই সুধার পসরা নিয়ে তাঁদের খুঁজে বেড়াতেন। নিঃস্বার্থ ভালবাসায় তাঁর হৃদয় ছিল ভরা। পরম আপন জনের মত তাঁদের খবরাখবর নিতেন। কেউ কিছুদিন না এলে লোক পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে আনাতেন। কখন কখন আবার ব্যাকুল-ভাবে আসার জন্য তাঁদের কাছে মিনতি জানাতেন। যেন ভক্তদের সাহচর্যে তাঁর উপকার হয়। কখন কখন তাঁর অনুরোধ ভর্ৎসনারূপে প্রকাশ পেত। কিন্তু সে ভর্ৎসনা ভালবাসার স্পর্শে কি মহিমাময়। কাজের চাপে একবার মহেন্দ্র কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে যেতে পারেন নি। তারপর বলরামের বাড়িতে দেখা হতেই শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যগ্রভাবে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এতদিন দক্ষিণেশ্বরে যাওনি গো?

মহেন্দ্র উত্তর দিলেন, আজ্ঞে, কেদেটিতে গেছলুম, কলকাতায় ছিলুম না।

—কি গো, ছেলেপুলে নাই, কারুর চাকরি করতে হয় না। তবুও অবসর নাই! ভাল জ্বালা।

মহেন্দ্র একটু সপ্রতিভ হয়ে চুপ করে রইলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণে

সদাই ভয়, পাছে বা কারুকে হারান। তাই ভর্ৎসনার পরে সান্ত্বনা দিয়ে মহেন্দ্রকে বোঝাতে লাগলেন, তোমায় বলি কেন ? তুমি সরল, উদার, তোমার ভগবানে ভক্তি আছে।

—আজ্ঞে, আপনি আমার ভালর জন্যেই বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তবু ছাড়লেন না। মানুষের মনে কত না হিসাব। তিনি সেই সব হিসাবের কথা অনুমান করে বিচারের পথে শিষ্যকে বোঝাতে লাগলেন : আর এখানকার যাত্রায় প্যালা দিতে হয় না। যদুর মা তাই বলে, অন্য সাধু কেবল দাও দাও করে, বাবা, তোমার উটি নাই। বিষয়ী লোকেরা টাকা খরচ হলে বিরক্ত হয়। * * * এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছিল। একজন লোকের বসে শোনবার ভারি ইচ্ছে হল। কিন্তু সে উঁকি মেরে দেখলে যে আসরে প্যালা পড়ছে। তখন আস্তে আস্তে পালিয়ে গেল। তারপর আর এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছিল সেখানে গেল। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলে এখানে কেউ প্যালা দেবে না। ভারি ভিড় হয়েছে। সে দুহাতে কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে আসরে গিয়ে হাজির। আসরে ভাল করে বসে গোঁপে চাড়া দিয়ে শুনতে লাগল।

মহেন্দ্র যদি গুরুর সেবার জন্য খরচের ভয় করে থাকেন—তা ভেবে তিনি গল্পচ্ছলে বোঝালেন যে তিনি কারুর কাছে টাকার প্রত্যাশী নন। তারপর পাছে সংসারের ভারে সাধুসঙ্গ করার ইচ্ছায় ভাঁটা পড়ে থাকে সেই কথা তাঁর মনে উদয় হল। তিনি মহেন্দ্রকে বলতে লাগলেন : আর তোমার ত ছেলেপুলে নাই যে মন অন্যমনস্ক হবে। একজন ডেপুটী, আটশ টাকা মাইনে, কেশব সেনের বাড়িতে নববৃন্দাবন নাটক দেখতে এসেছিল। আমিও গিছলাম। নাটক শোনবার জন্য আমি যেখানে বসেছি তারা সেখানে এসে আমার পাশে বসল। যতক্ষণ নাটক হল ডেপুটীর কেবল ছেলের সঙ্গে কথা! শালা একবারও কি থিয়েটার দেখলে না। আবার শুনেছি নাকি মাগের দাস। ওঠ্ বললে ওঠে, বস্ বললে বসে। আবার একটা খাঁদা বানুরে ছেলের জন্য এই! * * * তা তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে এক একবার।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্তসমাগমেরচা আনন্দের হাটে শুধু তত্ত্ববিচার ও নামকীর্তন করতেন না। তাঁর শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল হওয়া,—জানা নয়। ভক্তদের জীবন যাতে নব ভাবধারায় গড়ে ওঠে—তাই ছিল তাঁর প্রধান চেষ্টা। সেই গড়ার কাজে যে তত্ত্ববিচার সাহায্য করে না তার দিকে তিনি মোটেই আগ্রহ দেখাতেন না। তিনি নিছক গুরুর মত শুধু সাধারণ তাত্ত্বিক উপদেশ

দিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারতেন না। তিনি একই তীর্থের সহযাত্রীর মত তাঁদের পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। অন্তরঙ্গদের জীবন গড়ার কাজে যাতে হাতেনাতে সাহায্য হয় তার জন্য একান্ত চেষ্টা করতেন। কখন নিজের সাধন-জীবনের গল্প বলে তাঁদের এগিয়ে যাবার পথের সন্ধান দিতেন। কখন তাঁদের জীবনের প্রশ্ন ও সমস্যাগুলির সমাধান একটা বাঁধাধরা আদর্শজীবনের বিস্তৃতির পটভূমিতে না করে ব্যক্তিগত জীবনের সীমাবদ্ধ পরিধির উপর ভিত্তি করে পাবার চেষ্টা করতেন। বলরামের বাড়িতে এক বৈঠকে নিজের ধ্যান সাধনার গল্প বলছেন : সাধনার সময় আমি ধ্যান করতে করতে আরোপ করতুম প্রদীপের শিখা—যখন হাওয়া নাই আর তা একটুও নড়ে না। * * * গভীর ধ্যানে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়। একজন ব্যাধ পাখি মারবার জন্যে তাগ করছে। কাছ দিয়ে বর চলে যাচ্ছে, সঙ্গে বরযাত্রীরা। কত রোশনাই, বাজনা, গাড়ি, ঘোড়া সব কতক্ষণ ধরে কাছ দিয়ে চলে গেল। ব্যাধের কিন্তু হুঁশ নাই। সে জানতে পারলে না যে কাছ দিয়ে বর চলে গেল। * * * একজন একলা একটি পুকুরের ধারে মাছ ধরছে। অনেকক্ষণ পরে ফাতনাটা নড়তে লাগল, মাঝে মাঝে কাত হতে লাগল। সে তখন ছিপ হাতে করে টান মারবার উদ্যোগ করছে। এমন সময় একজন পথিক এসে জিজ্ঞাসা করলে, মশাই, অমুক বাঁড়ুজ্জেদের বাড়ি কোথায় বলতে পারেন? কোন উত্তর নাই। লোকটি তখন ছিপ হাতে করে খ্যাঁচ মারবার চেষ্টা করছে। পথিক বারবার চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ও মশাই, শুনছেন অমুক বাঁড়ুজ্জের বাড়ি কোথায় বলতে পারেন? লোকটির হুঁশ নাই, তার হাত কাঁপছে, কেবল ফাতনার দিকে দৃষ্টি। তখন পথিক বিরক্ত হয়ে চলে গেল। এমন সময় ফাতনাটা ডুবে গেল আর লোকটি টান মেরে মাছটাকে আড়ায় তুললে। তারপর গামছা দিয়ে মুখ মুছে পথিককে চেঁচিয়ে ডাকলে, ওহে শোন, শোন। পথিক তখন অনেক দূরে চলে গেছে, কিছুতেই ফিরতে চায় না। শেষে অনেক ডাকাডাকির পর ফিরলে। কাছে এসে বললে, কেন, আমায় ডাকছ কেন? লোকটি তখন জিজ্ঞাসা করলে, তুমি আমায় কি বলছিলে? পথিক অবাক হয়ে বললে, তখন অত বার বললুম শুনলে না আর এখন জিজ্ঞাসা করছ কি বললুম। লোকটি বললে, তখন যে ফাতনা ডুবছিল, তাই আমি কিছুই শুনতে পাই নাই। * * * ধ্যানে এই রকম একাগ্রতা হয়। অন্য কিছু দেখা যায় না, শোনাও যায় না। স্পর্শবোধ পর্যন্ত থাকে না। সাপ গায়ের উপর দিয়ে চলে যায়

জানতে পারে না। যে ধ্যান করে সেও বুঝতে পারে না, সাপটাও জানতে পারে না। * * * ধ্যানের সময় প্রথম প্রথম ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল সামনে আসে। গভীর হলে সে সব আর আসে না। ধ্যান করতে করতে কত কি আমার দর্শন হত। প্রত্যক্ষ দেখলুম, সামনে টাকার কাঁড়ি, শাল, এক থালা সন্দেশ, ছুটো মেয়ে, তাদের ফাঁদী নথ। মনকে জিজ্ঞেস করলুম, মন, তুই কি চাস? কিছু ভোগের বাসনা কি আছে? মন বললে, না, কিছুই চাই না। সচ্চিদানন্দ ছাড়া আর কিছু চাই না। মেয়েদের ভিতর বার দেখতে পেলুম— যেমন কাঁচের ঘরে সব জিনিস বার থেকে দেখা যায়। মেয়েদের ভিতরে দেখলুম নাড়ী, ভুঁড়ি, রক্ত, বিষ্ঠা, কৃমি, কফ, নাল এই সব।

গিরিশের সিদ্ধাইএর দিকে ঝোঁক ছিল। তাঁর মাঝে মাঝে ইচ্ছে হত, গুরুর নাম নিয়ে রোগ ভাল করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তা পছন্দ করতেন না। একদিন তাঁকে ইঙ্গিতে বললেন, অনেকের ইচ্ছে হয় গুরুগিরি করি। যাদের একটু সিদ্ধাই থাকে তাদের নাম, লোকমান্য এই সব হয়। পাঁচ-জনে গণে মানে, শিষ্যসেবক হয়। * * * গুরুগিরি বেশ্যাগিরির মত। ছার টাকাকড়ি, লোকমান্য, শরীরের সেবা! এ সবের জন্যে আপনাকে বিক্রি করা! যে দেহমন আত্মা দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায় তা সামান্য পাওয়ার জন্যে এ রকম করে রাখা ভাল নয়। একজন বলেছিল সাবির এখন খুব সময়। এখন বেশ তার হয়েছে—একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে, ঘুঁটেরে, গোবররে, তক্তপোষ, তুখানা বাসন হয়েছে, বিছানা, মাতুর, তাকিয়া। কত লোক বশীভূত হচ্ছে, আসছে, যাচ্ছে। অর্থাৎ সাবি এখন বেশ্যা হয়েছে তাই সুখ ধরে না। আগে সে ভদ্রঘরের দাসী ছিল, এখন বেশ্যা হয়েছে। সামান্য লাভের জন্য নিজের সর্বনাশ! * * * * যারা হীনবুদ্ধি তারা সিদ্ধাই চায়। ব্যারাম ভাল করা, মোকদ্দমা জিতিয়ে দেওয়ানো, জলে হেঁটে চলে যাওয়া —এই সব। যারা শুদ্ধ ভক্ত তারা ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছু চায় না।

কারুর ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান করার সময় তিনি মানুষটিকে আগে দেখতেন। নিছক তত্ত্বের কঠিন বাঁধন দিয়ে কারুর জীবনের সাধনাকে পঙ্গু করে রাখতে চাইতেন না—এমনই অতল মানবিকতায় তাঁর হৃদয় ভরা ছিল। একজন অন্তরঙ্গ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যাতে বেশি টাকাকড়ি হয় সে চেষ্টা কি করা উচিত?

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন, বিদ্যার সংসারের জন্য সে চেষ্টা করা যেতে

পারে। তুমি বেশি উপায়ের চেষ্টা করবে কিন্তু সদুপায়ে। উপার্জন করা উদ্দেশ্য নয়, ভগবানের সেবা করাই উদ্দেশ্য। টাকায় যদি তাঁর সেবা হয় ত সে টাকায় দোষ নাই।

গৃহস্থের পক্ষে টাকা উপায়ের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পরিবার পরিজনের কথা। টাকা উপায় যদি করতে হয় ঈশ্বরের সেবার উদ্দেশ্যে তাহলে পরিজনদের প্রতি কর্তব্যের কি হবে! জিজ্ঞাসু শিষ্য তাই দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, পরিবারের লোকদের উপর কর্তব্য কতদিন?

অবিলম্বে উত্তর এল, তাদের খাওয়া পরার কষ্ট না থাকে। কিন্তু সন্তান নিজে সমর্থ হলে আর তাদের ভার লবার দরকার নাই। পাখির ছানা খুঁটে খেতে শিখলে মা আর তাকে দেখে না। মার কাছে খেতে এলে মা ঠোক্কর মারে।

অধর ছিলেন সরকারী উচ্চ কর্মচারী—ডেপুটী। ঈশ্বর ছাড়া পৃথিবীতে আর সব অনিত্য—এই বোধে তাঁকে কি ডেপুটীর চাকরি ছেড়ে দিতে হবে? তিনি অধরকে বললেন, তুমি ডেপুটী। এ পদও ভগবানের অনুগ্রহে হয়েছে। তাঁকে ভুল না। * * * * সংসার কর্মভূমি। এখানে কর্ম করতে আসা। যেমন দেশে বাড়ি, কলকাতায় গিয়ে কর্ম করা। জীবনে কিছু কর্ম করা দরকার। তা-ই সাধন। তাড়াতাড়ি কর্মগুলি শেষ করে নিতে হয়। স্যাকরারা সোনা গলাবার সময় হাপর, পাখা চোঙ সব দিয়ে হাওয়া করে যাতে আগুনটা খুব হয়ে সোনাটা গলে। সোনা গলার পর তখন বলে তামাক সাজ। এতক্ষণ কপাল দিয়ে ঘাম পড়ছিল। তারপর তামাক খাবে। * * * * খুব রোক চাই। তবে সাধন হয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা চাই। তাঁর নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত নরম, গাছের অঙ্কুর যা হয় তা এত নরম তবু সেই অঙ্কুর শক্ত মাটি ফুঁড়ে ওঠে। ঈশ্বরে সর্বদা মন রাখবে। প্রথমে একটু খেটে নিতে হয়, তারপর পেন্সান ভোগ করবে।

শ্রীমণিমোহন মল্লিকের একজন আত্মীয়া খুব ভক্তিমতী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করতেন। একদিন এসে তিনি খুব কাতরভাবে জানালেন, ভগবানের ধ্যান করতে বসে তিনি কিছুতেই মনকে বাঁধতে পারেন না। সংসারের নানা চিন্তা। এর কথা, তার মুখ মনে এসে অশান্তি ঘনিয়ে তোলে।

একান্ত বেদনার ঝোঁকে কথাটা বলে ফেলে মহিলাটির হুঁশ হল, কাজটা

ভাল করেন নি। এবার হয়ত গুরু তাঁকে দুর্বল মন বলে ঠাট্টা করবেন, সংসারের সঙ্গে সব বাঁধন কঠোরভাবে ছিঁড়ে আনবার জন্য উপদেশ দেবেন। পরমহংস কিন্তু ঠিক তার বিপরীত করলেন। তিনি মানুষের ব্যথার ব্যথী ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কার মুখ মনে পড়ে গা? সংসারে কাকে ভালবাস বল দেখি?

সলজ্জ কণ্ঠে মহিলা উত্তর দিলেন, ছোট ভাইপোকে।

—বেশ ত। তার জন্যে যা কিছু করবে, তাকে খাওয়ানো, পরানো সব গোপাল ভেবে করো। যেন গোপালরূপী ভগবান তার মধ্যে রয়েছেন, তুমি তাঁকেই খাওয়াচ্ছ, পরাচ্ছ সেবা করছ—এই রকম ভাব নিয়ে করো। মানুষের করছি ভেব না। যেমন ভাব তেমনি লাভ।

কিছুদিন এইভাবে চেষ্টা করার পর মেয়েটি সাধন জীবনে বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিলেন।

সংসারে থাকলেই দুঃখ আছে, শোক আছে। তাদের এড়িয়ে যাওয়া কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। নির্লিপ্ততার সাধনা করতে গিয়ে দুঃখশোকের প্রতি ভক্তেরা কি অন্ধ হয়ে থাকবে,—জোর করে কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেবার মিথ্যা চেষ্টা করবে? শ্রীরামকৃষ্ণ "শুকনো সন্ন্যাসী" ছিলেন না। তিনি ভক্তদের দুঃখশোককে না দেখার ভানও করতেন না, মায়া বলে উড়িয়ে দিতেও চাইতেন না।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে আনন্দ করছেন এমন সময় মণি-মোহন রুক্ষবেশে কলকাতা থেকে এসে সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে পরমহংস জিজ্ঞাসা করলেন, কিগো, আজ এমন শুকনো দেখছি কেন?

—আজ আমার ছেলে মারা গেছে। শোককাতর পিতার বুকফাটা আর্তনাদ অল্প কয়টি কথার মধ্যে প্রকাশিত হল। তা শুনে ঘরের সকলে বেদনায় নীরব হয়ে গেলেন। সমবেত অনেকেই জীবনে দুঃখের মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন। প্রিয় হতেও প্রিয় এমন জনের মৃত্যুতে কারুর কারুর জীবন শোকার্ত ছিল। আজ তাঁদের মনের কোণে চেপে-রাখা, পুরানো শোকের উৎস নতুন করে হাহাকার করে উঠল। শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্দেশ করে তাঁদের মনে প্রশ্ন উঠল, যাদুকর তোমার থলির মধ্যে কি মায়াকাঠি আছে এবার দেখাও দেখি। অন্য দিন তোমার উপদেশ আমরা অনেক শুনেছি আজ আমাদের দুঃখের দিনে তুমি সান্ত্বনা দাও। এ মায়াময় সংসারে দুঃখ কিছু নয়, শোক কিছু

নয়, দারিদ্র্যের জ্বালা কিছু নয়,—চরম সত্য হিসাবে তা হয়ত ঠিক কিন্তু বাস্তব জীবনের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ আমাদের হৃদয় আজ কিছুতেই ঐ আশ্বাসে শান্ত হবে না। তুমি কি আমাদের জ্বালা সত্যি বোঝ? আমাদের মত এমন করে তুমি কি কোন দিন কেঁদেছ? বুকফাটা চোখের জলে ভেজা কোন নিশীথ রাত কি তোমার জীবনে কখন এসেছিল?

দক্ষিণেশ্বরের যাদুকর কিন্তু মণিমোহনের মুখে তাঁর সন্তাপের কথা শুনে কিছুই বললেন না। মণিমোহন ছেলের শ্মশান থেকে সোজা কালীবাড়িতে গেছলেন তাঁর দুঃসহ জ্বালার সান্ত্বনা পাবেন আশা করে। তিনি এক কোণে বসে করুণ কণ্ঠে ছেলের কথা সকলকে বলতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ উদাসীন,—যেন সংসারীর শোকদুঃখের স্পর্শ নির্লিপ্ত বৈদান্তিকের মনে কোন সাড়া জাগাতে পারে না। তাঁর সেই ভাব দেখে কেউ কেউ ভাবতে লাগলেন, ইনি কি কঠোর! তাঁদের মনে অভিমান গর্জে উঠল, না, না, তুমি পাষাণ দেবতা, তুমি আমাদের কেউ নও। তুমি নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত সন্ন্যাসী, আমাদের ব্যথার দিনের দরদী সঙ্গী তুমি নও। ওগো অকরুণ, তোমার হৃদয় আকাশে শুধুই কি আছে চরম সত্যের প্রখর দীপ্তি? তাতে কি বুকফাটা বেদনার তৃষ্ণা মেটাবার মত জলভরা মেঘ নেই?

এমন সময়ে সহসা শ্রীরামকৃষ্ণ আধাচৈতন্য অবস্থায় তাল ঠুকে দাঁড়িয়ে উঠলেন, তারপর মণিমোহনের দিকে চেয়ে সিংহনাদে গেয়ে উঠলেন,

"জীব সাজ সমরে।
ঐ দেখ রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
আরোহণ করি মহাপুণ্য রথে
ভজন সাধন দুটো অশ্ব জুড়ে তাতে
দিয়ে জ্ঞান ধনুকে টান
ভক্তি ব্রহ্মবাণ
সংযোগ কর রে।"

অপূর্ব অঙ্গভঙ্গী, কণ্ঠে মহাবীর যোদ্ধার তেজ, মুখে দুর্জয় সঙ্কল্পের দীপ্তি। দেখতে দেখতে দিব্য পুরুষের ভাবতরঙ্গে সকলেরই মন শোকমোহের অতীত রাজ্যে উঠে গেল। মণিমোহন চুপচাপ, শান্ত; তাঁর মুখ থেকে শোকের রেখাগুলি কখন অজান্তে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এইভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল, ধীরে ধীরে পরমহংসের সমাধি ভাঙল। তারপর তিনি বলতে লাগলেন, আহা,

পুত্রশোকের মত আর জ্বালা কি আছে? খোলটা থেকে—দেহ থেকে বেরোয় কি না। খোলটার সঙ্গে সম্বন্ধ, যতদিন খোলটা থাকে ততদিন থাকে।

করুণাময় শ্রীরামকৃষ্ণ দূর থেকে উপদেশ দিতে ভালবাসতেন না। তিনি নিজের উচ্চ অবস্থাকে শ্রোতাদের কাছে টেনে নিয়ে আসতেন,—ভক্তদের কাছের মানুষ হয়ে আলোচনা করতে ভালবাসতেন। তাই শোকার্ত মণি-মোহনের কাছে একেবারে নিজের জীবনের শোকের গল্প শুরু করলেন। ভাইপো অক্ষয়ের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে বলতে লাগলেন, অক্ষয় মল। তখন কিছু হল না। কেমন করে মানুষ মরে বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। দেখলুম যেন খাপের ভেতর তলোয়ারখানা ছিল। সেটাকে খাপ থেকে বার করে নিলে। তলোয়ারের কিছু হল না, যেমন তেমনি থাকল, খাপটা পড়ে রইল। দেখে খুব আনন্দ হল। খুব হাসলুম, গান করলুম, নাচলুম। তার শরীরটাকে ত পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে এল। তার পরদিন কালীবাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে আছি আর দেখছি কি যেন প্রাণের ভিতরটায় গামছা নেঙরাবার মত কে নেঙরাচ্ছে। অক্ষয়ের জন্যে প্রাণটা এমনি করছে। ভাবলুম, মা এখানে পরার কাপড়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ নেই, তা ভাইপোর সঙ্গে ত কত সম্বন্ধ ছিল! এখানেই (শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই) যখন এ রকম হচ্ছে তখন গৃহীদের শোকে কত না কষ্ট হয়! তবে কি জান?

আপন অন্তরের শক্তির জোরেই মানুষকে শোকবেদনার পারে যেতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ এবার ইঙ্গিতে সেই প্রসঙ্গ শুরু করলেন : যারা ভগবানকে ধরে থাকে তারা এই বিষম শোকেও একেবারে তলিয়ে যায় না। একটু নাড়াচাড়া খেয়েই সামলে যায়। চুনোপুঁটির মত আধারগুলো একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে বা তলিয়ে যায়। দেখনি, গঙ্গায় স্টিমারগুলো গেলে জেলে ডিঙিগুলো কেমন করে? মনে হয় যেন একেবারে গেল আর সামলাতে পারলে না। কোনখানা বা উলটেই গেল। আর বড় বড় হাজারমুনে কিস্তিগুলো দুচার বার টাল মাটাল হয়েই আবার যেমন তেমনি স্থির। দুচারবার নাড়াচাড়া কিন্তু খেতেই হবে!

শ্রীরামকৃষ্ণ ক্রমশঃ তত্ত্বের পথে তাঁর বক্তব্যকে টেনে আনলেন। সংসার অনিত্য এ কথা মানুষকে ভুললে চলবে না। তিনি বলতে লাগলেন, কয় দিনের জন্যই বা সংসারের এ সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ। মানুষ সুখের আশায় সংসার করতে যায়—বিয়ে করলে, ছেলে হল, সেই ছেলে আবার বড় হল, তার বিয়ে দিলে। দিন কতক বেশ চলল। তারপর এটার অসুখ, ওটা মল, এটা বয়ে গেল।

ভাবনায় চিন্তায় একেবারে ব্যতিব্যস্ত। যত রস মরে তত একেবারে দশ ডাক ছাড়তে থাকে। দেখনি ভিয়নের উনুনে কাঁচা সুঁদরী কাঠের চেলাগুলো, প্রথমটা বেশ জ্বলে। তারপর কাঠখানা যত পুড়ে আসে কাঠের সব রসটা পিছন দিক দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে গাঁজলার মত হয়ে ফুটতে থাকে আর চুঁ চাঁ ফুসফাস এমনি নানা শব্দ হতে থাকে। সংসারীর অবস্থাও সেই সকম।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মানুষের সন্তাপহরণের শ্রেষ্ঠ জাদুকর। তাঁর কাছে কাতর মানুষ সান্ত্বনালাভের আশায় এসে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরত না। সেদিন মণিমোহনেরও আসা বিফল হল না। শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়ের সুধা স্পর্শে তাঁর মনের সকল জ্বালা দূর হল। চিরদিন দুঃখের বেদনা দিয়েই মানুষ চিনে নেয় তার ধ্যানের ধনকে। চোখের জলেই ভেসে ওঠে জীবনের নব নব রূপ। "সব আশাজাল যায়রে যখন উড়েপুড়ে, আশার অতীত দাঁড়ায় তখন ভুবন জুড়ে।" যাবার সময় নব বলে বুক বেঁধে মণিমোহন শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেন, এই জন্যই ত আপনার কাছে ছুটে এলুম। জানতুম এ জ্বালা আর কেউ শান্ত করতে পারবে না।

নব বাংলার লোকগুরুর হৃদয়ে ছিল মানুষের প্রতি অপরিমেয় করুণা। তাই দলে দলে মানুষ তাঁকে সংসারসাগরে আপন কাণ্ডারী বলে মনে করতেন। যাঁরা পৃথিবীতে আর কারুকে হৃদয় দিতে পারেন নি তাঁরাই তাঁকে একান্ত ভালবাসায় প্রিয়তমের আসন দিয়ে নিজেদের ধন্য জ্ঞান করেছিলেন।

বিখ্যাত নাট্যলেখক গিরিশচন্দ্রের নাম তখন সারা দেশময়। যেমন সুন্দর নাটক লেখেন তেমনি চমৎকার অভিনয় করেন। নিতান্ত ঔৎসুক্যের বশে পরমহংসকে কয়েকবার দেখতে আসেন। তাঁর জীবন নিষ্কলুষ ছিল না,—তিনি খুব মদ খেতেন, নানা বিশৃঙ্খলার মধ্যে তাঁর বহুদিন কেটেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিকটায় কয়েকবার রাগারাগি ও কটু কথার আদান প্রদান হয়। কিন্তু তাঁর হৃদয়ে ছিল জীবনকে পাবার তীব্র অভীপ্সা। একদিন শান্ত হয়ে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন থেকে আমি কি করব ?

মহামানুষ বললেন, যা করছ তাই করে যাও। এখন এদিক ওদিক—ভগবান ও সংসার দুদিক রেখে চল। তারপর যখন একদিক ভাঙবে তখন যা হয় হবে। তবে সকাল বিকালে তাঁর স্মরণ মননটা রেখ।

কোন বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে বদ্ধ হওয়া গিরিশের চরিত্রে ছিল না। একে

সকল দিক থেকে তাঁর জীবন ছিল বিশৃঙ্খল, তার উপর থিয়েটারের কাজের জন্য তাঁর নাওয়াখাওয়ার কোন নিয়মিত সময় ছিল না। সে কথা ভেবে গিরিশ জানালেন শ্রীরামকৃষ্ণের এই নির্দেশ পালন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তা শুনে তিনি বললেন, আচ্ছা তা যদি না পার ত শুধু খাবার শোবার আগে তাঁকে একবার স্মরণ করে নিও।

তাও গিরিশের পক্ষে দুঃসাধ্য। তিনি চুপ করে আছেন। পরমহংসের তখন আধাঅচেতন অবস্থা। তিনি তা দেখে বললেন, তুই বলবি তাও যদি না পারি? আচ্ছা, তাহলে আমাকে বকলমা দে।

আনন্দে গিরিশের মন নেচে উঠল। তাঁর আত্মসমর্পণের চরম পুরস্কার আজ তিনি পেলেন। পরম কারুণিক আজ থেকে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের সব ভার নিলেন। আর সাধন ভজন করে বা স্বচেষ্টায় তাঁকে নিজের উদ্ধার সাধন করতে হবে না। গিরিশ এর পর থেকে নিজের সব দুশ্চিন্তা ত্যাগ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে নিঃশেষে নিজেকে উৎসর্গ করলেন। সেদিন থেকে তাঁর অশান্ত হৃদয়ে এক অপূর্ব নিশ্চিন্ততা ফুটে উঠেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সম্পূর্ণ ভার নিয়েছেন তবে আর সংসারে ভাবনা কিসের—এই ভাব।

ক্রমে তাঁর জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন আসে।। তাঁর চিন্তা, চালচলন, প্রতিদিনের কাজকর্ম শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফূরণ হয়। শেষ জীবনে তিনি অনেক শোকতাপ পান। উপরি উপরি দুই মেয়ে ও স্ত্রী মারা যান। স্টার থিয়েটারের মোটা মাইনের চাকরিও ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু গুরুকে স্মরণ করে তিনি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে জীবনের সব ঝড়ঝঞ্ঝা সহ্য করেছিলেন। মৃত্যুর মুহূর্তে তাঁর মুখ থেকে শরণাগতের শেষ কামনা বেরিয়ে আসে, শান্তি দিও,—তোমার চরণে আশ্রয় দিও, ভগবান রামকৃষ্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-নবজীবন আন্দোলনের ঢেউ অনেক গৃহী ভক্তের জীবনকে ভেঙেচুরে নতুন মূর্তি দান করেছিল। শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব কৃতী ছাত্র ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় ও বি-এ পরীক্ষায় তৃতীয় হন। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী নিকুঞ্জ দেবী ছিলেন কেশবচন্দ্রের আত্মীয়া। কর্মজীবনে প্রথমে তিনি কয়েকটি বিদ্যালয়ের পর পর প্রধান শিক্ষক ছিলেন, পরে মেট্রপলিটন কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। মহেন্দ্র পাশ্চত্য দর্শনশাস্ত্রের সাহায্যে জীবনকে বোঝার চেষ্টা করতেন। প্রথম সাক্ষাতেই শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব ভাবের কথামৃত শুনে মজলেন। পরে তাঁর জীবনের গতি সম্পূর্ণ বদলে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে নিজেকে দান করলেন। তাঁর জীবন নির্লিপ্ত গৃহস্থের অপরূপ জীবন। তাঁর সংস্রবের ফলে অনেক তরুণ ছাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর সব চেয়ে বড় কীর্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থাবলী। নিজের জীবনে তিনি গুরুর ভাবধারা ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তা না হলে এমন নিবিড়ভাবে গুরুর কথামৃত লিপিবদ্ধ করতে পারতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা প্রচারের দিক থেকে সর্বত্যাগী, সন্ন্যাসী ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর আসন সমান। জীবনে তিনি অন্য কোন বই লিখতে পারেন নি, তাই তাঁর মৌলিক লেখার বিশেষ শক্তি ছিল বলে মনে হয় না। তিনি যেন বিধাতার কাছ থেকে এই গুরুদায়িত্বের ভার নিয়ে জন্মেছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য ঐশ্বর্যের সাহিত্যভাণ্ডারী। তাঁর তিরোধানের পর সেই ঐশ্বর্য গ্রন্থ আকারে বিশ্বমানুষকে দান করে গেছেন। যুগে যুগে সন্ধানী মানুষ তা থেকে অমর জীবনের উদ্দীপনা লাভ করবে।

গৃহী অন্তরঙ্গেরা ছাড়া কত সহস্র সন্ধানী গৃহস্থ দক্ষিণেশ্বরে তাঁর আনন্দহাটে আসত জীবনের স্পর্শমণি সওদা করার উদ্দেশ্যে। তাঁদের কারুকে তিনি অবহেলা করতেন না। যাঁর মধ্যে সামান্যমাত্র অগ্নিশিখার সম্ভাবনা দেখতে পেতেন নিজের জীবনমহাপ্রদীপ থেকে তাঁর অন্তরে শিখা জ্বালাবার চেষ্টা করতেন। একান্ত করুণায় সকলকেই শোনাতেন তাঁর অমিয়বাণী। যেখানেই উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পেতেন, প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ নানাভাবে তাঁকে দিতেন অভয়। কেউ হয়ত সংসারের নানা বাঁধনের মধ্যে পড়ে আছেন—তা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় নেই অথচ প্রাণে তাঁর তীব্র বৈরাগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে শোনাতেন, ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন। দুই বন্ধু বেড়াতে বেড়াতে দেখতে পেলে এক জায়গায় ভাগবত পাঠ হচ্ছে। একজন বললে, চল ভাই, খানিকক্ষণ ঐখানে বসে ভাগবত শুনিগে। তার বন্ধু বললে, না ভাই ভাগবত শুনে কি হবে? চল ততক্ষণ বেশ্যা বাড়ি গিয়ে আমোদ করিগে। লোকটি তাতে রাজী হল না। সে গিয়ে ভাগবত শুনতে লাগল। আর তার বন্ধু গেল

বেশ্যা বাড়ি। কিন্তু সেখানে তার আমোদ করা হল না। সে কেবলই ভাবতে লাগল, হায়, হায়, আমি কেন এখানে এলুম! না জানি বন্ধু এতক্ষণ সেখানে বসে কত ভাগবত শুনছে। এদিকে লোকটি কিন্তু ভাগবত শুনতে বসে কেবলই ভাবতে লাগল, হায়, হায়, আমি কেন বন্ধুর সঙ্গে গেলুম না! ও এতক্ষণ বেশ্যা বাড়িতে কত না আমোদ করছে। যার যেমন ভাব তেমনি লাভ। যে ভাগবত শুনছিল তার বেশ্যালয়ে যাওয়ার ফল হল। আর বন্ধুটির বেশ্যা বাড়ি গিয়েও ভাগবত শোনার পুণ্যি হল। যে অবস্থার মধ্যেই মানুষ থাকুক তাতে এসে যায় না যদি ভগবানের জন্য যথার্থ ব্যাকুলতা থাকে। এই ধরণের আর একটি গল্পে তিনি তাঁর বক্তব্য স্পষ্টতর করে তুলতেন: এক শিবমন্দিরের পাশে একজন সাধু থাকত। মন্দিরের সামনেই একটি বেশ্যার ঘর ছিল। সেখানে দিনরাত লোক আসে। তা দেখে সাধুর মনে কষ্ট হল। সে একদিন বেশ্যাটিকে ডেকে বলে দিলে। বললে, দেখ্, তুই ভারি পাপী, দিনরাত পাপ করছিস, তোর কি দশা হবে? তা শুনে বেশ্যার মনে অনুতাপ হল, সে মনে মনে ব্যাকুল হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালে। সেদিন থেকে যখনই সে পেটের দায়ে লোক বসাত তারপরে কাতর হয়ে ভগবানের কাছে ক্ষমা চাইত। এদিকে সন্ন্যাসী বেশ্যার বাড়িতে যতবার লোক আসে ততবার একটি করে ঢিল ফেলে রাখে। পরে যখন অনেক ঢিল জমল তখন মাগীকে দেখতে পেয়ে বললে, দেখ্ দেখি, এই কদিনে তুই কত রাশি রাশি পাপ করেছিস, এখনও সাবধান হ। কিছুদিন পরে ঐ বেশ্যা আর সাধুর একই দিনে মৃত্যু হল। যমদূত এসে ধরলে সন্ন্যাসীকে আর বিষ্ণুদূত এসে ধরলে বেশ্যাটিকে। তা দেখে সাধু ব্যস্ত হয়ে বললে, ওগো তোমাদের ভুল হয়েছে। বিষ্ণুদূত আমার জন্য এসেছে আর যমদূত নিশ্চয়ই ঐ মাগীকে নিয়ে যেতে এসেছে। যমদূত জবাব দিলে, না আমাদের ভুল হয় নাই, ঠিকই হয়েছে। সাধু তখন রেগে বললে, কি? আমি আজীবন ভগবানের নাম করলুম আর ও মাগী বেশ্যাগিরি করলে। ওকে কিনা বিষ্ণুদূতে নিয়ে যাবে! যমদূত বললে, ও আজীবন বেশ্যাগিরি করে নাই, করেছ তুমি। আর তুমি ভগবানের নাম কর নাই, করেছে ঐ বেশ্যা।

মনে এখনও বৈরাগ্যের সম্ভাবনা দেখা যায় নি—এমন বিষয়ী লোক দেখলে তার চৈতন্য উদয়ের উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, সংসারাসক্ত বদ্ধ জীবের হুঁশ নাই। তারা জলে পড়েই আছে। অথচ জালে যে আটকে আছে সে বোধ

নাই। হরিকথা এদের সামনে হলে এরা উঠে চলে যায়। বলে, হরিনাম মরবার সময় হবে, এখন কেন? পরিবার ও ছেলেমেয়েদের মনে করে কাঁদে আর বলে, হায়, আমি মলে এদের কি হবে? যাতে এত দুঃখ ভোগ করে আবার তাতেই মত্ত হয়। কাঁটাঘাস খেতে খেতে উটের মুখ দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ে তবু কাঁটাঘাস ছাড়ে না। এদিকে ছেলে মারা গেছে, শোকে কাতর, তবু আবার বছর বছর ছেলে হয়। * * * একটা ছাগলের পালে বাঘ পড়েছিল। লাফ দিতে গিয়ে তার প্রসব হয়ে ছানা হয়ে গেল। বাঘটা মরে গেল। কিন্তু ছানাটা ছাগলদের সঙ্গে মানুষ হতে লাগল। তারাও ঘাস খায়, বাঘের ছানাও ঘাস খায়। তারাও ভ্যা ভ্যা করে, বাঘের ছানাও ভ্যা ভ্যা করে। ক্রমে ছানাটা খুব বড় হল। একদিন ঐ ছাগলের পালে আর একটা বড় বাঘ এসে পড়ল। সে ঘাসখেকো বাঘটাকে দেখে অবাক্। তখন দৌড়ে এসে তাকে ধরলে। সেটাও ভ্যা ভ্যা করতে লাগল। তাকে টেনে হিঁচড়ে জলের কাছে নিয়ে গেল, বললে, দেখ্ জলের ভিতর তোর মুখ দেখ্ আমিও যা তুইও তা। সে কিন্তু কোন মতে শুনলে না, কেবলই ভ্যা ভ্যা করতে থাকে।

হৃদয়ে হৃদয়ে দিব্য জীবন জাগাবার মহাব্রতে নেমে পরমহংস লোক আসার প্রতীক্ষায় বসে থাকতে পারতেন না। তিনি ব্রাহ্মদের সঙ্গে মেলামেশা করে বুঝতে পেরেছিলেন নব বাংলার ইংরেজী শিক্ষার পরিমণ্ডলে লালিত সে যুগের বাঙালীর ভিতরে মহাজীবনে দীক্ষা নেবার বাধা কোথায়। প্রাচীন ভারতের নির্দিষ্ট পথের সম্বন্ধে দৃষ্টি তাদের এমনই টেরা হয়ে গেছে যে তৃষ্ণার্ত মন ফেটে মরলেও সে পথে সত্যসন্ধানে স্বইচ্ছায় তাঁরা নামতে পারবেন না। তাই বাঙলার সে যুগের প্রতিভাবান্ কর্মবীর ও চিন্তাপরিচালকেরা দক্ষিণেশ্বরে আসবেন বলে বসে না থেকে তিনি নিজেই কলকাতায় তাঁদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের আগে এমন নিঃস্বার্থ মানুষপ্রীতির অপূর্ব দৃষ্টান্ত আর নেই। প্রতিদানে কিছু চাওয়ার লেশমাত্র নেই—নাম নয়, টাকাকড়ি নয়, গুরুপদের মর্যাদা নয়। সে যুগের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আচার্যদের কর্মব্রতের মধ্যে অন্ততঃ এই সূক্ষ্ম স্বার্থ ছিল যে তাঁরা নিজেকে কেন্দ্র করে কোন না কোন প্রতিষ্ঠান গড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সেই দলগড়ার চেষ্টা পর্যন্ত ছিল না। ভক্তির অনুপ্রেরণায় কেশবচন্দ্র পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে তাঁর নাম প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন, তিনি তা কোনদিন অনুমোদন করেন নি। তিনি কেশবচন্দ্রকে বলতেন,

আমার নাম কাগজে প্রকাশ কর কেন? বই লিখে—খবরের কাগজে লিখে কারুকে বড় করা যায় না। ভগবান যাকে বড় করেন বনে থাকলেও তাকে সকলে জানতে পারে। গভীর বনে ফুল ফুটেছে, মৌমাছি কিন্তু সন্ধান করে যায়। অন্য মাছি সন্ধান পায় না। মানুষ কি করবে? মানুষের মুখ চেয়ো না, লোক না পোক! যে মুখে আজ ভাল বলছে সেই মুখে আবার মন্দ বলবে। আমি মান্যগণ্য হতে চাই না। যেন দীনের দীন, হীনের হীন হয়ে থাকি।

প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে কেউ তাঁকে গুরু বলে প্রকাশ করলে তিনি বিশেষ বিরক্ত হতেন। গিরিশচন্দ্র নিজের পরিবর্তনে অবাক্ হয়ে কৃতজ্ঞ অন্তরে একদিন বলেছিলেন, আপনার কৃপা হলেই সব হয়। আমি কি ছিলাম, কি হয়েছি!

ঝটিতি উত্তর এল, ওগো, তোমার সংস্কার ছিল তাই হচ্ছে। সময় না হলে হয় না। যখন রোগ ভাল হয়ে এল তখন কবিরাজ বললে, এই পাতাটি মরিচ দিয়ে বেটে খেও। তারপর রোগ ভাল হল। তা মরিচ দিয়ে ওষুধ খেয়ে ভাল হল, না আপনি ভাল হল কে বলবে। * * * কে বলবে! * * * সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে। এখানে যদি তোমার চৈতন্য হয়, আমাকে জানবে হেতুমাত্র। চাঁদামামা সকলের মামা। ভগবানের ইচ্ছায় সব হচ্ছে।

সেই অলৌকিক মানুষটির মনে তিলমাত্র লৌকিক সম্মানলাভের চেষ্টা অথবা আত্মাভিমান ছিল না। শুধু আধ্যাত্মিক জগতে নয়, ব্যবহারিক জগতের ক্ষেত্রেও তিনি যথার্থই সকল চাওয়ার উপরে উঠেছিলেন। তিনি নিজেকে কেন্দ্র করে কোন সম্প্রদায় গড়া বা দলগত মতবাদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করতেন না। সচ্চিদানন্দই সকলের সাধারণ গুরু। সেই পরম যন্ত্রীর যন্ত্রহিসাবে তিনি যে অমৃত বিলোবার কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন তার মধ্যে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব একেবারে মুছে দিয়েছিলেন। তাই তাঁর ব্যবহারে কোনদিন দেশের কোন গণ্যমান্য লোক আঘাত পান নি। বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি ভর্ৎসনা করেছেন, বিদ্যাসাগরকে জীবনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছেন, কেশবচন্দ্রের মতধারার বিরুদ্ধে কতবার কত কথাই তাঁকে না বলতে হয়েছে। কিন্তু এঁদের কারুর মুখ থেকে কেউ কোনদিন শ্রীরামকৃষ্ণের গুরুগিরি বা অহঙ্কারের বিরুদ্ধে একটি কথাও শুনতে পায় নি। দাতার অভিমান তাঁর মধ্যে কণামাত্র ছিল না।

নিজের মধ্যে কিছুমাত্র স্বার্থচিন্তা ছিল না বলেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে সকলে আসবে এই আশায় বসে থাকেন নি, অম্লানচিত্তে অনাহুতভাবে সে যুগের

সমাজপ্রধানদের ঘরে ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। পর্বতের মধ্যে অন্ধকার গুহাগুলি থেকে যদি সূর্যালোকের ডাক না আসে সূর্য কি তবু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারেন! যেখানে যতটুকু পথ পান তার ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে তিনি আপন প্রেমের অভয় বাণী পৌঁছে দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনিভাবেই বারে বারে মানুষের হৃদয়ের দ্বারে গিয়ে সাড়া জাগাবার চেষ্টা করেছেন। সেই সব কাহিনী পড়তে পড়তে কল্পনায় ভেসে ওঠে এক অপূর্ব মূর্তি। গহন অন্ধকারে মহাশ্মশানের মধ্য দিয়ে দীপ্তিমান সোনার প্রদীপটি মাথায় নিয়ে নিঃসঙ্গ পথে তিনি যেন একাকী চলেছেন, মুখে করুণায় ভরা গদগদ আহ্বান, তোমরা যে যেথায় আছ এস, নিজেদের ভুলে ঘুমিয়ে থেক না, সময় থাকতে থাকতে আমার মাথার উপরকার সোনার দীপটি থেকে তোমাদের দীপগুলি জেলে নাও। তোমাদের জয় হোক্।

সাঁঝের সংসারে দীপ জ্বালাবার মহাব্রতে নেমে শ্রীচৈতন্য দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সময়ে কলকাতার মত কোন মহানগর ছিল না যেখানে রাজসরকারের কেন্দ্রভূমি ও ব্যবসাবাণিজ্য এবং সংস্কৃতির পীঠস্থান এক সঙ্গে গড়ে উঠেছিল। এদিক থেকে কলকাতা ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে অতুলনীয় স্থান অধিকার করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝেছিলেন, কলকাতার মহামানুষগুলির মধ্যে নিজেকে দান করতে পারলেই সারা দেশে তা ছড়িয়ে পড়বে। তিনি তাই দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবার প্রেরণা পান নি।

কলকাতায় যে সব মহামানুষদের সঙ্গে তিনি দেখা করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে শুধু সাধারণভাবে দিব্য জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করতেন না। প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর সাধারণ মতগুলির অবতারণা করতেন। এদিক থেকে তাঁর অদ্ভুত শক্তি ছিল বলে মনে হয়। তাঁর এমন আশ্চর্যকর অন্তর্দৃষ্টি ছিল যে মানুষকে দেখে তার কথাবার্তা শুনে এবং চালচলন লক্ষ্য করে অচিরে তিনি তার ব্যক্তিজীবনের মূলভাবটিকে বুঝে নিতে পারতেন। কর্মবীর বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তিনি নিষ্কাম কর্ম প্রসঙ্গের উপর জোর দিয়েছিলেন। জ্ঞানযোগী বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার কালে ভক্তিযোগের প্রসঙ্গই ছিল প্রধান। এ থেকে বুঝতে পারা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের মনের গড়নে বুদ্ধির কত প্রাধান্য ছিল। অনেকের ধারণা, তিনি পাড়াগেঁয়ে, নিরক্ষর মূর্খ ছিলেন। সাধারণ অর্থে হয়ত তিনি তা ছিলেন কিন্তু এ থেকে তাঁর ভিতরের অপরিমেয় সম্পদরাজির অসামান্যতাকে কিছুমাত্র

ক্ষুণ্ণ করা যায় না। সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব, শাস্ত্রজ্ঞান ও ন্যায়যুক্তিতে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরও পূজনীয়।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের গল্পটি বড় চমৎকার। প্রাথমিক শিষ্টাচারের পর তিনি বললেন, আজ সাগরে এসে মিললুম। এতদিন খাল, বিল, হদ্দ নদী দেখেছি। এবার সাগর দেখছি।

বিদ্যাসাগর হাসতে হাসতে জবাব দিলেন। তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।

—নাগো, নোনা জল কেন? তুমি ত অবিদ্যার সাগর নও। তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি ক্ষীর সমুদ্র। *** তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্য যে কর্ম করা যায়, সে রাজসিক কর্ম বটে কিন্তু এ রজোগুণ—সত্ত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নাই। শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্য দয়া রেখেছিলেন,—ঈশ্বর বিষয় শিক্ষা দেবার জন্যে। তুমি বিদ্যাদান, অন্নদান করছ, এও ভাল। নিষ্কাম হয়ে করতে পারলে এতেও ভগবান লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্যে, পুণ্যের জন্যে। তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর সিদ্ধ তুমি ত আছই।

বিদ্যাসাগর অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সিদ্ধ কেমন করে হয়ে আছি?

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে মৃদু মৃদু হাসি, তিনি বলতে লাগলেন, আলু পটল সিদ্ধ হলে ত নরম হয়। তা তুমি ত খুব নরম। তোমার অত দয়া।

—কিন্তু কলাই বাটা সিদ্ধ ত শক্তই হয়।

—তুমি তা নও গো। শুধু পণ্ডিতগুলো দরকোচাপড়া। না এদিক, না ওদিক। শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, তার নজর ভাগাড়ে। যারা শুধু পণ্ডিত, শুনতেই পণ্ডিত। কিন্তু তাদের আসক্তি কামিনীকাঞ্চনে—শকুনির মত পচা মড়া খুঁজছে। আসক্তি অবিদ্যাভরা সংসারে। দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য।

কথাবার্তা ক্রমেই গভীর তত্ত্বের দিকে এগিয়ে চলল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে লাগলেন, এই জগতে বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া দুইই আছে। জ্ঞানভক্তি আছে আবার কামিনীকাঞ্চনও আছে। সৎ আছে, অসৎও আছে। ভালও আছে আবার মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভাল মন্দ জীবের পক্ষে; সৎ অসৎ জীবের পক্ষে। তাঁর ওতে কিছু হয় না। যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ বা ভাগবত পড়ছে আর কেউ বা জাল করছে। প্রদীপ নির্লিপ্ত। *** সূর্য শিষ্টের উপর আলো দিচ্ছে, আবার দুষ্টের উপরও দিচ্ছে। যদি বল দুঃখ, পাপ,

অশান্তি এ সকল তবে কি? তার উত্তর এই যে, ওসব জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। সাপের ভিতর বিষ আছে। অন্যকে কামড়ালে মরে যায়। সাপের কিন্তু কিছু হয় না।

ব্রহ্ম থেকে ব্রহ্ম দর্শনের প্রসঙ্গে আলোচনা গড়িয়ে এল: ব্রহ্মদর্শন হলে মানুষ চুপ হয়ে যায়। যতক্ষণ দর্শন না হয় ততক্ষণই বিচার। ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘির কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন পাকা ঘিয়ে আবার কাঁচা লুচি পড়ে তখন আর একবার ছাঁক কলকল করে। যখন কাঁচা লুচিকে পাকা করে তখন আবার চুপ হয়ে যায়। তেমনি সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দেবার জন্যে আবার নেমে আসে, আবার কথা কয়। যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভনভন করে। ফুলে বসে মধুপান করতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করবার পর মাতাল হয়ে আবার কখন কখন গুন গুন করে। পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় ভর্‌ভর্‌ শব্দ হয়। পূর্ণ হয়ে গেলে আর শব্দ হয় না। * * * ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল। বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে এই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ঋষিরা কত খাটত। সকাল বেলা আশ্রম থেকে চলে যেত। একলা সমস্ত দিন ধ্যানচিন্তা করত, রাত্রে আশ্রমে ফিরে এসে কিছু ফলমূল খেত। দেখা, শোনা, ছোঁয়া—এ সব বিষয় থেকে মনকে আলাদা রাখত। তবে ব্রহ্মকে বোধে বোধ করত। * * * * কলিতে অন্নগত প্রাণ, দেহবুদ্ধি যায় না। এ অবস্থায় 'সোঽহং' বলা ভাল নয়। সবই করা যাচ্ছে আবার 'আমি ব্রহ্ম' বলা ঠিক নয়। যারা বিষয় ত্যাগ করতে পারে না,—যাদের 'আমি' কোন মতে যাচ্ছে না, তাদের 'আমি দাস' 'আমি ভক্ত' এ অভিমান ভাল। ভক্তিপথে থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়। * * * * জ্ঞানযোগও সত্য, ভক্তিপথও সত্য। সব পথ দিয়েই তাঁর কাছে যাওয়া যায়। তিনি যতক্ষণ আমি রেখে দেন ততক্ষণ ভক্তিপথই সোজা। * * * জ্ঞানী দেখে, ব্রহ্ম অটল, নিষ্ক্রিয়, সুমেরুবৎ। এই জগৎ সংসার তাঁর সত্ত্ব, রজ, তম তিন গুণে হয়েছে। তিনি নির্লিপ্ত। বিজ্ঞানী দেখে, যিনিই ব্রহ্ম তিনিই ভগবান। যিনিই গুণাতীত, তিনিই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান। এই জীবজগৎ, মন, বুদ্ধি, ভক্তি, বৈরাগ্য, জ্ঞান, এ সব তাঁর ঐশ্বর্য। যে বাবুর ঘরদ্বার নাই, হয়ত বিকিয়ে গেল, সে বাবু কিসের বাবু! ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। সে ব্যক্তির যদি ঐশ্বর্য না থাকত তা হলে কে মানত? * * * বিজ্ঞানী কেন ভক্তি লয়ে থাকে? এর উত্তর এই যে, 'আমি' যায় না।

সমাধি অবস্থায় যায় বটে কিন্তু আবার এসে পড়ে। আর সাধারণ জীবের 'অহম্' যায় না। অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও, আবার তার পর দিন ফেকড়ি বেরিয়েছে। * * * * জ্ঞানলাভের পরও আবার কোথা থেকে আমি এসে পড়ে। স্বপ্নে বাঘ দেখেছিলে। তারপর জাগলে, তবুও তোমার বুক দুড় দুড় করছে। জীবের 'আমি' লয়েই ত যত যন্ত্রণা। গরু হাম্বা হাম্বা (আমি আমি) করে, তাইত অত যন্ত্রণা। লাঙ্গল জোড়ে, রোদ বৃষ্টি গায়ের উপর দিয়ে যায়, আবার কশাইয়ে কাটে। চামড়ায় জুতো হয়, ঢোল হয়। তখন খুব পেটে। তবুও নিস্তার নাই। শেষে নাড়িভুঁড়ি থেকে তাঁত তৈয়ার হয়। সেই তাঁতে ধুনুরির যন্ত্র হয়। তখন আর 'আমি' বলে না, তখন বলে তুঁহু, তুঁহু (তুমি, তুমি)। যখন তুমি তুমি বলে তখন নিস্তার। হে ভগবান, আমি দাস, তুমি প্রভু। আমি ছেলে, তুমি মা। রাম জিজ্ঞাসা করলেন, হনুমান, তুমি আমাকে কি ভাবে দেখ ? হনুমান বললে, রাম, যখন 'আমি' বলে বোধ থাকে তখন দেখি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ ; তুমি প্রভু, আমি দাস। আর যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি। * * * * সেব্য সেবক ভাবই ভাল। 'আমি' ত যাবার নয়। তবে থাক্ শালা 'দাস আমি' হয়ে। * * * * তাঁকে কি বিচার করে পাওয়া যায়! তাঁর দাস হয়ে —তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁকে ডাক। বিশ্বাস আর ভক্তি। তাঁকে ভক্তিতে সহজে পাওয়া যায়। তিনি ভাবের বিষয়। 'ভাবে ভক্তি' এর মানে তাঁকে ভালবাসা। চিত্ত তদ্গত হওয়া।

জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগের আলোচনা থেকে শেষে তিনি হাজির হলেন কর্মযোগ প্রসঙ্গে। ঈশ্বরচন্দ্রকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন : পূজো, হোম, যজ্ঞ কিছুই নয়। যদি তাঁর উপর ভালবাসা আসে তাহলে আর এসব কর্মের বেশি দরকার নাই। যতক্ষণ হাওয়া পাওয়া না যায় ততক্ষণ পাখার দরকার। যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি আসে পাখা রেখে দেওয়া যায়। আর পাখার কি দরকার ? তুমি যে সব কর্ম করছ, এ সব সৎকর্ম। যদি 'আমি কর্তা' এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে করতে পার তাহলে খুব ভাল। এই নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালবাসা আসে। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বর লাভ হয়। * * * * কিন্তু যত তাঁর উপর ভক্তি ভালবাসা আসবে ততই তোমার কর্ম কমে যাবে। গৃহস্থের বউ, পেটে যখন ছেলে হয় শাশুড়ী তার কর্ম কমিয়ে দেয়। যতই মাস বাড়ে শাশুড়ী কর্ম কমায়। দশ মাস হলে আদপে কর্ম করতে দেয় না, পাছে ছেলের কোন হানি হয়,—প্রসবের কোন

ব্যাঘাত ঘটে। তুমি যে সব কর্ম করছ, এতে তোমার নিজের উপকার। নিষ্কাম ভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ভগবানের উপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে। জগতের উপকার মানুষ করে না, তিনিই করছেন, যিনি চন্দ্র সূর্য করেছেন, যিনি মা বাপের স্নেহ, মহতের ভিতর দয়া, সাধু ভক্তের ভিতর ভক্তি দিয়েছেন। যে লোক কামনাশূন্য হয়ে কর্ম করবে সে নিজেরই মঙ্গল করবে। * * * অন্তরে সোনা আছে, এখনও খবর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও অন্য কাজ কমে যাবে। গৃহস্থের বউএর ছেলে হলে ছেলেটিকে নিয়ে থাকে, ঐটিকে নিয়েই নাড়াচাড়া। আর সংসারের কাজ শাশুড়ী করতে দেয় না।

ভগবদ্‌প্রেমে এই পাগল মানুষটি সূক্ষ্ম লৌকিকতার সম্বন্ধেও বেশ সচেতন ছিলেন। নিজের মতধারার আলোচনার ফলে পাছে ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মমর্যাদা বোধে কোন আঘাত লাগে সেই ভাবনায় কথাবার্তার শেষে তিনি বড় চমৎকার ইঙ্গিতে ত্রুটি মার্জনা চাইলেন। হাসতে হাসতে বললেন, এসব যা বললুম, বলা বাহুল্য, আপনি সব জানেন। তবে খপর নাই। বরুণের ভাঁড়ারে কত রত্ন আছে, বরুণ রাজার খপর নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র জবাব দিলেন, তা আপনি বলতে পারেন।

—হাঁগো, অনেক বাবু জানে না চাকর বাকরের নাম বা বাড়ির কোথায় কি দামী জিনিস আছে। একটু থেমে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বললেন : একবার বাগান দেখতে যাবেন—রাসমণির বাগান। ভারি চমৎকার জায়গা।

—যাব বই কি। আপনি এলেন আর আমি যাব না!

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, আমার কাছে? ছি ছি।

—সে কি! এমন কথা কেন বললেন আমায় বুঝিয়ে দিন।

—আমরা জেলেডিঙি, খালবিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ। কি জানি সেখানে যেতে গিয়ে চড়ায় পাছে লেগে যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের গল্পও এমনি মধুর। সেদিন ভক্ত শ্রীঅধর সেনের বাড়িতে তিনি গেছলেন। সেখানে এসে হাজির হন বঙ্কিমচন্দ্র। বন্ধুর পরিচয় দেবার উদ্দেশ্যে অধর বললেন, ইনি আপনাকে দেখতে এসেছেন। ভারি পণ্ডিত, অনেক বই টই লিখেছেন। এঁর নাম বঙ্কিমবাবু।

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কথাবার্তা ছিল একটি কলাশিল্প। তাঁর বাইরের

জীবন ভগবদ্‌প্রেমের আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে গেছল। তবু তাঁর বাইরের জীবনের মার্জিত রুচি ও কথা বলার দক্ষতা দেখলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। নাম শোনবামাত্র তিনি মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, বঙ্কিম! তা তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো?

বঙ্কিমের চাকরির জীবন সুখের ছিল না; উপরিতন সাহেব কর্মচারীদের দম্ভ ও দুর্ব্যবহার তিনি সহ্য করতে পারতেন না, শ্রীরামকৃষ্ণের কথার উত্তরে তাই জবাব দিলেন, আর মশাই, সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।

সামান্য দুটি কথা থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর ভগবদ্‌তত্ত্বের আলোচনায় উঠে গেলেন। বলতে লাগলেন, না গো শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন। শ্রীমতীর প্রেমে ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন। কালো কেন জান? যতক্ষণ ঈশ্বর দূরে ততক্ষণ কালো দেখায়। যেমন সমুদ্রের জল দূর থেকে নীলবর্ণ দেখায়। সমুদ্রের জলের কাছে গেলে ও হাতে করে তুলে ধরলে আর কালো থাকে না, তখন খুব পরিষ্কার সাদা। * * * * শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, শ্রীমতী তাঁর শক্তি—আদ্যা-শক্তি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যুগল মূর্তির মানে কি? পুরুষ আর প্রকৃতি অভেদ। তাঁদের ভেদ নাই। একটি বললেই তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বুঝতে হবে। যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি। দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নিকে ভাবা যায় না।

কথাগুলি বলে তিনি একটু চুপ করেছেন সেই অবসরে বঙ্কিম ও অধর শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ইংরেজিতে আলোচনা করতে লাগলেন। তিনি তা দেখে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, কি গো আপনারা ইংরেজিতে কি কথাবার্তা করছ?

অধর জবাব দিলেন, আজ্ঞে, কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যার কথা একটু হচ্ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ যদি বই আকারে তাঁর ভাব ও ধারণাগুলি লিখে যেতেন তাহলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠ লেখকের আসন নিশ্চয়ই লাভ করতেন। তাঁর মধ্যে বেশ উঁচু স্তরের সাহিত্যপ্রতিভা ছিল। তাঁর অসামান্য ভাবসম্পদ ও তত্ত্বগুলির অপূর্ব গভীরতা এবং সর্বস্বীকার্যতার কথা ছেড়ে দিলেও তাঁর তৈরি নতুন নতুন শব্দগুলি এবং ঘরো চলিত কথার মাল-মশলা দিয়ে জোরালো, সুস্পষ্ট প্রকাশরীতি সেই প্রতিভার পরিচয় দেয়। তাঁর প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে ঋজুতার সঙ্গে রাসায়নিক মিলনে একীভূত হয়েছিল সরসতা। কথাকে সোজা করে বলতে গিয়ে কোথাও তিনি শিল্পরসহীন

শব্দের বোঝা সৃষ্টি করে তুলতেন না। তাঁর ভাষা কোথাও মাত্র ভাববাহক হত না—তা সব সময়ে স্বাভাবিক শক্তির স্পর্শে ভাবকে রূপায়িত করে তোলার চেষ্টা করত। বাইবেলএর প্রকাশরীতিও সতেজ সুস্পষ্টতা এবং দৈনন্দিন কথিত ভাষার সাহায্যে গভীর ভাব জাগিয়ে তোলার অসামান্য গুণে অপূর্ব। কিন্তু বাইবেলের প্যারাবল এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের তত্ত্বমূলক উপকাহিনীগুলির তুলনা করলে দেখা যায়, যীশুখ্রীষ্টের গল্পের প্রকাশভঙ্গীতে নীতিমূলক উপদেশকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের গল্পগুলির লক্ষ্য তত্ত্বউপদেশ হলেও তাঁর প্রকাশরীতির মধ্যে শিল্পরস কোথাও গৌণ হয়ে পড়েনি। যীশুখ্রীষ্টের কথাবার্তার মধ্যে কোথাও হাসি নেই। তা যেন আষ্টেপৃষ্ঠে গম্ভীর উপদেশের থলিতে ভরতি। শ্রীরাম-কৃষ্ণ শিল্পপ্রতিভার প্রভাবে কথাবার্তাকে মাঝে মাঝে এমন অসামান্য উইট ও ইঙ্গিতভরা হাসির স্পর্শে সুগভীর এবং চিত্তাকর্ষক করে তুলতেন যে তা দেখে আশ্চর্য না হয়ে থাকা যায় না। তিনি মনের ভাবটিকে কথা দিয়ে মাত্র প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হতেন না,—তিনি কথার সাহায্যে ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলতে চাইতেন। এই শিল্পপ্রতিভা ছিল বলেই কথোপকথনের সময় রসাল প্রত্যুত্তর সম্বন্ধে তাঁকে বাংলাদেশের তখনকার শ্রেষ্ঠ মনীষীরাও এঁটে উঠতে পারতেন না।

বঙ্কিম ও অধরের ইংরেজীতে আলাপ করা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে লাগলেন, একটা কথা মনে পড়ল, তাই আমার হাসি পাচ্ছে। শোন, গল্পটি বলি। একজন নাপিত কামাতে গিয়েছিল। একজন ভদ্রলোককে কামাচ্ছিল। এখন কামাতে কামাতে তার একটু লেগেছিল। আর সে লোকটি 'ড্যাম' বলে উঠেছিল। নাপিত কিন্তু ড্যামের মানে জানে না। তখন ক্ষুরটুর সব সেখানে রেখে জামার আস্তিন গুটিয়ে বললে, তুমি আমায় ড্যাম বললে এর মানে কি এখন বল। সে লোকটি বললে, আরে তুই কামা না। ওর মানে এমন কিছু নয়। তবে একটু সাবধানে কামাস। নাপিত ছাড়বার পাত্র নয়। সে বলতে লাগল, ড্যাম মানে যদি ভাল হয় তাহলে আমি ড্যাম, আমার বাপ ড্যাম, আমার চোদ্দপুরুষ ড্যাম। আর ড্যাম মানে যদি খারাপ হয়, তাহলে তুমি ড্যাম, তোমার বাপ ড্যাম, তোমার চোদ্দপুরুষ ড্যাম। আর শুধু ড্যাম নয়, ড্যাম ড্যাম ড্যাম ড্যা ড্যাম ড্যাম।

গল্প শুনে সমবেত সকলে হাসতে লাগলেন। গুণগ্রাহী বঙ্কিম এর মধ্যেই

শ্রীরামকৃষ্ণের গুণে মুগ্ধ হয়ে গেছেন, বললেন, মশাই, আপনি প্রচার করেন না কেন?

—প্রচার! ওগুলো অভিমানের কথা। মানুষ ত ক্ষুদ্র জীব। প্রচার তিনিই করবেন, যিনি চন্দ্র সূর্য সৃষ্টি করে এই জগৎ প্রকাশ করছেন। প্রচার করা কি সামান্য কথা? তিনি সাক্ষাৎকার হয়ে আদেশ না দিলে প্রচার হয় না। তবে হবে না কেন? আদেশ হয় নি তুমি বকে যাচ্ছ। ঐ দুদিন লোকে শুনবে তারপর ভুলে যাবে। যেমন একটা হুজুক আর কি! যতক্ষণ তুমি বলবে ততক্ষণ লোকে বলবে আহা, ইনি বেশ বলছেন। তুমি থামবে তারপর কোথাও কিছুই নাই। যতক্ষণ দুধের নীচে আগুনের জাল রয়েছে ততক্ষণ দুধটা ফোঁস করে ফুলে ওঠে। জালও টেনে নিলে আর দুধও যেমন তেমন,—কমে গেল। আর সাধন করে নিজের শক্তি বাড়াতে হয়। তা নাহলে প্রচার হয় না। 'আপনি শুতে স্থান পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।' আপনারই শোবার জায়গা নেই, আবার ডাকে, ওরে শঙ্করা আয় আমার কাছে শুবি আয়। ওদেশে হালদার পুকুরের পাড়ে রোজ বাহ্যে করে যেত। লোকে সকালে এসে দেখে গালাগালি দিত। লোকে গালাগালি দেয় তবু বাহ্যে আর বন্ধ হয় না। শেষে পাড়ার লোক দরখাস্ত করে কম্পানীকে জানালে। তারা একটা নোটিশ মেরে দিলে এখানে বাহ্যে প্রস্রাব করো না, করলে শাস্তি পাবে। তখন একেবারে সব বন্ধ। আর কোন গোলযোগ নেই। কম্পানীর হুকুম সকলকে মানতে হবে। তেমনি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়ে যদি আদেশ দেন তবেই প্রচার হয়, লোক শিক্ষে হয়। তা না হলে কে তোমার কথা শুনবে!

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারের বিরুদ্ধে নন, কিন্তু প্রচার করার উদ্দেশ্যে প্রচার করা তাঁর মনোমত নয়। যিনি চেষ্টার দ্বারা নিজের মনকে নিষ্কাম করতে পেরেছেন এবং শিব জ্ঞানে জীবের সেবার উদ্দেশ্যে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় পাওয়া সত্য প্রচার করেন, তাঁর প্রচারে বাধা নেই।

প্রচারের কথার পরে তিনি অন্য প্রসঙ্গে গেলেন, বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা আপনি ত খুব পণ্ডিত আর কত বই লিখেছ। আপনি কি বল, মানুষের কর্তব্য কি? কি সঙ্গে যাবে? পরকাল ত আছে?

—পরকাল! সে আবার কি?

—হ্যাঁ, জ্ঞানের পর আর অন্য লোকে যেতে হয় না। পুনর্জন্ম হয়না। কিন্তু যতক্ষণ না জ্ঞান হয়,—ঈশ্বর লাভ হয়, ততক্ষণ সংসারে ফিরে আসতে

হয়। কোনমতে নিস্তার নেই। ততক্ষণ পরকালও আছে। জ্ঞান লাভ হলে—ঈশ্বর দর্শন হলে মুক্তি হয়ে যায় আর আসতে হয় না। সিধানো ধান পুতলে আর গাছ হয় না। জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ যদি কেউ হয় তাকে নিয়ে আর সৃষ্টির খেলা হয় না। সে আর সংসার করতে পারে না, তার ত কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি নাই। সিধানো ধান আর ক্ষেতে পুতলে কি হবে?

বঙ্কিম হাসতে হাসতে বললেন, তা আগাছাতেও কোন গাছের কাজ হয় না।

—জ্ঞানী তা বলে আগাছা নয়। যে ঈশ্বর দর্শন করেছে সে অমৃত ফললাভ করেছে,—লাউ, কুমড়া ফল নয়। তার পুনর্জন্ম হয় না। পৃথিবী বল, সূর্যলোক বল, চন্দ্রলোক বল,—কোন জায়গায়ই তার আসতে হয় না। উপমা একদেশী। তুমি ত পণ্ডিত, ন্যায় পড় নাই? বাঘের মত ভয়ানক বললে যে বাঘের মত একটা ভয়ানক ল্যাজ কি হাঁড়িমুখ থাকবে তা নয়। আমি কেশব সেনকে ঐ কথা বলেছিলুম। কেশব জিজ্ঞাসা করলে, মশাই, পরকাল কি আছে? আমি না এদিক না ওদিক বললুম। বললুম, কুমোরেরা হাঁড়ি শুকোতে দেয় তার ভিতর পাকা হাঁড়িও আছে, আবার কাঁচা হাঁড়িও আছে। কখন গরুটরু এলে হাঁড়ি মাড়িয়ে যায়। পাকা হাঁড়ি ভেঙে গেলে কুমোর সেগুলোকে ফেলে দেয় কিন্তু কাঁচা হাঁড়ি ভেঙে গেলে সেগুলি কুমোর আবার ঘরে আনে। এনে জল দিয়ে মেখে আবার চাকে দিয়ে নতুন হাঁড়ি করে, ছাড়ে না। তাই কেশবকে বললুম যতক্ষণ কাঁচা থাকবে কুমোর ছাড়বে না। যতক্ষণ জ্ঞানলাভ না হয়, যতক্ষণ কাঁচা থাকবে কুমোর ছাড়বে না। যতক্ষণ জ্ঞানলাভ না হয়,—যতক্ষণ না ঈশ্বর দর্শন হয় ততক্ষণ কুমোর আবার চাকে দিবে। অর্থাৎ ফিরে ফিরে এ সংসারে আসতে হবে, নিস্তার নাই। তাঁকে লাভ করলে তবে কুমোর ছাড়ে। কেন না তখন তার দ্বারা মায়ার সৃষ্টির কোন কাজ আসে না। তখন জ্ঞানী মায়ার পারে গেছে। সে আর মায়ার সংসারে কি করবে? তবে কারুকে কারুকে তিনি রেখে দেন মায়ার সংসারে লোক শিক্ষার জন্য। জ্ঞানী বিদ্যামায়া আশ্রয় করে থাকে। তাঁর কাজের জন্যে তিনিই রেখে দেন, যেমন শুকদেব, শঙ্করাচার্য। আচ্ছা, আপনি কি বল, মানুষের কর্তব্য কি?

বঙ্কিম হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, তা যদি জিজ্ঞাসা করেন, বলব আহার, নিদ্রা, মৈথুন।

—এঃ। তুমি ত বড় ছ্যাঁচড়া। যা রাতদিন কর, তাই তোমার মুখে বেরুচ্ছে। লোকে যা খায় তার ঢেঁকুর ওঠে। মুলো খেলে মুলোর ঢেঁকুর ওঠে। ডাব খেলে ডাবের ঢেঁকুর ওঠে। কামিনীকাঞ্চনের ভিতর রাতদিন রয়েছ আর ঐ কথাই মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। কেবল বিষয় চিন্তা করলে পাটোয়ারি স্বভাব হয়, মানুষ কপট হয়। ঈশ্বর চিন্তা করলে সরল হয়। ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হলে ও কথা কেউ বলবে না। * * * * শুধু পাণ্ডিত্য হলে কি হবে যদি ঈশ্বর চিন্তা না থাকে, যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে? পাণ্ডিত্য কি হবে যদি কামিনীকাঞ্চনে মন থাকে? চিল, শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে। কিন্তু ভাগাড়ের দিকে কেবল নজর। পণ্ডিত অনেক বই শাস্ত্র পড়েছে, শোলক ঝাড়তে পারে কি বই লিখেছে, কিন্তু মেয়েমানুষে আসক্ত, টাকা মান সার বস্তু মনে করেছে—সে আবার পণ্ডিত কি? কেউ কেউ মনে করে, এরা কেবল ভগবান ভগবান করছে, এরা পাগলা, বেহেড হয়ে গেছে। আমরা কেমন স্যায়না, কেমন সুখভোগ করছি—টাকা, মান, ইন্দ্রিয়সুখ। কাকও মনে করে আমি বড় স্যায়না। কিন্তু সকালবেলা উঠেই পরের গু খেয়ে মরে। কাক দেখ না কত উড়ুর ফুড়ুর করে, ভারি স্যায়না।

তারপর বঙ্কিমের দিকে ফিরে তাঁকে কড়া কথা বলার জন্য নরম সুরে বললেন, আপনি কিছু মনে করো না।

—আজ্ঞে মিষ্টি কথা শুনতে আসি নি।

—দেখ, কামিনীকাঞ্চনই সংসার। এরই নাম মায়া। ঈশ্বরকে দেখতে চিন্তা করতে দেয় না। দু-একটি ছেলে হলে স্ত্রীর সঙ্গে ভাই বোনের মত থাকতে হয়, আর তার সঙ্গে সর্বদা ভগবানের কথা কইতে হয়। তাহলে দুজনেরই মন তাঁর দিকে যাবে। আর স্ত্রী ধর্মের সহায় হবে। পশুভাব না গেলে ঈশ্বরের আনন্দ আস্বাদন করতে পারে না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয় যাতে পশুভাব যায়। ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা। তিনি অন্তর্যামী শুনবেনই শুনবেন যদি আন্তরিক হয়। আর কাঞ্চন! আমি পঞ্চবটীর তলায় গঙ্গার ধারে বসে টাকা মাটি মাটি টাকা, মাটিই টাকা টাকাই মাটি বলে জলে ফেলে দিতুম।

একথা শুনে বঙ্কিমের মুখ থেকে বেরিয়ে এল সে যুগের গোষ্ঠীগত প্রশ্ন, বললেন, টাকা মাটি! চারটি পয়সা থাকলে গরিবকে দেওয়া যায়। টাকা যদি মাটি তাহলে দয়া পরোপকার করা হবে না?

উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলে চললেন, দয়া, পরোপকার! তোমার সাধ্য কি যে তুমি পরোপকার কর? মানুষের এত নপর চপর, কিন্তু যখন ঘুমোয়, তখন যদি কেউ দাঁড়িয়ে মুখে মুতে দেয় ত টের পায় না, মুখ ভেসে যায়। তখন অহঙ্কার, অভিমান, দর্প কোথায় যায়? সংসারী লোকের টাকার দরকার আছে, কেননা মাগ ছেলে আছে; তাদের সঞ্চয় করা দরকার, মাগ ছেলেদের খাওয়াতে হবে। সংসারী লোক শুদ্ধ ভক্ত হলে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করে। কর্মের ফল—লাভ, লোকসান, সুখ, দুঃখ ঈশ্বরকে সমর্পণ করে। এর নাম নিষ্কাম কর্ম। সংসারী লোক নিষ্কামভাবে যদি কাউকে দান করে সে নিজের উপকারের জন্যে, 'পরোপকারে'র জন্যে নয়। সর্বভূতে হরি আছেন; এতে তাঁরই সেবা করা হয়। হরিসেবা হলে নিজেরই উপকার হল, পরোপকার নয়। এই সর্বভূতে হরির সেবা—শুধু মানুষের নয়, জীবজন্তুর মধ্যেও হরির সেবা যদি কেউ করে আর যদি সে মান চায় না, যশ চায় না, মরবার পর স্বর্গ চায় না, যাদের সেবা করছে তাদের কাছ থেকে উলটে কোনও উপকার চায় না—এরূপ ভাবে যদি সেবা করে তাহলে তার যথার্থ নিষ্কাম, অনাসক্ত কর্ম করা হয়। এ রকম নিষ্কাম কর্ম করলে তার নিজের কল্যাণ হয়। এরই নাম কর্মযোগ। এই কর্মযোগও ঈশ্বর লাভের একটি পথ। কিন্তু বড় কঠিন কলিযুগের পক্ষে। শম্ভু বলেছিল, আমার ইচ্ছা যে খুব কতকগুলো ডিসপেনসারী, হাসপাতাল করে দিই, তাহলে গরিবদের অনেক উপকার হয়। আমি বললুম, হ্যাঁ, অনাসক্ত হয়ে যদি এ সব কর ত মন্দ নয়। তবে ঈশ্বরের উপর আন্তরিক ভক্তি না থাকলে অনাসক্ত হওয়া বড় কঠিন। আবার অনেক কাজ জড়ালে কোন্ দিক থেকে আসক্তি এসে পড়ে জানতে দেয় না। মনে করছি নিষ্কাম ভাবে করছি কিন্তু হয়ত যশের ইচ্ছা হয়ে গেছে, নাম বার করবার ইচ্ছা হয়ে গেছে। আবার বেশি কর্ম করতে গেলে কর্মের ভিড়ে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। আরও বললুম, শম্ভু, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। যদি ঈশ্বর তোমার সামনে এসে সাক্ষাৎকার হন তাহলে তুমি তাঁকে চাইবে না কতকগুলো ডিসপেনসারী, হাসপাতাল চাইবে? তাঁকে পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। মিছরির পানা পেলে আর চিটে গুড়ের পানা ভাল লাগে না। যারা হাসপাতাল, ডিসপেনসারী করবে আর এতেই আনন্দ করবে, তারাও ভাল লোক। কিন্তু তাদের থাক আলাদা। যে শুদ্ধ ভক্ত সে ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না। বেশি কর্মের ভিতর যদি সে পড়ে, সে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা

করে, হে ভগবান, কৃপা করে আমার কর্ম কমিয়ে দাও। তা না হলে যে মন তোমাতেই নিশিদিন লেগে থাকা উচিত সেই মন বাজে খরচ হয়ে যাবে। ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু—এ বোধ না হলে শুদ্ধ ভক্তি হয় না। এ সংসার অনিত্য, দুদিনের জন্য, আর এ সংসারের যিনি কর্তা তিনিই সত্য—এ বোধ না হলে শুদ্ধ ভক্তি হয় না।

কলিযুগ বলে শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিত করতেন সেকালের পাশ্চাত্য ভাবধারায় লালিত মানুষগোষ্ঠীকে। তাদের যে স্বাভাবিক ভাবধারা এবং যে রকম মনের গড়ন তাতে কর্মযোগও তাদের উপযুক্ত নয়, জ্ঞানযোগও নয়। তাদের যোগ্য পথ ভক্তিযোগ। তাই কর্মযোগের প্রসঙ্গ শেষ করে তিনি এবার ভক্তিযোগের অবতারণা করলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেউ কেউ মনে করে শাস্ত্র না পড়লে—বই না পড়লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। তারা বলে, ঈশ্বরের সৃষ্টি এ সব না বুঝলে ঈশ্বরকে জানা যায় না। তুমি কি বল? আগে সায়েন্স না আগে ঈশ্বর?

বঙ্কিমের উত্তরে সে যুগের গোষ্ঠিগত আদর্শেরই প্রকাশ দেখা যায়। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আগে পাঁচটা জানতে হয় জগতের বিষয়। একটু এদিককার জ্ঞান না হলে ভগবানকে জানব কেমন করে? আগে পড়াশোনা করে জানতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, ঐ তোমাদের এক কথা। আগে ঈশ্বর তারপর সৃষ্টি বা অন্য কথা। তাঁকে লাভ করলে দরকার হয়ত সবই জানতে পারবে। বাল্মীকিকে রামমন্ত্র জপ করতে দেওয়া হল। কিন্তু তাঁকে বলা হল মরা মরা জপ করতে। 'ম' মানে ঈশ্বর আর 'রা' মানে জগৎ। আগে ঈশ্বর তারপর জগৎ। এককে জানলে সব জানা যায়। একের পিঠে যদি পঞ্চাশটা শূন্য থাকে অনেক হয়ে যায়। এককে পুঁছে ফেললে কিছুই থাকে না। একেকে নিয়েই অনেক। এক আগে তারপর অনেক। আগে ঈশ্বর তারপর জীবজগৎ। তোমার দরকার ঈশ্বরকে লাভ করা। তুমি অত জগৎ, সৃষ্টি, সায়েন্স, ফায়েন্স এ সব করছ কেন? তোমার আম খাওয়া দরকার। বাগানে কত শ আম গাছ, কত হাজার ডাল, কত লক্ষ কোটী পাতা,—এ সব খবরে তোমার কাজ কি? তুই আম খেতে এসেছিস আম খেয়েই যা।

কিন্তু আম যে দুর্লভ। তাঁকে লাভ করার পথ যে ক্ষুরের ধারের মত শাণিত, দুর্গম। মানুষ যদি তাঁকে সহজে লাভ করতে পারত তাহলে কে আর আম

ছেড়ে আম গাছের পাতা গুনতে বসত! বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণ মানুষের সেই ব্যথার কথাই তুললেন, বললেন, আম পাই কই যে খাব?

—তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর। আন্তরিক হলে তিনি শুনবেনেই শুনবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, ভক্তি কেমন করে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিযোগ প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন, ব্যাকুলতা। ছেলে যেমন মার জন্যে—মাকে না দেখতে পেয়ে দিশেহারা হয়ে কাঁদে সেই রকম ব্যাকুল হয়ে ভগবানের জন্যে কাঁদলে ভগবানকে লাভ করা পর্যন্ত যায়। * * * তোমায় বলি, উপরে ভাসলে কি হবে? একটু ডুব দাও। গভীর জলের নীচে রত্ন রয়েছে, জলের উপরে হাত পা ছুঁড়লে কি হবে? ঠিক মাণিক ভারি হয়, জলে ভাসে না। তলিয়ে গিয়ে জলের নীচে থাকে। ঠিক মাণিক লাভ করতে গেলে জলের ভিতর ডুব দিতে হয়।

—মশাই, কি করি? পেছনে শোলা বাঁধা আছে। ডুবতে দেয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, তাঁকে স্মরণ করলে সব পাপ কেটে যায়। তাঁর নামেতে কালপাশ কাটে। ডুব দিতে হবে, তানাহলে রত্ন পাওয়া যাবে না। একটা গান শোন, 'ডুব, ডুব, ডুব রূপসাগরে আমার মন। তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেমরত্ন ধন' ইত্যাদি।

গান শেষ হলে তিনি সে যুগের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ভক্ত, জ্ঞানপন্থী, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভয়ের কথা উল্লেখ করে বলতে লাগলেন, কেউ কেউ ডুব দিতে চায় না। তারা বলে ভগবান ভগবান করে বাড়াবাড়ি করে শেষকালে কি পাগল হয়ে যাব? যারা ভগবানের প্রেমে মত্ত তাদের তারা বলে, বেহেড হয়ে গেছে। কিন্তু এই সব লোকে এটি বোঝে না যে সচ্চিদানন্দ অমৃতের সাগর। আমি নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, মনে কর, যে এক খুলি রস আছে আর তুই মাছি হয়েছিস। তুই কোনখানে বসে রস খাবি? নরেন্দ্র বললে, কিনারায় বসে মুখ বাড়িয়ে খাব। আমি বল্লুম, কেন? মাঝখানে গিয়ে ডুবে খেলে কি দোষ? নরেন্দ্র বললে, তাহলে যে রসে জড়িয়ে মরে যাব। তখন আমি বললুম, বাবা, সচ্চিদানন্দ রস তা নয়। এ রস অমৃত রস। এতে ডুবলে মানুষ মরে না, অমর হয়।

একাকী মহাপথিক বাঙলার দ্বারে দ্বারে দীপ্যমান জীবনমণি-দীপটি নিয়ে এমনি ভাবে ডাক দিয়ে বেড়িয়েছিলেন, ডুব দাও, ডুব দাও, সচ্চিদানন্দ অমৃত

রসে ডুব দিয়ে নিজেকে দিব্য করে তোল। জীবনে কর্মযোগের পথেই হোক বা জ্ঞানযোগর পথেই হোক—নিজের মনের সহজ পথটি ধরে এগিয়ে যেও কিন্তু মনটি আগে ডুবিয়ে নিও সচ্চিদানন্দ রসে। সচ্চিদানন্দ আগে তারপরে আর যা কিছু।

সে ডাক যার কানে গেল সেই মজল। কিন্তু সংসারী মানুষ এত সহজে ত নিরাপদ আশ্রয়ের বাঁধ ভেঙে মহাপথিকের সঙ্গী হতে পারে না। বাধা যে অনেক। সেই. বাধা অতিক্রম করার জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষা চাই। কিন্তু মহাপথিকের ত সময় নেই,—কে তাঁর কাছ থেকে সঞ্জীবন মন্ত্রের দীপ মাথায় তুলে নিয়ে পরম ধৈর্যে শুভক্ষণের জন্য প্রতীক্ষা করে বসে থাকবে? শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝেছিলেন, এ কাজের জন্য সকলের আগে প্রয়োজন একদল সর্বত্যাগী তরুণ, যারা অমৃত রসের সাগরে নিঃশেষে নিজেদের উৎসর্গ করবে। তাই তাঁর করুণ, ব্যথিত চোখ দুটিতে ভেসে উঠেছিল এই তরুণ বাউলদের জন্য সনির্বন্ধ আবেগ। তিনি আকাশের দিকে দিকে ব্যাকুল আহ্বান পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ওরে নবীন, ওরে তাজার দল, বাঁধন যত ছিন্ন করে ছুটে এস। বিশ্বপ্রাণের সাগর তীরে কিছু হারাবার ভয় নেই। তোমাদের সর্বস্ব তাতে অঞ্জলি দিয়ে ঝাঁপ দাও। কোন ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করে পিছিয়ে পড়ো না, অমৃতসাগর থেকে তোমরা মহাজীবন লাভ করে অমর হবে।

শেষে একদিন তাঁরাও এলেন। অন্তরঙ্গ গৃহীভক্তদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও একে একে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের যাত্রাপথের সঙ্গী হলেন। মহাভিক্ষু তাঁর সর্বস্বধন স্পর্শমণিটিকে একদিন এই বাউলদের হাতেই উত্তরাধিকার হিসাবে দান করে গিয়েছিলেন।

*

* *

একদিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ খুব কঠোর গুরু ছিলেন। তাঁর তরুণ অন্তরঙ্গ মণ্ডলীতে তিনি সহজে কারুকে গ্রহণ করেন নি। এ বিষয়ে তাঁর নানা বাছবিচার ছিল। প্রথমতঃ, বয়সে কাঁচা হওয়া চাই। কাঁচা বয়সে মানুষের মন কামিনীকাঞ্চন, লোকমান্য প্রভৃতিতে তখনও ছড়িয়ে পড়ে না, সে সময় থেকে চেষ্টা করলে ঈশ্বরে ষোল আনা মন অর্পণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। তাছাড়া, ভাল স্বাস্থ্য থাকা চাই। শ্রীরামকৃষ্ণ নানাভাবে এই শ্রেণীর ভক্তদের চরিত্র পরীক্ষা করে নিতেন। বাইরের শারীরিক লক্ষণ দেখে মানুষের প্রকৃতি

নিরূপণ করা সম্বন্ধে তাঁর অদ্ভুত ধারণা ছিল। তিনি বলতেন, পদ্মপত্রের মত যার চোখ তার ভিতরে সদ্‌ভাব ও সাধুভাব থাকে। বৃষের মত চোখ থাকলে লোকের কাম প্রবল হয়। যোগীর চোখ উর্দ্ধদৃষ্টি বিশিষ্ট রক্তিমাভ হয়। দেবচক্ষু বেশি বড় হয় না কিন্তু কান পর্যন্ত টানাটানা হয়। ভক্তিমান লোকের শরীর স্বভাবতঃ কোমল আর তার হাত পায়ের গাঁট আলগা হয়। ঘুমের সময় সকলের নিঃশ্বাস সমান পড়ে না, ভোগীর একভাবে পড়ে, ত্যাগীর আর এক ভাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যদের সৎ বা অসৎ বিষয়ে প্রবণতা দেখবার জন্য তাদের কনুই থেকে আঙুল পর্যন্ত একখানি হাত নিয়ে নিজের হাতে রেখে মেপে দেখতেন। শুধু দৈহিক লক্ষণ নয়, প্রতিদিনের সামান্য কাজকর্মের মধ্যে তিনি সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখতেন কার মানসিক ভাব ও কামকাঞ্চনাসক্তি কি রকম।

এই ভাবে বিশেষ পরীক্ষার পর যাঁদের তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই সংস্কৃতিবান্, ইংরেজিশিক্ষিত, অভিজাত ও মধ্যশ্রেণীর প্রতিভাবান্ ছেলের দল। তাঁদের অনেকেরই লৌকিক জীবনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় উজ্জ্বল ছিল। দু-একজন ছাড়া সকলেই অবিবাহিত, তখনও সংসারে কেউ জড়িয়ে পড়েন নি, মন ফুলের পাপড়ির মত নরম আর নির্মল। দিব্যজীবন যদি কেউ সংসারে নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারে সে কাজের সব চেয়ে যোগ্য এঁরাই। আশ্চর্য এই যে, এঁরা কেউ তাঁর অলৌকিক জীবনের আকর্ষণে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি, করেছিলেন তাঁর অহেতুক ভালবাসার বাঁধনে জড়িয়ে পড়ে।

জীবনের পরিণত স্তরে এই কয়টি সিংহশিশু পেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বিভোর হয়ে গেছলেন। তাঁর অন্য ভক্তেরা নিজেদের মুক্তিলাভের জন্যে চেষ্টা করবেন—এঁরা ছিলেন অন্য জাতের। এঁদের জন্ম সারা মানুষজাতির কাছে তাঁর বাণী বহন করে নিয়ে যাবার জন্য। তিনি বলতেন, এ সব ছোকরারা নিত্য সিদ্ধের থাক। ঈশ্বরের জ্ঞান নিয়ে জন্মেছে। একটু বয়স হলেই বুঝতে পারে, সংসার গায়ে লাগলে আর রক্ষা নাই। বেদেতে হোমাপাখির কথা আছে। সে পাখি আকাশেই থাকে, মাটির উপর কখন আসে না। আকাশেই ডিম পাড়ে। ডিম পড়তে থাকে কিন্তু এত উঁচুতে পাখি থাকে যে পড়তে পড়তে ডিম ফুটে যায়। তখন পাখির ছানা বেরিয়ে পড়ে, সেও পড়তে থাকে। তখনও এত উঁচু যে পড়তে পড়তে ওর পাখা ওঠে ও চোখ ফোটে। তখন সে দেখতে

পায় যে আমি মাটির উপর পড়ে যাব। মাটিতে পড়লেই মৃত্যু। মাটি দেখাও যা, অমনি মার দিকে চোঁচা দৌড়! একেবারে উড়তে আরম্ভ করে দিলে। যাতে মার কাছে পৌঁছতে পারে। এক লক্ষ্য মার কাছে যাওয়া। এ সব ছোকরারা ঠিক সেই রকম। ছেলেবেলাতেই সংসার দেখে ভয়। এক চিন্তা—কিসে মার কাছে যাব, কিসে ঈশ্বর লাভ হয়।

পাঁচ বছর ধরে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তিনি এই মনের মানুষগুলির জীবন গড়ে তুলেছিলেন। গৃহী অন্তরঙ্গদের তিনি কখন চরম ত্যাগের পথে আকর্ষণ করার চেষ্টা করতেন না। কিন্তু এঁদের বেলায় সে বিবেচনার অবসর ছিল না। সংসারের সমস্ত ভোগবাসনা বিসর্জন দিয়ে অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের পথে লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। দেহসুখ, টাকাকড়ি, লোকমান্য, সিদ্ধাই—কোন কিছুর লেশমাত্র কামনা যেন তাঁদের ভগবদ্‌সাধনার পথ থেকে বিচ্যুত না করতে পারে। আগে সচ্চিদানন্দ সাগরে নিঃশেষে তলিয়ে যাওয়া চাই, তারপর যদি বিধাতার ইচ্ছা থাকে জীবকল্যাণে মাটির দেশে এসে কর্মযোগের আয়োজন করতে পারে। কিন্তু সকলের আগে চরম লক্ষ্যে পৌঁছানো চাই। সে পথে এগিয়ে যাবার জন্য দরকার তীব্র বৈরাগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতেন, একজনের স্ত্রী একদিন তার স্বামীকে বললে, দাদা আজ কদিন থেকে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবার চেষ্টা করছে। খাওয়া কমিয়েছে, মাটিতে শোয়, বউএর সঙ্গে ভাল করে কথা কয় না। তাই বড় ভাবনা হয়েছে পাছে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যায়। স্বামী তখন বললে, দূর ক্ষেপী, সে যেতে পারবে না। সন্ন্যাসী কি অমন করে হয়? স্ত্রী বললে, ওগো সে যে কাপড় ছুবিয়েছে, সব ঠিক করেছে, নিশ্চয় যাবে। তোমার যেমন কথা! অমন করে হয় না ত কেমন করে হয়? স্বামী বললে, কেমন করে হয় দেখবি? এই এমন করে। এই বলে নিজের পরা কাপড়খানি ছিঁড়ে কপনী করে পরে বেরিয়ে গেল আর এল না।

অটুট সঙ্কল্প থাকা চাই। হিসাব করে এগোলে এপথে সিদ্ধি মেলে না। বেহিসাবী, বেপরোয়া একনিষ্ঠতা না থাকলে সাফল্য নেই। জীবনের সকল দিক বজায় রেখে ধীরে সুস্থে সাগরের তীরে তীরে বেড়ালে মণির সন্ধান মেলে না—সব আশা জলাঞ্জলি দিয়ে সাগরের অতল তলে একেবারে ডুব দিতে হবে। আর চাই সিদ্ধিলাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা। এ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, শিষ্য জিজ্ঞাসা করেছিল, ভগবানকে কেমন করে পাওয়া যায়। গুরু বললেন, এস আমার সঙ্গে, তোমাকে দেখিয়ে দিই কি হলে ভগবানকে পাওয়া যায়।

এই বলে একটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে তাকে জলে চুবিয়ে ধরলেন। খানিকক্ষণ পরে তাকে জল থেকে উঠিয়ে এনে জিজ্ঞেস করলেন, জলের ভিতর তোমার কি রকম বোধ হচ্ছিল? শিষ্য হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিলে, আমার প্রাণ আটুবাটু করছিল যেন যায় যায়। গুরু তখন গম্ভীর হয়ে বললেন, দেখ, ভগবানের জন্যে যদি তোমার প্রাণ এমনি আটুবাটু করতে থাকে তবেই তাঁকে পাওয়া যায়। * * * * খুব ব্যাকুলতা চাই। বালক যেমন মাকে না দেখলে দিশেহারা হয়। সন্দেশ, মিঠাই হাতে দিয়ে ভোলাতে যাও কিছুই চায় না, কিছুতেই ভোলে না। কেবল বলে, না, আমি মার কাছে যাব। সেই রকম ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুলতা চাই।

আর প্রয়োজন অখণ্ড বিশ্বাস। স্পর্শমণির সন্ধানে পথে নেমে ক্ষণে ক্ষণে অবসাদ এলে চলবে না। একদিন সাধনার তিমির আকাশ চিরে ভোরের আলো জেগে উঠবেই উঠবে—এই অনির্বাণ আশা বুকে রেখে নিত্য পথ চলা চাই। আজকের সূর্যাস্ত আর একদিনের সূর্যোদয় রূপে আবার দেখা দেবেই দেবে। সেদিন হঠাৎ জীবনের সকল দিক ভরে হবে চিরসুন্দরের আবির্ভাব। মহাপথিক কখন ভক্তপথিককে ভুলে থাকতে পারেন না। একদিন টেনে নিয়ে তাঁর চির আনন্দ লীলার সঙ্গী করে নেবেনই। আজকের অশ্রুজল আর একদিন মিলনের আনন্দআবেগে সফল হয়ে উঠবেই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই ভক্তদের অবসাদের ক্ষণে উৎসাহ দিয়ে বলতেন, ওরে কালে হবে, কালে বুঝবি। বীচিটা পুঁতলেই কি অমনি ফল পাওয়া যায়? আগে অঙ্কুর হবে, তারপর চারা গাছ হবে, তারপর সেই গাছ বড় হয়ে তাতে ফুল ধরবে, তারপর ফল—সেই রকম। তবে লেগে থাকতে হবে। ছাড়লে চলবে না। এই বিশ্বাস নিয়ে পড়ে থাকতে হবে যে তাঁর দর্শন পাওয়া যাবেই যাবে। * * * জটিল বালকের কথা আছে। সে পাঠশালে যেত। একটু বনের পথ দিয়ে পাঠশালে যেত, তাই সে ভয় পেত। মাকে বলতে মা বললে তোর ভয় কি? মধুসূদনকে ডাকবি। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করলে মধুসূদন কে? মা বললে, মধুসূদন তোমার দাদা হয়। তখন একলা যেতে যেই ভয় পেয়েছে অমনি ডাক দিলে, দাদা মধুসূদন, তুমি এস আমার বড় ভয় করছে। ঠাকুর তখন আর থাকতে পারলেন না। সামনে এসে বললেন, এই যে আমি, ভয় কি? এমনি বিশ্বাস থাকা চাই।

একে একে এই তরুণদল যখন প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ধরা দেন তখন

কেউই তাঁর পথের সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন না। অবশ্য প্রায় সকলেই জন্মেছিলেন অসামান্য আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা নিয়ে। একই কালে বাংলাদেশের রাজধানীর চারপাশে কয়েক মাইল পরিধির মধ্যে এতগুলি বিরাট সত্তার আবির্ভাব যে বাংলার ইতিহাসে একান্ত বিস্ময়কর ঘটনা তা অস্বীকার করা যায় না। মনে হয়, এরা যেন বিশ্বশক্তির কোন অজানা নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহচর হয়ে বাংলার বুকে জন্ম নিয়েছিলেন। কিন্তু এঁদের প্রাণসত্তা যতই দীপ্ত সম্ভাবনায় ভরপুর থাকুক নিজের চেষ্টায় তাঁরা কেউ শ্রীরামকৃষ্ণের পথের পথিক হন নি। সাধারণভাবে ভগবৎ সন্ধানে একটা স্বাভাবিক আবেগ নিয়ে তাঁরা প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে আসেন. পরে গুরুর মধুর ব্যবহার ও অতুলনীয় ভালবাসায় তাঁরা তাঁর সঙ্গে অচ্ছেদ্য বাঁধনে জড়িয়ে পড়েন। পরমহংস সেই ভালবাসার বাঁধনের সুযোগে ধীরে ধীরে অতি সংগোপনে তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরলাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা ও ও বৈরাগ্য জাগিয়ে তোলেন। এই ছেলের দলের সঙ্গে তিনি ছেলে হয়ে গেছলেন। এঁদের যেন সমবয়সী বয়স্য ছিলেন। এঁদের সঙ্গে তাঁর রঙ্গতামাসা, সহজ অন্তরঙ্গতা দেখে কত আগন্তুক তাঁকে ভুল বুঝে নিন্দা করতেন। কিন্তু লোকগুরু সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও করতেন না। নিজেকে সামনে রেখে এমন কৌশলে তিনি এঁদের দিব্যজীবনের পথে আকর্ষণ করতেন যে তা ভাবলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। স্বামী প্রেমানন্দ তখন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের এনট্রেন্স শ্রেণীর ছাত্র। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। কিছুদিন থেকে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করছেন। তার জন্য বাড়ির অভিভাবকেরা বড় অসন্তুষ্ট। তবু বাবুরামের আসা বন্ধ হয় না। সেদিন স্কুল থেকে পালিয়ে এসে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখে বললেন, তোর বই কই? পড়াশোনা করবি না? তারপর মাস্টারমশাইএর দিকে ফিরে মন্তব্য করলেন: বাবুরাম দুদিক রাখতে চায়। * * * ওরে, এ বড় কঠিন পথ, একটু তাঁকে জানলে কি হবে? এমন যে বশিষ্ঠদেব, তাঁরই পুত্রশোক হল! লক্ষ্মণ তা দেখে অবাক্ হয়ে রামকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাম জবাব দিলেন, ভাই, এ আর আশ্চর্য কি? যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞানও আছে। তুমি জ্ঞান অজ্ঞানের পারে যাও। পায়ে কাঁটা ফুটলে আর একটি কাঁটা খুঁজে আনতে হয়। সেই কাঁটা দিয়ে প্রথম কাঁটাটি তুলতে হয়, তারপর দুটি কাঁটাই ফেলে দিতে হয়। তাই অজ্ঞান কাঁটা তোলবার

জন্যে জ্ঞানকাঁটা জোগাড় করতে হয়। তারপর জ্ঞান অজ্ঞানের পারে যেতে হয়।

কৈশোরের তাজা আগ্রহ নিয়ে বাবুরাম বললেন, আমি ঐ রকমটি চাই।

—ওরে, দুদিক রাখলে কি তা হয়? তা যদি চাস ত তবে চলে আয়।

—আপনি নিয়ে আসুন।

সূক্ষ্ম কৌশলী পরমহংস শিষ্যের মনে সহজ পথে তীব্র আগ্রহ জাগাবার উদ্দেশ্যে মাস্টারের দিকে চেয়ে বললেন, রাখাল ছিল সে এক। তার বাপের মত ছিল। এরা থাকলে হাঙ্গামা হবে। তারপর বাবুরামের দিকে ফিরে তিনি কথা শেষ করলেন: তুই দুর্বল, তোর সাহস কম। দেখ্ দেখি, ছোট নরেন কেমন বলে, আমি একেবারে এসে থাকব।

একটু চুপ করে তিনি আবার বলতে লাগলেন, আমি কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী খুঁজছি। মনে করি এ বুঝি থাকবে,—সকলেই এক একটা ওজর করে। একটা ভূত সঙ্গী খুঁজছিল। শনি মঙ্গলবারে অপঘাত মৃত্যু হলে ভূত হয়। তাই সেই ভূতটা যাই দেখত কেউ ছাদ থেকে পড়ে গেছে, কি হোঁচট খেয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে, অমনি দৌড়ে যেত এই মনে করে যে এটার অপঘাত মৃত্যু হয়েছে, এবার ভূত হবে আর আমার সঙ্গী হবে। কিন্তু তার এমনি কপাল যে সব শালারাই বেঁচে ওঠে। সঙ্গী আর জোটে না।

স্বামী যোগানন্দের বাড়ি ছিল দক্ষিণেশ্বরে। খুব ছোটবেলা থেকেই তিনি পরমহংসের কাছে আসাযাওয়া করতে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁকে অন্তরঙ্গবোধে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখতেন। ছেলের উদাসীন ভাব দেখে তাঁর মা একদিন ষড়যন্ত্র করে বিয়ের আয়োজন করলেন। যোগীন বড় শান্ত প্রকৃতির নিরীহ মানুষ ছিলেন। মায়ের বুকফাটা কান্না সহ্য করতে না পেরে একান্ত অনিচ্ছায় বিয়ে করতে বাধ্য হন। বিয়ে করার পর তাঁর মনে হল আর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাবেন না, ভগবান লাভের চেষ্টা করা এখন তাঁর পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। এই ভেবে তিনি কালীবাড়িতে যাওয়া বন্ধ করলেন। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্বিগ্ন হয়ে বারেবারে লোক পাঠান দেখা করবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে। কিন্তু যোগীনের দেখা নেই। কৌশলী শ্রীরামকৃষ্ণ তবু ছাড়বার পাত্র নন। কিছুদিন আগে কালীবাড়ির একজন লোক যোগীনকে দু-একটি জিনিস কিনে এনে দেবার জন্য কয়েকটি টাকা দিয়েছিলেন। যোগীন জিনিস দুটি আনার পর যে দু-এক আনা উদ্বৃত্ত পয়সা

ছিল তা ফেরত দিতে ভুলে গেছলেন। পরমহংসের কানে সে কথা গেছল। একদিন পরমহংসের কাছ থেকে একজন লোক এসে যোগীনকে বললে, তুমি কেমন লোক? শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছিলেন, তোমাকে জিনিস কিনতে টাকা দেওয়া হয়েছিল। তার হিসেব দেওয়া দূরে থাক বাকী পয়সাও ফেরত দিলে না আর কবে দেবে তাও বলে পাঠাও নি। একথা শুনে যোগীনের মনে ভয়ঙ্কর অভিমান হল, এতদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে জোচ্চর ভাবলেন। তিনি ঠিক করলেন, আজ কালীবাড়িতে গিয়ে বাকী কয়েক আনা পয়সা ফেরত দিয়ে আসবেন। তারপর আর কখন ওদিকে মাড়াবেন না। কিছুক্ষণ পরে গেলেন কালীবাড়িতে। যোগীনকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে ভালবাসার জাদুকর পরমহংস পরনের কাপড়খানি বগলে নিয়ে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় এগিয়ে এলেন, বলতে লাগলেন,—কণ্ঠে যেন মধু ঝরতে লাগল : বিয়ে করছিস তাতে ভয় কি ? এখানকার কৃপা থাকলে লাখটা বিয়ে করলেও কোন ক্ষতি হবে না। যদি সংসারে থেকে ভগবানকে পেতে চাস তাহলে তোর স্ত্রীকে একদিন এখানে নিয়ে আসিস। তোদের দুজনকে সেই রকম করে দেব। আর যদি সংসার ত্যাগ করে ভগবানকে পেতে চাস তাহলে তাও করে দেব।

বাড়তি পয়সার হিসাবের অভিযোগ কোথায় গেল! যোগীন্দ্রের অভিমানই বা কোথায় রইল! অপ্রত্যাশিত করুণার স্পর্শে তাঁর সব বেদনা দূর হল, তিনি চিরদিনের মত পৃথিবীতে দুর্লভ মহামানুষের ভালবাসার ফাঁদে বাঁধা পড়লেন।

নিত্যঅদ্বৈত ভূমিতে মন অবস্থান করলেও লীলাসঙ্গীদের গড়ে তোলার কাজে মহাবৈরাগী অনেক ভাবনা—অনেক পরিশ্রম করতেন। তিনি এঁদের সকলকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞান করতেন, এঁদের সেবায় তাই যা কিছু করতেন তাতে জগদ্মায়ের পূজাই করা হত, নিত্যের চিন্তা থেকে মনকে ক্ষণকালের জন্যও বিচ্যুত করা হত না। শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ দেবার আগে ভক্তের মানস-প্রকৃতি বিশেষভাবে বিবেচনা করতেন। একই বিষয়ে অধিকারী ভেদে বিভিন্ন লীলাসঙ্গীকে বিভিন্ন উপদেশ দিতেন। দৃঢ়, স্বাস্থ্যবান্ নিরঞ্জন ছিলেন স্বভাবতঃ উগ্রপ্রকৃতির মানুষ। একদিন নৌকা করে দক্ষিণেশ্বরে আসার সময় কয়েকজন লোককে পরমহংসদেবের নিন্দা করতে শুনলেন। সেকালে দক্ষিণেশ্বরের পাশাপাশি গ্রামের লোকেরা কেউ কেউ পরমহংসদেবের অদ্ভুত আচার ব্যবহার বুঝতে না পেরে অকারণে তাঁকে নিন্দা করতেন। নিরঞ্জনের

নৌকোর সঙ্গীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলেন, ঐ এক ঢং! ভাল খাচ্ছেন, গদিতে শুচ্ছেন আর ধর্মের ভান করে যত সব স্কুলের ছোকরাদের মাথা খাচ্ছেন। নিরঞ্জন প্রথমে সহজভাবে প্রতিবাদ করে তাঁদের ভুল ভাঙবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। তখন তাঁর প্রচণ্ড রাগ হল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি নৌকো ডুবিয়ে দিয়ে গুরুনিন্দার প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেলেন। গায়ে অসীম জোর, বলিষ্ঠ শরীর। যাত্রীরা সকলে ভয় পেয়ে গেলেন। শেষে তাঁরা তাঁকে অনেক অনুনয় বিনয় করে শান্ত করলেন। যাঁরা পরমহংসদেবকে নিন্দা করেছিলেন তাঁরা বিপদ বুঝে মাপ চেয়ে নিষ্কৃতি পেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরে সেই গল্প শুনে নিরঞ্জনকে বকেছিলেন, বলেছিলেন, ক্রোধ চণ্ডাল, ক্রোধের কখন বশবর্তী হতে আছে? সৎলোকের রাগ জলের দাগের মতন, হয়েই মিলিয়ে যায়। হীনবুদ্ধি লোক কত কি কথা বলে তা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করতে গেলে ঐ নিয়েই জীবনটা কাটাতে হয়। ও রকম ঘটলে ভাববি, লোক না পোক্। ও সব কথা উপেক্ষা করে যাবি। রাগের বশে কি অন্যায় কাজ করতে উদ্যত হয়েছিলি দেখ্ দেখি! দাঁড়ি মাঝিরা কি দোষ করেছিল? রাগের বশে সেই গরিবদের উপরও অত্যাচার করতে গেছলি!

কিন্তু উগ্র নিরঞ্জনের পক্ষে যা সত্য, শান্ত, নরম স্বভাবের যোগীনের পক্ষে তা ক্ষতিকর। শ্রীরামকৃষ্ণ মনে করতেন, আধ্যাত্মিক পথে ঠিক ঠিক এগোতে গেলে কোন একটি ভাবের আধিক্য দিয়ে মনকে মোহাবিষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়। দয়া খুব মহৎ গুণ কিন্তু অত্যধিক দয়া অনেক সময়ে যোগীকে বন্ধনের মধ্যে টেনে আনে ও ধর্মপথ থেকে পদস্খলনের কারণ হয়। নরম মনের মানুষেরা সহজে এই রকম দয়ায় চাপে নষ্ট হয়। তাই যোগীনকে তিনি প্রায়ই কঠোর হবার পরামর্শ দিতেন। একদিন নিরীহ যোগীন নৌকো করে আসবার সময় এক দল যাত্রীকে গুরুনিন্দা করতে শুনলেন। তিনি তা শুনে খুব ব্যথা পেলেন কিন্তু স্বাভাবিক শান্ত প্রকৃতির জন্য তা নিয়ে রাগারাগি না করে উপেক্ষা করবার চেষ্টায় চুপ করে রইলেন। ভাবলেন, বেচারিরা পরমহংসদেবকে জানে না, জানলে নিজেদের এত বড় মুখখমি এমন ভাবে জাহির করত না। যথা সময়ে তিনি কালীবাড়িতে এসে গুরুকে সব কথা গল্প করলেন। শিষ্যের কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশেষ বিচলিত হয়ে বললেন, ওরা মিথ্যে মিথ্যে আমার নিন্দে করলে আর তুই চুপ করে শুনে এলি, একটা

কথাও বললি না! তুই কিরে? শাস্ত্রে আছে, গুরুনিন্দা যে করবে তার মাথা কেটে ফেলবে কিংবা সে জায়গা থেকে উঠে চলে যাবে।

ব্যক্তিবিশেষের মনের সহজ ভাবধারার অনুসরণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। তিনি কতকগুলো মহৎ ভাবকে সকলের পক্ষে একমাত্র সত্য এবং অনুসরণীয় বলে ভাবতেন না। অধিকারী ভেদে তাঁর শিক্ষাপ্রণালীর প্রকৃতি বদলাত।

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ধর্মসাধনা নেতিমূলক ছিল না। আধ্যাত্মিকতা বলতে জীবনের কতকগুলি বস্তু নিছক ত্যাগ করার চেষ্টা বুঝতেন না। তাঁর ধর্মসাধনা মানে মানুষের সমগ্র জীবনকে কেন্দ্র করে দিব্যভাবের দীপজ্বালার নিত্যপ্রয়াস। সে সাধনার পরিণত স্তরে ব্যক্তিজীবনের বিশালভবনে ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে সোনার প্রদীপ—এক তলাকে অন্ধকার রেখে আর এক তলা দীপ্তিময় হয় না।

মনে হয়, যুগে যুগে ধর্মের মহাসাধকেরা দুপথেই সাধনার চেষ্টা করে গেছেন। একজনদের পথের লক্ষ্য হচ্ছে সাতমহল জীবননিকেতনের প্রতি ঘরে একটি একটি করে আলো জ্বেলে অনির্বাণ পরম দ্যুতিময়কে লাভ করা। আর একজনদের লক্ষ্য হচ্ছে, যতগুলি ঘরে আলো আছে তাদের সবগুলি একটি একটি করে নিঃশেষে নিবিয়ে দিয়ে নেতির অন্ধকারে সর্বগুণাতীত পরম তিমিরময়কে লাভ করা। প্রকৃতি ভেদে পথের বিভেদ। গতীয় প্রকৃতি যাঁদের তাঁরা চির চলার পথই বেছে নেন, স্থিতীয় প্রকৃতি যাঁদের তাঁরা কামনা করেন চিরনিষ্ক্রিয়তার শূন্যতা। তাই একদল দিব্যজীবন লাভ করে নিঃস্বার্থ কর্মের বন্যায় পৃথিবীকে সোনার আলোয় ভরিয়ে তোলেন, আর একদল বিশ্বের সঙ্গে সকল সম্পর্ক রহিত হয়ে চরম লক্ষ্যে উপস্থিত হন। বলা যেতে পারে, একদলের দৃষ্টান্ত বুদ্ধদেবের জীবনের অনুগামীরা আর একদলের দৃষ্টান্ত শঙ্করাচার্যের মতবাদের অনুসরণকারীরা।

শ্রীরামকৃষ্ণের পথ ছিল আলো জ্বালার পথ। তিনি লীলাসঙ্গীদের জীবনকে সমগ্রভাবে দ্যুতিময় করে তোলার চেষ্টা করতেন। আধ্যাত্মিকতার জন্য নিজেকে গড়ার অতি আগ্রহে তাঁরা যাতে সংসারের দিক থেকে অকেজো হয়ে না ওঠেন সেদিকে তাঁর তীব্র দৃষ্টি ছিল। তিনি নিজে নিরন্তর ভাবমুখে থাকতেন। কিন্তু তাই বলে দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি কাজগুলি সম্বন্ধে বেহুঁশ ছিলেন না। এ সব বিষয়ে তিনি নিজে খুব গোছালো মানুষ ছিলেন। তাঁর

বিছানাপত্র, ঘরদোর খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকত। নিজের খুঁটিনাটি কাজের জন্য অপরদের উপর নির্ভর করে থাকতে ভাল বাসতেন না। নিজের ধুতি, গামছা, মশলা রাখার বেটুয়া প্রভৃতি নিজে গুছিয়ে রাখতেন। এ সব জিনিস রোজ রোজ একই জায়গায় রাখার অভ্যাস ছিল। যে জিনিসটি যেখানে রাখতেন, ব্যবহার করার পর আবার সেখানেই তুলে রাখতেন। কোথাও যাবার আগে যা যা সঙ্গে নেওয়া উচিত তা সব নেওয়া হয়েছে কিনা নিজে খোঁজ করে তবে তিনি যাত্রা করতেন। আবার ফিরে আসার সময় কিছু ভুলে যে ফেলে যাচ্ছেন না তা খোঁজ করে তবে বার হতেন। ভারতবর্ষে সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, ধর্ম-উদাসীনতা মানে এ সব খুঁটিনাটি বিষয়ে অমনোযোগিতা, অগোছালো ভাব। আমরা এর আগে এক পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি, শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যাস ছিল সেই ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। একদিন কলকাতায় ভক্ত বলরামের বাড়িতে সারাদিন থাকবেন বলে যাচ্ছেন, সঙ্গে স্বামী যোগানন্দ। সকলে গাড়িতে উঠলে গাড়ি ছেড়ে দিলে। কালীবাড়ির প্রধান দরজার কাছাকাছি এসেছেন এমন সময় হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের কি মনে হল, জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে নাইবার কাপড় গামছা এনেছিস ? তখন ভোরবেলা। ইচ্ছে ছিল কলকাতায় গিয়ে স্নান করবেন। যোগানন্দ জবাব দিলেন, গামছা এনেছি, কাপড়খানা আনতে ভুলে গেছি। তা ভাবনা নেই বলরামবাবুরা আপনার জন্যে একখানা নতুন কাপড় দেখে শুনে দেবেনখন। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ও কি তোর কথা ? লোকে বলবে, কোথা থেকে একটা হাবাতে এসেছে। তাদের কষ্ট হবে, কাপড়ের ব্যবস্থা করতে আতান্তরে পড়বে। যা গাড়ি থামিয়ে নেবে গিয়ে কাপড়খানা নিয়ে আয়।

আর একদিন স্বামী যোগানন্দ বাড়ির জন্য একটা কড়া কিনতে গেলেন। দোকানীকে ধর্মের ভয় দেখিয়ে বললেন, দেখ বাপু, ঠিক ঠিক দাম নিয়ে ভাল জিনিস দিও—যেন ফাটাফুটো না হয়। দোকানী বললে, খারাপ কি আপনাকে দিতে পারি, বাবুমশাই ! আমার পাপের ভয় নেই। যোগানন্দ খুশী হয়ে কড়া নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। এসে দেখেন, কড়াখানি ফাটা। শ্রীরামকৃষ্ণ সে কথা শুনে বললেন, সে কিরে, জিনিসটা আনলি তা দেখে আনলি নি ? দোকানী ব্যবসা করতে বসেছে—সে ত আর ধর্ম করতে বসে নি। তার কথায় বিশ্বাস করে ঠকে এলি ? ভক্ত হবি, তা বলে বোকা হবি কেন ?

এ সংসারে যারা চিরাচরিত পথে যায় না, ভিতরে বাইরে তাদের জীবনে

বাধা অনেক। বাইরেকার বাধার মধ্যে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্ছে লোকভয়। চারপাশের সাধারণ লোকেরা নানাভাবে তাদের পথ আটকায়, নিন্দা করে, অবজ্ঞা করে। শ্রীরামকৃষ্ণ এ বিষয়ে তরুণ লীলাসঙ্গীদের খুব সাবধান করে দিতেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরের ঘরটিতে ভক্তেরা তাঁকে ঘিরে বসে আছেন, পাশে নরেন্দ্র। লোকভয়ের প্রসঙ্গ শুরু করে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, এই সব দুষ্টু লোকের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা উচিত ?

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনের দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রথমে প্রশ্ন করলেন, তুই কি বলিস্ ? সংসারী লোকেরা কত কি বলে ! হাতী যখন পথ দিয়ে যায় পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চিৎকার করে। কিন্তু হাতী ফিরেও তাকায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তুই কি মনে করবি ?

তেজস্বী, উচ্ছলতারুণ্যে উদ্দীপ্ত নরেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, আমি মনে করব, কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন, নারে, অত দূর নয়। ভগবান সর্বভূতে আছেন। তবে ভাললোকের সঙ্গে মেলামেশি চলে, মন্দ লোকের কাছ থেকে তফাত থাকতে হয়। বাঘের ভিতরেও নারায়ণ আছেন, তাবলে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না। যদি বল, বাঘ ত নারায়ণ, তবে কেন পালাবে ? তার উত্তর, যারা বলছে পালিয়ে এস, তারাও ত নারায়ণ। তাদের কথা কেন না শুনি ! * * * * গল্প আছে, কোন বনে এক সাধু থাকেন। তাঁর অনেকগুলি শিষ্য। তিনি একদিন শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে সর্বভূতে নারায়ণ আছেন এইটি জেনে সকলকে নমস্কার করবে। একদিন একটি শিষ্য হোমের জন্য কাঠ আনতে বনে গিছল। এমন সময়ে একটা রব উঠল, কে কোথা আছ পালাও, একটা পাগলা হাতী যাচ্ছে। সবাই পালিয়ে গেল কিন্তু শিষ্যটি পালাল না। সে ভাবলে, হাতীও নারায়ণ, তবে কেন পালাব ? এই ভেবে দাঁড়িয়ে রইল। আর নমস্কার করে স্তবস্তুতি করতে লাগল। এদিকে মাহুত চেঁচিয়ে বলছে, পালাও, পালাও। শিষ্যটি তবু নড়ল না। শেষে হাতী তাকে শুঁড়ে করে তুলে ছুঁড়ে পথের ধারে ফেলে দিয়ে চলে গেল। ক্ষতবিক্ষত শিষ্য অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল। গুরু শিষ্যের খবর পেয়ে ছুটে গেলেন আর ওষুধ দিতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে হুঁশ ফিরে এলে শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি হাতী আসছে দেখেও কেন পালিয়ে গেলে না ? সে বললে, গুরুদেব, আপনি যে বলেছিলেন নারায়ণই মানুষ জীব জন্তু

সব হয়েছেন। তাই হাতী-নারায়ণ আসছে দেখে পালিয়ে যাই নি। তখন গুরু বললেন, বাবা, হাতী-নারায়ণ আসছিলেন বটে। কিন্তু মাহুত-নারায়ণ ত তোমাকে বারণ করেছিলেন। যদি সবই নারায়ণ তবে তার কথা শুনলে না কেন? মাহুত-নারায়ণের কথাও শুনতে হয়।

গল্প শুনে একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, যদি দুষ্ট লোকে আমাদের অনিষ্ট করে বা করতে আসে তাহলে কি আমাদের সহ্য করে যাওয়া উচিত নয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, সমাজে বাস করতে গেলে দুষ্টলোকের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করবার মত একটু তমোগুণ দেখানো দরকার। এক মাঠে এক রাখাল গরু চরাত। সেই মাঠে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ ছিল। সকলেই সেই সাপের ভয়ে খুব সাবধানে থাকত। একদিন একটি ব্রহ্মচারী সেই মাঠের মধ্যে দিয়ে আসছিল। রাখালেরা দৌড়ে এসে বললে, ঠাকুরমশাই, ওদিক দিয়ে যাবেন না। একটা ভয়ঙ্কর সাপ আছে। ব্রহ্মচারী জবাব দিলে, তা থাক্, আমার ওতে ভয় নেই, আমি মন্ত্র জানি। এই বলে সেই দিকে চলে গেল। রাখালেরা সঙ্গে কেউ গেল না। এদিকে ব্রহ্মচারীকে দেখে সাপটা ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করতে করতে এগিয়ে গেল। কিন্তু ব্রহ্মচারী যেই একটি মন্ত্র পড়লে অমনি কোথায় গেল তার ফণা আর কোথায় বা ফোঁসফোঁসানি? সাপটা কেঁচোর মতন পায়ের কাছে পড়ে রইল। ব্রহ্মচারী বললে, ওরে সাপ, তুই কেন পরের হিংসে করে বেড়াস? আয় তোকে মন্ত্র দিই। এই মন্ত্র জপলে তোর ভগবানে ভক্তি হবে আর হিংসাপ্রবৃত্তি থাকবে না। সাপটা মন্ত্র পেয়ে গুরুকে প্রণাম করে বললে, ঠাকুর, কি করে সাধনা করব বলে দিন। গুরু বললেন, এই মন্ত্র জপ কর আর কারুর উপর হিংসে করো না। পরে আমি আবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব। এইভাবে কিছুদিন যায়। রাখালেরা দেখে যে সাপটা আর কামড়াতে আসে না। ঢেলা মারে তবুও তেড়ে আসে না, যেন কেঁচোর মতন হয়ে গেছে। সাহস পেয়ে একদিন একজন রাখাল তার লেজ ধরে খুব ঘুরপাক দিয়ে তাকে আছড়ে ফেলে দিলে। সাপটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল, সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল। নড়ে না চড়ে না দেখে রাখালেরা ভাবলে সাপটা মরে গেছে। এই মনে করে সকলে চলে গেল। তারপর অনেক রাতে সাপটার হুঁশ ফিরে এল। সে অতি কষ্টে আস্তে আস্তে গর্তের ভিতর চলে গেল। শরীর তার ভেঙে গেল, নড়বার শক্তি পর্যন্ত লোপ পেলে। বাইরে খাবারের খোঁজে খুব রাত্তিরে এক

একদিন চরতে আসত। ভয়ে দিনের বেলা বার হত না। মন্ত্র নেবার পর থেকে আর ত হিংসা করে না। মাটি, পাতা বা গাছপড়া ফল খেয়ে প্রাণ-ধারণ করত। * * * প্রায় বছর খানেক পরে ব্রহ্মচারী সেই মাঠে এসে সাপের নাম ধরে ডাকতে লাগল। গুরুদেবের আওয়াজ পেয়ে সাপ অতি কষ্টে গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে প্রণাম করলে। ব্রহ্মচারী তাকে দেখে বললে, তুই এত রোগা হয়ে গেছিস কেন? সাপ জবাব দিলে, আপনি হিংসা করতে বারণ করেছিলেন। তাই পাতাটা ফলটা খেয়ে থাকি। সেইজন্য হয়ত রোগা হয়ে গেছি। ওর সত্ত্বগুণ হয়েছে, আর কারুর উপর রাগ নাই। রাখাল ছেলেদের মারের কথা ভুলেই গেছল। ব্রহ্মচারী মাথা নেড়ে বললে, শুধু না খাওয়ার দরুন এমন অবস্থা হয় না, ভেবে দেখ্। নিশ্চয়ই আরও কারণ আছে। তখন সাপটার মনে পড়ল যে রাখালেরা মেরেছিল। তখন সে মারের গল্পটা শেষ করে বললে, রাখালেরা অজ্ঞান, ওরা ত জানে না যে আমার কি মনের অবস্থা, আমি আর কারুকে কামড়াব না। ব্রহ্মচারী বললে, ছিঃ, তুই এত বোকা! আপনাকে রক্ষা করতে জানিস না। আমি কামড়াতে বারণ করেছি, ফোঁস করতে ত বারণ করিনি। ফোঁস করে তাদের ভয় দেখাস নাই কেন? * * * তেমনি সংসারে দুষ্টু লোকের কাছে ফোঁস করতে হয়, ভয় দেখাতে হয় যাতে অনিষ্ট করতে না পারে। অবশ্য তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নাই, প্রতিশোধ নেবার জন্যে তাদের ফিরে অনিষ্ট করতে নাই।

সিংহশিশুর জাগরণ

লীলাসঙ্গীদের মধ্যে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। তিনি সহজে গুরুর চরণে আত্মসমর্পণ করেন নি। তাঁদের দুজনের মন-দেওয়া-নেওয়ার কাহিনী বড় মধুর। সাগরের মত ছিল তাঁর সত্তা—গভীর, আবেগউত্তাল, বিরাট। ঝঞ্ঝার আঘাতে ক্ষুব্ধ সাগরের মতই তীব্র দ্বন্দ্ব নিয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে হাজির হয়েছিলেন। গুরুশিষ্যের নিবিড় অন্তরঙ্গতার গল্প সেই দ্বন্দ্ব সমাপ্তির ইতিকথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁদের ভবিষ্যৎ লীলাসঙ্গী বলে বুঝতেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেককেই প্রথম দুতিন সাক্ষাতের পর একদিন ছুঁয়ে দিয়ে তাঁদের হৃদয়ের আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা পরিমাপ করার চেষ্টা করতেন। তৃতীয় দিনে তেমনি নরেন্দ্রকে শ্রীযদু মল্লিকের বাগানে নিয়ে গিয়ে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ ছুঁয়ে দেন। মুহূর্তের মধ্যে নরেন্দ্রের সারা দেহে কি যেন এক অজানা অনুভূতির বিদ্যুৎঝলক খেলে গেল। জাদুকরের শক্তি সম্বন্ধে মন তাঁর আগে থেকেই সতর্ক ছিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই নিজেকে ঘনায়মান অচৈতন্যের হাত থেকে রক্ষা করতে পারলেন না, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সংজ্ঞা হারালেন।

অনেক দিন আগে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের এক দর্শন লাভ হয়। তিনি দেখেছিলেন, জ্যোতিষ্মান্ সমাধি পথে তাঁর মন এগিয়ে চলেছে। গ্রহতারা ঘেরা স্থূল জগৎ পার হয়ে ক্রমে তা এগিয়ে গেল সূক্ষ্ম ভাবজগতে। ক্রমে তা এসে হাজির হল সেই স্তরের শেষ প্রান্তে। একদিকে পড়ে আছে খণ্ডের রাজ্য আর একদিকে ছড়িয়ে পড়েছে অখণ্ডের রাজ্য। আর তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে আলোক রেখার বেড়া। সেই আলোক রেখা ডিঙিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের মন এসে হাজির হল অখণ্ডের রাজ্যে। তিনি দেখতে পেলেন, সেই নিরালা স্থানে দিব্যজ্যোতিঃ ঘনতনু সাতজন ঋষি সমাধিস্থ হয়ে বসে রয়েছেন। জ্ঞান ও পুণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে এঁরা অতুলনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ অবাক্ হয়ে এঁদের বিরাট মহত্ত্বের কথা ভাবছেন এমন সময়ে সামনের অখণ্ডের ঘরের অবিচ্ছিন্ন, ভেদবিরহিত, সমরস জ্যোতির্মণ্ডলের এক অংশ ঘনীভূত হয়ে এক দেবশিশুমূর্তিতে পরিণত হল। সেই দেবশিশু নেমে এসে নিজের সুললিত বাহু দিয়ে গভীর প্রেমে একজন ঋষির গলা জড়িয়ে ধরলেন, তারপর বীণার

চেয়েও মধুর কণ্ঠে অমৃত বাণী উচ্চারণ করে ঋষির সমাধি ভাঙবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ঋষির সমাধি ভাঙল, তিনি প্রেমে ঢলঢল অপলক চোখে দেবশিশুকে দেখতে লাগলেন! দেবশিশু তখন পরম আনন্দ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, আমি যাচ্ছি, তোমাকেও আসতে হবে আমার সঙ্গে। ঋষি সে অনুরোধের কোন উত্তর দিলেন না। তাঁর প্রেমব্যাকুল চোখদুটিতে ফুটে উঠল সম্মতির দীপ্তি। পরে দেবশিশুর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে তিনি আবার সমাধিতে লীন হয়ে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অবাক্ হয়ে দেখলেন, সেই সমাধিমগ্ন পুরুষের শরীরমনের এক অংশ প্রখর জ্যোতিঃর আকারে বিলোপ মার্গে পৃথিবীতে নেমে আসছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ যদু মল্লিকের বাগানে সংজ্ঞাহীন নরেন্দ্রকে প্রশ্ন করে জানতে পারলেন, ওঁকে প্রথম দেখে তাঁর মনে যে সন্দেহ জেগেছিল তা সত্যি। নরেন্দ্র সেই দর্শনে দেখাপাওয়া প্রবীণ ঋষি আর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং হচ্ছেন সেই দেবশিশু।

আগেকার দুদিন শ্রীরামকৃষ্ণের পাগলের মত ব্যবহার দেখে নরেন্দ্রের মনে নানা সংশয় ঘনিয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় সাক্ষাতের দিনেও শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে তাঁর বাহ্যচৈতন্য লোপ পেয়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন, এই ধর্মপাগল লোকটির অসাধারণ মোহিনী শক্তি আছে। তা ভেবে আজ তিনি খুব সতর্ক হয়ে এসেছিলেন। দৃঢ় সঙ্কল্প করেছিলেন, কিছুতেই এঁর মোহিনী শক্তিতে অভিভূত হবেন না। তবু শেষ পর্যন্ত এই পাগলের সম্মোহন বিদ্যার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারলেন না। নরেন্দ্রের মন ছিল তেজস্বী, যুক্তিপন্থী। তিনি তখন স্কচ মিশনারী কলেজে পড়তেন, পাশ্চাত্য দর্শনের অনুরাগী ছাত্র, নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। হিন্দু দেবদেবীর উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে গুরুবাদ মানতেন না। তাই প্রথম দিকে শ্রীরামকৃষ্ণের আচারব্যবহার ও মতবাদের বিরুদ্ধে তাঁর মনে তীব্র বিদ্রোহ জেগে ওঠে। অথচ তাঁর হৃদয়ে খুব ছোটবেলা থেকে ছিল ধর্মসাধনার জন্য স্বাভাবিক প্রবল আগ্রহ। এই সময়ে তিনি নিরামিষ খেতেন, সংসারের ঝামেলার বাইরে আত্মীয়ের বাড়িতে একটি নিরালা ঘরে পড়াশোনা করতেন, গভীর রাত পর্যন্ত ধ্যান করে কাটাতেন। এই আগ্রহের দরুনই তিনি মনে বিতৃষ্ণা জাগা সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণকে চিন্তা থেকে একেবারে মুছে দিতে পারেন নি। তাঁর অকৃত্রিম আধ্যাত্মিকতা দেখে গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয় কিন্তু গোড়া থেকেই নরেনের প্রতি অলৌকিক, নিঃস্বার্থ

ভালবাসায় ভরে উঠেছিল। তিনি নানাভাবে পরীক্ষা করে বুঝেছিলেন, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, গভীর প্রাণশক্তিতে অপরূপ এই তরুণ ছাত্রটি সে যুগে এক দুর্লভ আধার,—বিরাট সম্ভাবনায় অতুলনীয়। এঁর অন্তরের সুপ্ত মহাশক্তিকে স্বকীয় পথে জাগাবার গুরু দায়িত্ব তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। নরেনের ভিতরের কঠিন বিদ্রোহের কথা জেনেও পিছিয়ে যান নি। অবশ্য কখন কখন তাঁর মনে যে এই দুর্লভ সত্ত্বগুণী আধারকে হারাবার ভয় জাগে নি তা নয় কিন্তু দিব্য ভালবাসার বাঁধন দিয়ে তিনি এঁকে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ বশীভূত করেছিলেন। সেই ভালবাসার গল্প নানা প্রত্যক্ষদর্শী লিখে গেছেন। তা পড়লে অবাক্ না হয়ে থাকা যায় না। একজন ভক্ত এ সম্বন্ধে একটি ঘটনার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : তখন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। দক্ষিণেশ্বরে একদিন গিয়ে দেখলুম, নরেন্দ্রনাথ অনেক দিন আসেন নি বলে ঠাকুর বিশেষ উৎকণ্ঠিত হয়ে শুয়েছেন। সেদিন তাঁর মন যেন নরেন্দ্রময় হয়ে রয়েছে। মুখে নরেন্দ্রের গুণবাদ ভিন্ন আর কোন কথা নেই। আমাকে ডেকে বললেন, দেখ, নরেন্দ্র শুদ্ধ, সত্ত্বগুণী, আমি দেখেছি সে অখণ্ডের ঘরের চারজনের একজন এবং সপ্তর্ষির একজন। তার কত গুণ তার ইয়ত্তা হয় না। বলতে বলতে ঠাকুর নরেনকে দেখবার জন্যে একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন এবং পুত্রবিরহে মা যেমন কাতর হন তেমনি অজস্র অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। তারপর ঘরের উত্তর দিকের বারান্দায় চলে গিয়ে রুদ্ধস্বরে বারবার বলতে লাগলেন, মা, তাকে না দেখে আর যে থাকতে পারছি না! কিছুক্ষণ পরে নিজেকে কতকটা সংযত করে তিনি আমাদের কাছে এসে বসে করুণস্বরে বলতে লাগলেন, এত কাঁদলুম কিন্তু নরেন্দ্র ত এল না। তাকে একবার দেখবার জন্যে প্রাণে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে, বুকের ভিতরটা যেন মোচড় দিচ্ছে। কিন্তু আমার এই টানটা সে কিছু বোঝে না। বলতে বলতে আবার অস্থির হয়ে তিনি ঘরের বাইরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে এসে বলতে লাগলেন, বুড়ো মিনসে, তার জন্যে এই রকম অস্থির হয়েছি ও কাঁদছি দেখে লোকেই বা কি বলবে বল দেখি? তোমরা আপনার লোক, তোমাদের কাছে লজ্জা হয় না কিন্তু অপরে দেখে কি ভাববে বল দেখি? কিন্তু কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পাচ্ছি না। * *নরেন্দ্রের বিরহে ঠাকুরকে যেমন অধীর দেখেছি তাঁর সঙ্গে মিলনে আবার তেমনি উল্লসিত হতে দেখেছি। পূর্বোক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে ঠাকুরের জন্মতিথি দিবসে দক্ষিণেশ্বরে গেছলুম।

ভক্তগণ সেদিন তাঁকে নূতন বস্ত্র, সচন্দন পুষ্পমাল্যাদি পরিয়ে মনোহর সাজে সাজিয়েছিলেন। তাঁর ঘরের পূব দিকের বারান্দায় কীর্তন হচ্ছিল। ঠাকুর ভক্তগণ পরিবৃত হয়ে তা শুনতে শুনতে কখন ভাবাবিষ্ট হচ্ছিলেন, কখনবা এক একটি মধুর আঁখর দিয়ে কীর্তন জমিয়ে দিচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে চারি দিকে তাকিয়ে দেখে আমাদের বলছিলেন, তাই ত নরেন্দ্র এল না। বেলা প্রায় দুপুর। এমন সময় নরেন এসে সভামধ্যে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করলেন। তাঁকে দেখবামাত্র ঠাকুর একেবারে লাফিয়ে উঠে তাঁর কাঁধে বসে গভীর সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। পরে সহজ অবস্থা ফিরে এলে ঠাকুর নরেনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে তাঁকে খাওয়াতে লাগলেন। সেদিন আর তাঁর কীর্তন শোনা হল না।

শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বিন্দুমাত্র ঢাকঢাক ভাব ছিল না—বিশ্বসত্তায় তাঁর নিজের ব্যক্তিসত্তাকে সমর্পণ করেছিলেন। তাঁর মধ্যে কিছুমাত্র সাংসারিকতার সঙ্কীর্ণতা ছিল না। তাই মনে যে ভাবনা উঠত, বাইরে তা প্রকাশ করে ফেলতেন। নরেনের সম্বন্ধে তাঁর উচ্চ ধারণার কথা তিনি প্রায়ই ভক্তদের বলতেন। একদিন স্বামী সারদানন্দকে বলেছিলেন, নরেন্দ্রের মত একটি ছেলেকেও আর দেখতে পেলুম না। যেমন গাইতে বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি বলতে কইতে আবার তেমনি ধর্মবিষয়ে। সে রাত ভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁশ থাকে না। আমার নরেন্দ্রের ভিতর এতটুকু মেকি নেই। বাজিয়ে দেখ, টংটং করছে। আর সব ছেলেদের দেখি যেন চোখকান বুজে কোন রকমে দু-তিনটে পাশ করছে, বাস্ এই পর্যন্ত। এই করতেই যেন তাদের সমস্ত শক্তি বেরিয়ে গেছে। নরেন্দ্রের কিন্তু তা নয়। হেসে খেলে সব কাজ করে, পাশ করাটা যেন তার কাছে কিছুই নয়। সে ব্রাহ্মসমাজেও যায়, সেখানে ভজন গায়। কিন্তু অন্য ব্রাহ্মদের মত নয়, সে ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞানী। ধ্যান করতে বসে তার জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সাধে নরেন্দ্রকে এত ভালবাসি?

আর একদিনের কথা। সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কেশব ও বিজয় এসেছেন। নরেনও উপস্থিত আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরীয় আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বারবার তাঁদের তিনজনকে সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। সভা ভেঙে গেলে তিনি অন্তরঙ্গদের বললেন, কেশব যে রকম একটা শক্তির আধার হয়ে সারা জগতের গণ্যমান্য হয়েছে, নরেনের মধ্যে

দেখলুম তেমনি আঠারটা শক্তি রয়েছে। আবার দেখলুম, কেশববিজয়ের মধ্যে জ্ঞানের দীপ মিটমিট করে জলছে, নরেন্দ্রের মধ্যে একেবারে জ্ঞানসূর্য আলো দিচ্ছে।

দিব্যপুরুষ সেদিন নরেনের মধ্যে যে আগত অসামান্যকে দেখতে পেয়ে উল্লসিত হয়েছিলেন, নরেন নিজে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। এই অসম্ভব সম্ভাবনাকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। অথচ তাঁর হৃদয়ে এত দৃঢ়তা এবং সত্যনিষ্ঠা ছিল যে যা বিশ্বাসযোগ্য নয় তা যতই শ্রুতিমধুর হোক তা নিয়ে নিজেকে বা সঙ্গীদের ঠকাতে চাইতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে নিজের প্রশংসা শুনে তিনি বলেছিলেন, কি যে সব বলেন আপনি? লোকে আপনার ঐ সব কথা শুনে আপনাকে পাগল ভাববে। কোথায় পৃথিবীবিখ্যাত কেশবচন্দ্র আর মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ আর কোথায় আমার মত একজন নগণ্য ছোকরা!

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিরহঙ্করতা দেখে খুশী হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, তা কি করব বল্? তুই কি ভাবিস আমি ঐরূপ বলছি? মা যে আমাকে ঐরূপ দেখালেন, তাইত আমি বলছি। মা ত সত্য ছাড়া কখনও মিথ্যা দেখান নি, কি করে অবিশ্বাস করি বল্?

সংসারে এত বড় নিঃস্বার্থ ভালবাসা বিফল হতে পারে না। নরেন্দ্র এই দুশ্ছেদ্য বাঁধন থেকে শেষ পর্যন্ত নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন নি। ক্রমে তিনি মজে গেছলেন। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর আকর্ষণ তীব্র হয়ে উঠেছিল। তাঁকে কিছুদিন না দেখতে পেলে গুরুর প্রাণ যেমন আটুবাটু করত, তিনিও শ্রীরামকৃষ্ণকে কিছুদিন না দেখতে পেলে অজানা বিরহ আবেগে ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শেষে তাঁর জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলেন। ক্রমে তিনি প্রায় প্রতি সপ্তাহেই নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে আসতে আরম্ভ করেন। শিষ্যের অন্তরে অনুরাগের শিখা জলে উঠতে দেখে কৌশলী গুরু পরীক্ষা করে নিতে ছাড়েন নি। একবার নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে এসে গুরুকে আগের মত প্রণাম করে কাছে বসলেন। তখন গুরু আনন্দহাটে ভক্তদের নিয়ে মেতে রয়েছেন, তাঁর দিকে ফিরে তাকালেন না। নরেন্দ্র অবাক্ হয়ে গেলেন। অন্য অন্য দিন ত এ রকম হয় না। তাঁকে দেখবামাত্র গুরু সাগ্রহে এগিয়ে আসেন, আনন্দে ভাবাবিষ্ট হয়ে যান, কত যত্ন করেন, আদর করেন। আগের মত নরেন্দ্র সারাদিন দক্ষিণেশ্বরে কাটালেন কিন্তু গুরু একটি কথাও বললেন না, মুখ ফিরিয়ে রইলেন। বিষণ্ণ মনে তিনি বাড়ি ফিরে

গেলেন। সপ্তাহ শেষে আবার দক্ষিণেশ্বরে এলেন। গুরুর সেই এক উদাসীন ভাব, এদিনেও দুজনের মধ্যে কোন কথা হল না। এমনি ভাবে নরেন আরও দুদিন এলেন কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কোন ভাবান্তর হল না। তিনি আবার ফিরে গেলেন,—মনে তাঁর দুঃসহ আবেগ। পরম জনের সঙ্গে হারের খেলা খেলতেও মধুর লাগে। ব্যথা দিয়ে কি ভক্তের হৃদয়ের ভক্তিদীপ নেবানো যায়!

উদাসীনতার ছদ্ম আবরণে শ্রীরামকৃষ্ণ সবই কৌশলে লক্ষ্য করেন। প্রিয়জনকে ব্যথা দেবার যন্ত্রণায় তাঁরও ভিতরটা বিচলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু নিজের সাফল্য দেখে আবার খুশীও হন। এতদিনে চাতক মেঘ চিনেছে, আর তাকে হারাবার ভয় নেই। হাওয়া খুঁজে পেয়েছে বনের ভিতরে ফোটা ফুলের সন্ধান। আজ এক অন্যের কাছে বাঁধা পড়েছেন।

এই ভাবে মাসখানেক কেটে গেল। একদিন অভ্যাসমত যথাসময়ে নরেন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ডেকে বললেন, আচ্ছা, আমি ত তোর সঙ্গে একটা কথাও বলি না। তবু তুই কি করতে এখানে আসিস বল্‌ত?

শিষ্য উত্তর দিলেন, আমি কি আপনার কথা শুনতে এখানে আসি? আপনাকে ভালবাসি, দেখতে ইচ্ছে করে তাই আসি।

প্রেমাস্পদকে চাওয়ার চেয়ে প্রেমিকের আর কি বড় চাওয়া আছে! শিষ্যের উত্তরে সেই তত্ত্বই ফুটে উঠল দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ খুব খুশী হলেন। বললেন, আমি তোকে বিড়ে দেখছিলুম, আদর যত্ন না পেলে তুই পালাস কি না। তোর মত আধারই এতটা অবজ্ঞা সহ্য করতে পারে। অপরে এতদিন কোন্ কালে পালিয়ে যেত, এদিকের ছায়া আর মাড়াত না।

বিদ্রোহী নরেন্দ্রনাথ জাদুকরের ভালবাসায় মজলেন তবু নিজের বিচারের পথ ত্যাগ করলেন না। নিজে সত্য বলে না বুঝলে কোন মত গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। একদিন গুরু বললেন, তুই যদি মনে করিস্ কৃষ্ণকে হৃদয় মধ্যে দেখতে পাস। নরেন্দ্র তখনও সাকার উপাসনার সত্যরূপটি যুক্তির পথে ধরতে পারেন নি। তিনি জবাব দিলেন, ও সব কিষ্টফিষ্ট আমি মানি না। আর একদিন এমনি একটি ঘটনা হল। গুরু প্রায়ই শিষ্যকে বলতেন মা এই দেখিয়ে দিলেন, এই কথা বললেন। নরেন সেদিন স্পষ্টভাষায় নিজের সংশয় জ্ঞাপন করলেন, বললেন, আপনি রূপটুপ যা দেখেন ও সব মনের ভুল।

—সে কি রে, কথা কয় যে!

—ও অমন হয়। এই বলে নরেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে যে সব আত্ম-সম্মোহনের সাধারণ দৃষ্টান্ত আছে তার কিছু কিছু তাঁকে গল্প করে বললেন।

এমন দৃঢ়তার সঙ্গে আর কখন কেউ শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শন সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেন নি। নরেন্দ্রর উপর এমনই তাঁর দ্বিধাহীন বিশ্বাস যে তিনি নরেন্দ্রের কথা বাজে বলে উপেক্ষা করলেন না। ছোট ছেলের মত সরল অন্তরে ভাবমুখে জগদম্বাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মা, নরেন্দ্র এই সব কথা বলেছে, তবে কি যা দেখি সব ভুল?

জগদম্বার কাছ থেকে শেষে আশ্বাস পেলেন। উত্তর এল, ও সব সত্য। নরেন্দ্রের কথা শুনিস কেন? কিছু দিন পরে ও সব সত্য বলে মানবে।

তখন তিনি নরেনকে বললেন, শালা, তুই আমার অবিশ্বাস করে দিয়েছিলি! তুই আর এখানে আসিস নাই।

নরেন্দ্রের সম্বন্ধে সেদিনকার ভবিষ্যৎ বাণী কিছু দিন পরে সত্যিই সফল হয়েছিল। বাবার হঠাৎ একদিন মৃত্যু হল, নরেনদের সংসারে বিপর্যয় ঘটে গেল। বিশ্বনাথের ভাল আয় ছিল কিন্তু আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি করতেন, ফলে পরিবারের জন্য কোন ভবিষ্যৎ সংস্থান করে যেতে পারেন নি। সুযোগ পেয়ে আত্মীয়েরা সম্পত্তি কেড়ে নেবার কুউদ্দেশ্যে মোকদ্দমা করলেন। কলেজের ছাত্র নরেন পড়া ছেড়ে সামান্য চাকরির আশায় দরজায় দরজায় ধন্না দিতে লাগলেন। তবু বিশেষ কোন সুবিধা হল না। এমনি দুঃখ দারিদ্র্য ও অবসাদের মধ্যে একদিন হঠাৎ তাঁর মনে হল, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যদি তাঁর মাকে বলেন তাহলে ত সহজেই তাঁদের দুর্দশার শেষ হয়। নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে এলে গুরুকে মনের কথা জানালেন।

গুরু বললেন, ওরে, আমি যে ও সব কথা বলতে পারি না। তুই জানা না কেন?

—আমি ত মাকে জানি না। আপনি আমার জন্যে মাকে বলুন। বলতেই হবে, আজ কিছুতেই ছাড়ব না।

পরম কারুণিক গদগদ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, ওরে, আমি যে কতবার বলেছি মা, নরেন্দ্রের দুঃখকষ্ট দূর কর। তুই মাকে মানিস না, সেই জন্যই ত মা শোনে না। আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার। আমি বলছি আজ রাতে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি মা তোকে তাই দেবেন। মা আমার

চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি, ইচ্ছেয় জগৎ প্রসব করেছেন। তিনি ইচ্ছে করলে কি না করতে পারেন!

গুরুর গভীর আবেগভরা কথা শুনে সংশয়ী নরেনের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হল, আজ তাঁর সকল দুর্গতির অবসান হবেই হবে। তিনি একান্ত উদ্বেগে রাতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। যথাসময়ে মার মন্দিরের দিকে যাত্রা করলেন। একটা অজানা গাঢ় নেশায় মনপ্রাণ আচ্ছন্ন, আবেগে তাঁর পা টলতে লাগল। বিশ্বজননীর সঙ্গে আজ প্রত্যক্ষ দেখা হবে,—কত যুগ যুগ ধরে কঠিন তপ করেও যাঁকে মহাতাপসেরা লাভ করতে পারেন না সেই অমৃত উৎস আজ তাঁর জীবনকে ভরিয়ে দেবে। তন্ময় চিত্তে নরেন বিশ্বজননীর কথা ভাবতে ভাবতে কালীঘরে গিয়ে হাজির হলেন। প্রতিমার দিকে দৃষ্টি দেবামাত্র হঠাৎ যেন তাঁর মনে হল সত্যিই মা চিন্ময়ী, জাগ্রতা; তা না হলে কোথা থেকে এল এই অনন্ত প্রেমসৌন্দর্যের অদ্ভুত দীপ্তি! ভক্তিপ্রেমে উচ্ছ্বসিত নরেন বিহ্বলভাবে বারবার বলতে লাগলেন, মা, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, যাতে নিত্য তোমার দর্শন পাই এমনি করে দাও।

শিষ্যকে মন্দির থেকে ফিরতে দেখে গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে, মার কাছে সংসারের অভাবের কথা বলেছিস্?

শিষ্য চমকে উঠলেন, কই সে কথা ত মাকে বলা হয় নি!

গুরু আভাসে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বললেন, যা, যা, ফের যা। গিয়ে ও কথা জানিয়ে আয়।

দ্বিতীয় বারও সেই ভুল। গুরু বললেন, দূর ছোঁড়া, নিজেকে একটু সামলে ঐ প্রার্থনাটা জানাতে পারলি না? পারিস ত আর একবার গিয়ে কথাগুলো জানিয়ে আয়।

নরেন্দ্র সতর্ক মনে পুনরায় কালীঘরে ঢুকলেন। ঢোকা মাত্র আবার বিহ্বলতা এল, দারুন লজ্জা এসে সব সাংসারিক উন্নতির চিন্তা ঢেকে দিলে। মার কাছে একি তুচ্ছ কথা বলতে আসা! যাঁর কাছ থেকে রাজার আনন্দ লাভ করা যায় তাঁর কাছে এসে লাউকুমড়ো ভিক্ষে করা! নরেন বারবার ব্যাকুলভাবে মা, মা, বলে ডাকতে লাগলেন। করুণ প্রার্থনা জানাতে লাগলেন, আর কিছু চাই না মা, কেবল জ্ঞানভক্তি দাও।

এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতায় নরেন্দ্রের প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে সব সংস্কার ভেঙে গেল। তিনি অনেক ক্ষণ মহানন্দে মন্দিরে কাটিয়ে বেরিয়ে এলেন। গুরুকে

এসে বললেন, আমাকে মার গান শিখিয়ে দিন। শ্রীরামকৃষ্ণ "আমার মা ত্বংহি তারা, তুমি ত্রিগুণধারা পরাৎপরা" গানটি শিখিয়ে দিলেন। তারপর নরেন গুরুকে ধরে বসলেন, কালীঘরে আদত কথা বলতে আপনিই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছেন। এখন আপনাকে বলতে হবে আমার মা ভাইবোনদের দুবেলা খাবার কোন অভাব থাকবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, ওরে আমি যে কারও জন্যে ও রকম প্রার্থনা করতে পারি নাই। আমার মুখ দিয়ে যে ও কথা বার হয় না। তোকে বললুম, আজ মার কাছে যা চাইবি তা পাবি। তা তোর অদৃষ্টে সংসারসুখ নেই, আমি কি করব-!

—তা শুনব না। আপনাকে বলতেই হবে। আপনি বললেই ওদের আর কষ্ট থাকবে না।

—আচ্ছা, যা। তাদের মোটা ভাতকাপড়ের কখনও অভাব হবে না।

নরেন নিশ্চিন্ত হলেন। তখন মাভাইবোনদের চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সারা রাত নতুনশেখা গানটি গেয়ে বিশ্বজননীর মহিমা কীর্তন করে কাটিয়ে দিলেন।

এ দিনের এই জয়ে পরমহংস খুব উল্লসিত হয়েছিলেন। পরের দিন দুপুরে কয়েকজন ভক্ত এসে দেখেন তিনি ঘরে একা আর নরেন্দ্র বাইরে ঘুমিয়ে আছেন। ভক্তদের দেখে পরমহংস বালকের মত আনন্দে গদগদচিত্ত হয়ে বলতে লাগলেন, ওরে দেখ, ঐ ছেলেটি বড় ভাল, ছেলেটির নাম নরেন্দ্র। আগে মাকে মানত না, কাল মেনেছে। কষ্টে পড়েছে, তাই মার কাছে টাকাকড়ি চাইবার কথা বলে দিয়েছিলুম, তা কিন্তু চাইতে পারলে না। বলে, লজ্জা করলে।

তারপর অন্য দুএকটি প্রসঙ্গ শেষ করে কিছুক্ষণ বাদে আবার বললেন, নরেন্দ্র মাকে মেনেছে! বেশ হয়েছে, কেমন? বিকেলে নরেন ঘুম থেকে উঠে এসে ঘরের ভিতরে বসলেন। তাঁকে দেখামাত্র পরমহংস ভাবাবিষ্ট হয়ে তাঁর গা ঘেঁসে কোলের কাছে বসে পড়লেন, বলতে লাগলেন, দেখছি কি, এটাও আমি আবার ওটাও আমি। সত্যি বলছি, কিছুই তফাত বুঝতে পারছি না। যেমন গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফেলায় দুটো ভাগ দেখাচ্ছে, সত্যি সত্যি কিন্তু ভাগাভাগি নেই, একটাই রয়েছে। তা মা ছাড়া আর কি আছে বল?

কথা এমনি ভাবে এগিয়ে চলল। ভক্তেরা অবাক্। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ আধাভাবাবিষ্ট অবস্থায় তিনি বললেন, তামাক খাব।

ভক্ত বৈকুণ্ঠনাথ তাড়াতাড়ি তামাক সেজে হুঁকোটি তাঁর হাতে দিলেন। দুএক টান দিয়ে পরমহংস কলকেটি খুলে নিয়ে হাতে জড়িয়ে তামাক খেতে চেষ্টা করলেন তারপর সেইভাবে নরেনের মুখের কাছে ধরে বললেন, খা, আমার হাতেই তুই খা।

নরেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। তা দেখে তিনি বলতে লাগলেন, তোর ত ভারি হীনবুদ্ধি, তুই আমি কি আলাদা? এটাও আমি, ওটাও আমি।

অবতারবাদ সম্বন্ধে নরেনের বিরূপতা ছিল আরও কঠিন। যিনি অবাঙ্মনসোগোচরম্ তিনি আবার মানুষের দেহধারণ করে পৃথিবীতে আসবেন কি! এই তাঁর ধারণা। বারেবারেই তিনি গিরিশের সঙ্গে অবতার সম্বন্ধে তর্ক করেছেন, নিজের অবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন। তা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ কোন দিন হতাশ হন নি। তিনি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে জানতেন। নরেনের কোন সংস্কারকেই তিনি জোর করে দূর করবার চেষ্টা করতেন না, সহজ পথে তাঁর অন্তরের আধ্যাত্মিকতা যাতে বিকশিত হয় সেই চেষ্টা করতেন। একদিনের একটি ঘটনায় তাঁর সেই চেষ্টার চমৎকার ছবি ফুটে উঠেছে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। মার্চ মাস। গিরিশের বাড়িতে পরমহংস অন্তরঙ্গদের সঙ্গে আনন্দ উৎসব জমিয়ে তুলেছেন। তাঁর ইঙ্গিতে গিরিশ নরেনের সঙ্গে অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার শুরু করলেন। নরেন উত্তরে বললেন, ঈশ্বর অনন্ত। তাঁকে ধারণা করা আমাদের সাধ্য কি? তিনি সকলের ভিতরেই আছেন। শুধু একজনের ভিতরে এসেছেন তা ঠিক নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের লক্ষ্য করে সস্নেহে বললেন, ওর যা মত আমারও তাই মত। তিনি সর্বত্র আছেন। তবে একটা কথা আছে, শক্তি বিশেষ। কোনখানে অবিদ্যাশক্তির প্রকাশ কোনখানে বিদ্যাশক্তির। কোন আধারে শক্তি বেশি, কোন আধারে শক্তি কম। তাই সব মানুষ সমান নয়।

গিরিশ ও নরেনের তর্কালোচনা শেষে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতামতের বিচারে ঘোরতর হয়ে উঠল। শ্রীরামকৃষ্ণ সে প্রসঙ্গ পছন্দ করলেন না। তিনি মূল প্রশ্নের মধ্যে বিচারকে ফিরিয়ে আনবার জন্য বললেন, বেদান্তে শঙ্কর যা বুঝিয়েছে তাও আছে। আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত বাদও আছে।

নরেন জিজ্ঞাসা করলেন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কি?

—বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ আছে—রামানুজের মত। কি না জগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। সব জড়িয়ে একটি। যেমন একটি বেল। একজন খোলা আলাদা, বীজ আলাদা আর শাঁস আলাদা করেছিল। বেলটি কত ওজনের জানবার দরকার হয়েছিল। এখন শুধু শাঁস ওজন করলে কি বেলের ওজন পাওয়া যায়? খোলা বীচি শাঁস সব এক সঙ্গে ওজন করতে হবে। প্রথমে খোলা নয়, বীচি নয়, শাঁসটাই সার পদার্থ বলে বোধ হয়। তারপর বিচার করে দেখে, যা বস্তুর শাঁস তাই বস্তুর খোলা আর বীচি। আগে নেতি নেতি করে যেতে হয়। জীব নেতি, জগৎ নেতি, এইরূপ বিচার করতে হয়। ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু। তারপর অনুভব হয়, যার শাঁস তারই খোলা বীচি। যা থেকে ব্রহ্ম বলছ তা থেকেই জীবজগৎ। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। তাই রামানুজ বলতেন জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। এরই নাম বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ।

একটু থেমে তিনি বলতে লাগলেন, আমি তাই দেখছি সাক্ষাৎ আর কি বিচার করব? দেখছি, তিনিই এসব হয়েছেন। তিনি জীব ও জগৎ হয়েছেন। * * * দেখেছি, বিচার করে এক রকম জানা যায় আবার তাঁকে ধ্যান করে এক রকম জানা যায়। আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন সে এক! তিনি যদি দেখিয়ে দেন এর নাম অবতার,—তিনি যদি তাঁর মানুষলীলা দেখিয়ে দেন, তাহলে আর বিচার করতে হয় না, কারোকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। কি রকম জান? যেমন অন্ধকারের ভেতর দেশলাই ঘসতে ঘসতে দপ্ করে আলো হয়। সেই রকম দপ্ করে আলো যদি তিনি দেন তাহলে সব সন্দেহ মিটে যায়। এরূপ বিচার করে কি তাঁকে জানা যায়?

পরমহংস নরেনকে ডেকে কাছে বসিয়ে সস্নেহে আদর করতে লাগলেন। কৌশলে তিনি ইঙ্গিত করছেন, এসব বিষয়ে শুধু যুক্তিপথে বিচার করে কোন পরম সত্যে পৌছানো যায় না, সকলের আগে চাই অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান।

নরেন সেই ইঙ্গিত বুঝতে পেরে বললেন, কই, কালীর ধ্যান তিন চার দিন করলুম, কিছুই ত হল না!

—ক্রমে হবে! কালী আর কেউ নয়, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী।

নরেন অবতার মানেন না তাতে তাঁর প্রতি পরমহংসের অতল ভালবাসার কোন তারতম্য নেই। তিনি শিষ্যকে এক দৃষ্টে দেখতে দেখতে হঠাৎ আরও কাছে সরে বসে গায়ে হাত বুলুতে বুলুতে বললেন, মান করলি ত করলি, আমরাও তোর মানে আছি। তারপর আবার বিচারের পথে ঈশ্বরলাভ

সম্বন্ধে শুরু করলেন: যতক্ষণ বিচার ততক্ষণ তাঁকে পায় নাই। তোমরা বিচার করছিলে আমার ভাল লাগে নাই। নিমন্ত্রণ বাড়ির শব্দ কতক্ষণ শোনা যায়? যতক্ষণ লোক খেতে না বসে। যাই লুচি তরকারি পড়ে বার আনা শব্দ কমে যায়। অন্য খাবার পড়লে আরও কমতে থাকে। দই পাতে পড়লে কেবল সুপ্‌সাপ্। ক্রমে খাওয়া হয়ে গেলে ঘুম। ঈশ্বরকে যত লাভ হবে ততই বিচার কমবে। তাঁকে লাভ হলে আর শব্দ বিচার থাকে না। তখন ঘুম—সমাধি।

তিনি নরেনের গায়ে সযত্নে হাত বুলুতে বুলুতে বলতে লাগলেন, হরি ওম্, হরি ওম্, হরি ওম্। ক্রমে তাঁর মন বাইরের জগৎ থেকে লুপ্ত হয়ে গেল। আধা বাহ্যদশায় নরেনের পায়ের উপর হাত রাখলেন। আবার গায়ে হাত বুলুচ্ছেন। দেখতে দেখতে আবার ভাবান্তর হল। তিনি হাত জোড় করে নরেনকে বললেন, একটা গান গা, তাহলে ভাল হব। উঠতে পারব কেমন করে? গোরা প্রেমে গর্গর মাতোয়ারা নিতাই আমার—।

চিত্রপুত্তলিকার মত আবার চুপ করে রয়েছেন। হয়ত নরেনের উপর তাঁর ভালবাসার কথা ভাবতে গিয়ে গৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণরাধার প্রেমের অনুভূতির সূক্ষ্ম তরঙ্গ তাঁর অন্তর জগতে প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি ভাবে মাতোয়ারা হয়ে আবার বললেন, দেখিস্ রাই, যমুনায় পড়ে যাবি, কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী —।

তাঁর মন ক্রমে আরও উচ্চে বিলীন হয়ে গেল। "সখি, সে বন কতদূর—যে বনে আমার শ্যামসুন্দর?" বলতে বলতে তিনি সমাধিস্থ। নরেন্দ্র সামনে বসে কিন্তু নরেন্দ্রেতে আর তাঁর মন নেই। এখন ভগবানে তাঁর মন তদ্গত হয়েছে। স্পন্দহীন দেহ। চোখে নেই পলক।

নরেন্দ্রকে আপন পথের পথিক করার জন্য পরমহংস একান্ত ধৈর্যে তাঁর মধ্যে পরিবর্তন জাগাবার চেষ্টা করতেন। সেই বিশাল ধৈর্যের সুফল একদিন ফলেছিল। এ ঘটনার কয়েক বছর পরে নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতারশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করে তাঁর পূজার প্রণাম মন্ত্র রচনা করেছিলেন:

স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

প্রিয় শিষ্যকে শিক্ষা দেবার কাজে কখন কখন শ্রীরামকৃষ্ণ ধৈর্য ধরে শুভক্ষণের আশায় বসে থাকতেন না, তাঁর তীক্ষ্ণ শক্তিশালী চিত্তকে ঘা দিয়ে জাগাবার চেষ্টা করতেন। তিনি প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন, নরেনের যুক্তিবাদী,

তেজস্বী, পৌরুষভরা সত্তা অদ্বৈত বিজ্ঞানের উপযুক্ত আধার। তাই গোড়া থেকেই অদ্বৈত তত্ত্বের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করতেন। ব্রাহ্ম-প্রভাবে অনুপ্রাণিত নরেন প্রথম প্রথম কিছুতেই অদ্বৈত বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে পারতেন না। একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বিশেষভাবে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সম্বন্ধে নানা কথা বললেন। আলোচনার ফাঁকে এক সময় নরেন বাইরের বারন্দায় গিয়ে কালীবাড়ির কর্মচারী হাজরার সঙ্গে তামাক খেতে লাগলেন। মাথায় তখন তাঁর চলছে অদ্বৈত তত্ত্বের বিচার। হাজরার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে করতে দুজনে হাসাহাসি করতে শুরু করলেন। অদ্বৈত তত্ত্বকে ব্যঙ্গ করে তিনি বারবার বলতে লাগলেন, তা কি কখন হয়? যদি সবই ভগবান, তাহলে ঘটিটাও ভগবান বাটিটাও ভগবান। আর যা কিছু দেখছি তা সব এবং আমরা সকলে ভগবান।

ঘর থেকে পরমহংস তাঁদের হাসির রোল শুনতে পেয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। তিনি ভাবাবিষ্ট অবস্থায় পরনের ধুতিখানি বগলে নিয়ে বাইরে এসে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, তোরা কি বলাবলি করছিস রে? তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করে এগিয়ে এসে হঠাৎ নরেন্দ্রকে স্পর্শ করে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। জাদুকরের বিদ্যুৎ স্পর্শে মুহূর্ত মধ্যে নরেনের ভিতরে ভয়ঙ্কর ভাবান্তর হয়ে গেল। "স্তম্ভিত হয়ে সত্যিসত্যিই দেখতে লাগলুম, ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নেই। এ ভাব দেখে চুপ করে রইলুম, ভাবলুম দেখি কতক্ষণ পর্যন্ত এ ভাব থাকে। কিন্তু সে ঘোর সেদিন কিছুমাত্র কমল না। বাড়িতে ফিরলুম, সেখানেও তাই—যা কিছু দেখতে লাগলুম সবই তিনি এই বোধ হতে লাগল। খেতে বসলুম, দেখি অন্ন, থাল যিনি পরিবেশন করছেন সে সকলই এবং আমি নিজেও তিনি ভিন্ন আর কেউ নয়। দু এক গ্রাস খেয়ে স্থির হয়ে বসে রইলুম। মা বললেন, বসে আছিস কেন রে খা না। তাঁর কথায় হুঁশ হল, আবার খেতে আরম্ভ করলুম। খেতে শুতে কলেজে যেতে সকল সময়েই ঐ রকম দেখতে লাগলুম, কেমন যেন একটা ঘোর আচ্ছন্ন হয়ে রইলুম। রাস্তায় চলেছি, গাড়ি আসছে দেখছি কিন্তু তা ঘাড়ে এসে পড়বার ভয়ে সরে যাবার প্রবৃত্তি হত না। মনে হত, ও যা আমিও তা। এ সময়ে হাত পা সব সময়ে অসাড় হয়ে থাকত, খেয়ে কিছুমাত্র তৃপ্তি হত না। মনে হত যেন অপর কেউ খাচ্ছে। খেতে খেতে সময়ে সময়ে শুয়ে পড়তুম, কিছুক্ষণ পরে উঠে আবার খেতে থাকতুম। এক একদিন এইভাবে অনেক

বেশি খাওয়া হয়ে যেত। কিন্তু তার জন্যে কোন অসুখ হত না। মা সব দেখে ভয় পেয়ে বলতেন, তোর দেখছি ভেতরে ভেতরে একটা বিষম অসুখ হয়েছে। কখন কখন বলতেন, ও আর বাঁচবে না। যখন আচ্ছন্ন ভাবটা একটু কমে যেত তখন জগৎটাকে স্বপ্ন বলে মনে হত। হেদুয়ার বাগানে বেড়াতে গিয়ে চারপাশের লোহার বেড়ায় মাথা ঠুকে দেখতুম, যা দেখছি তা স্বপ্নের রেলিং না সত্যিকার। * * * যখন প্রকৃতিস্থ হলুম তখন ভাবলুম এই অদ্বৈত বিজ্ঞানের আভাস! তবে ত শাস্ত্রে ঐ বিষয়ে যা লেখা আছে তা মিথ্যা নয়। তখন থেকে আর অদ্বৈততত্ত্বের ওপরে কখন সন্দিহান হতে পারি নি।"

গুরুর দিব্য সংস্পর্শ ও বিচিত্র শিক্ষার ফলে নরেনের অন্তরের বিদ্রোহভাব ক্রমে লুপ্ত হয়ে এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বোধশক্তি বিকশিত হয়ে উঠেছিল। তার ফলে গুরুর শেখানো নানা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের গভীরে ডুব দেবার দক্ষতা যেমন তাঁর হয়েছিল তেমনি গুরুর নব নব ভাবধারার মধ্যে তিনি অভিনব সত্যের সন্ধান পেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের যে কথার মধ্যে অপরে ভাসাভাসা একটা মানে বুঝতেন নরেনের মনের উর্বর ও বিস্তৃত পট-ভূমিতে সেইকথা সম্পূর্ণ নতুন দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। দক্ষিণেশ্বরের ঘরে পরমহংস ভক্ত সঙ্গে সদ্ আলোচনায় ব্যাপৃত। ভক্ত-মণ্ডলীতে নরেন্দ্রও আছেন। নানা গভীর ও রঙ্গরসের সমাবেশে অপূর্ব তত্ত্বের কথা আপনা থেকে উৎসরিত হয়ে উঠছে। ভক্তেরা সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনছেন। মাঝে মাঝে হাসি ঠাট্টায় গভীরতায় পরিমণ্ডল বিচিত্র আকর্ষণে ভরে উঠছে। কথা প্রসঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের কথা উঠল। পরমহংস বৈষ্ণবমতের সারমর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করে বললেন, তিনটি বিষয় পালন করবার জন্যে নিরন্তর যত্নবান্ থাকতে ঐ মতে বলে, নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণবপূজন। যেই নাম সেই ঈশ্বর, নাম নামী অভেদ জেনে সর্বদা অনুরাগের সঙ্গে নাম করবে। ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জেনে সর্বদা সাধুভক্তদের শ্রদ্ধা, পূজা ও বন্দনা করবে। আর কৃষ্ণেরই জগৎ সংসার একথা হৃদয়ে ধারণ করে সর্বজীবে দয়া—

শেষ শব্দটি উচ্চারণ করতে না করতেই পরমহংস সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে গেল। শেষে আধা বাহ্যদশায় নেমে এল তাঁর মন। তিনি আবার বলতে লাগলেন, জীবে দয়া? দূর শালা। কীটানুকীট তুই,

জীবকে দয়া করবি ? দয়া করবার তুই কে ? না, না, জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।

প্রতিদিনের মত সেদিনও কথার শেষে প্রাণমাতানো ভজনসঙ্গীতে আনন্দমণ্ডল ঘনীভূত হয়ে উঠল। ভক্তদের হৃদয় মাতোয়ারা। জ্ঞানের সূর্যকে তাঁরা কাছে পেয়েছেন, তাঁর দীপ্তিতে তাঁরা সকলেই ভরপুর। কিন্তু সূর্যের আলো ত জল, কাঁচ, মাটি, পাথর—পৃথিবীর সব বস্তুতেই এসে পড়ে, তবু তার সব চেয়ে গভীর খেলা দুর্লভ মণির বুকেই। পরমহংসের যে কথা অপর ভক্তদের চিত্তে অভ্যস্ত আবেগ ছাড়া আর কোন সাড়া জাগাতে পারলে না, নরেন তাঁর মধ্যে পেলেন শ্রেষ্ঠ সত্যের সন্ধান। পরমহংসদেবের ভাবভঙ্গের পর বাইরে গিয়ে তিনি একটা অভিনব লাভের আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে লাগলেন, কি অদ্ভুত আলোক আজ ঠাকুরের কথায় দেখতে পেলুম। শুষ্ক, কঠোর, নির্মম বলে বিখ্যাত বেদান্তজ্ঞানকে ভক্তির সঙ্গে মিলিত করে কি সহজ, সরস ও মধুর আলোকই না তিনি দেখালেন! অদ্বৈত জ্ঞান পেতে হলে সংসার ও লোকসঙ্গ সর্বরূপে বর্জন করে বনে যেতে হবে,—ভক্তিভালবাসা প্রভৃতি কোমলভাবগুলোকে ভেতর থেকে সবলে উপড়ে চিরকালের মত দূরে ফেলে দিতে হবে, এই কথাই এত কাল শুনে এসেছি। ফলে ঐভাবে অদ্বৈতলাভ করতে গিয়ে জগৎসংসার ও তন্মধ্যগত প্রত্যেক লোককে ধর্মপথের অন্তরায় জেনে তাদের উপর ঘৃণার ভাব জাগিয়ে তোলার জন্য সাধকের পক্ষে বিপথে যাবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যা বললেন, তাতে বোঝা গেল, বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে তাকে অবলম্বন করতে পারা যায়। মানুষ যা করছে, সে সবই করুক, তাতে ক্ষতি নেই। কেবল প্রাণে প্রাণে এই কথা সকলের আগে বিশ্বাস ও ধারণা করলেই হল, ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে তার সামনে প্রকাশিত রয়েছেন। জীবনের প্রতি মুহূর্তে সে যাদের সম্পর্কে আসছে, যাদের ভালবাসছে, যাদের শ্রদ্ধা, সম্মান বা দয়া করছে তারা সকলেই তাঁর অংশ—তিনি। সংসারের সকল লোককে যদি ঐভাবে শিবজ্ঞান করতে পারে তাহলে আপনাকে বড় ভেবে তাদের উপর রাগ, দ্বেষ, দম্ভ বা দয়া করবার আর অবসর কোথা ? ঐভাবে শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করতে করতে চিত্তশুদ্ধ হয়ে সে অল্পকালের মধ্যে আপনাকেও চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাব ভেবে ধারণা করতে পারে। * * * ঠাকুরের ঐ কথায় ভক্তিপথেও বিশেষ আলোক

দেখতে পাওয়া যায়। সর্বভূতে ঈশ্বরকে যতদিন না দেখতে পাওয়া যায় ততদিন যথার্থ ভক্তি বা পরাভক্তি লাভ সাধকের পক্ষে সুদূর পরাহত থাকে। শিব বা নারায়ণ জ্ঞানে জীবের সেবা করলে ঈশ্বরকে সকলের ভেতর দর্শনপূর্বক যথার্থ ভক্তিলাভে ভক্তসাধক অল্পদিনেই কৃতকৃতার্থ হবে, একথা বলা বাহুল্য। কর্ম ও রাজযোগ অবলম্বনে যে সকল সাধক এগিয়ে চলেছে তারাও ঐ কথায় বিশেষ আলো পাবে। কারণ কর্ম না করে দেহী যখন এক দণ্ডও থাকতে পারে না তখন শিবজ্ঞানে জীবসেবারূপ কর্মানুষ্ঠানই যে কর্তব্য এবং তা করলেই তারা তাড়াতাড়ি লক্ষ্যে পৌছবে, একথা বলতে হবে না। যাহোক, ভগবান যদি দিন দেন ত আজ যা শুনলুম এই অদ্ভুত সত্য সংসারের সর্বত্র প্রচার করব, পণ্ডিতমূর্খ, ধনীদরিদ্র, ব্রাহ্মণচণ্ডাল—সকলকে শুনিয়ে মোহিত করব।

শিবজ্ঞানে জীবের সেবা—এই তত্ত্বই জ্ঞানযোগী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সকল কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে মূল সত্যরূপে ফুটে উঠেছে। কর্মযোগী, ভক্তিপন্থী বিবেকানন্দের জীবনেও পরে এই সত্যলাভই তাঁকে গুরুর চেয়ে আরও গভীর উদ্যোগে কর্মব্রতে অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু তখনও নরেন্দ্রের মহাজীবনে প্রস্তুতির কাল। গুরুর মুখে এই অভিনব তত্ত্বটি শুনে তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বটে কিন্তু সে তত্ত্ব ব্যক্তিজীবনে সত্যরূপে ফুটে না উঠলে 'ত সত্যিকার কোন পাওয়া হল না। সেই সত্যলাভের জন্য তাঁকে যে ঘর ছেড়ে পথে নামতে হবে,—সংসারের সকল ভোগের আশা নিঃশেষে পুড়িয়ে দিয়ে নতুন আশায় বুক বাঁধতে হবে। তাঁর অন্তরে মানুষের আসনে মহামানুষকে জাগিয়ে তুলতে হবে। সে পথ শাণিত অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধারের মত দুরতিক্রমণীয়। সে জয়যাত্রা বড় দুঃখের—বড় বেদনার। দক্ষিণেশ্বরের জাদুকর নরেন্দ্রের অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে সেই পথেই তাঁকে আকর্ষণ করছিলেন। সে আকর্ষণের কাজ বড় অদ্ভুত। নিজের প্রচণ্ড শক্তিবলে নরেন্দ্রের ভিতরের সবশক্তি নিঃশেষে কেড়ে নিয়ে দুর্বল অভিভূতের মত তাঁকে আপন পথে পরিচালিত করেন নি। মহাদাতা ধীরে ধীরে নিজেকে নিঃশেষে দান করেছিলেন নরেন্দ্রের সত্তার মধ্যে। তাই এই আকর্ষণের ফলে নরেন্দ্র কিছুই হারান নি, বরং পরম সম্পদে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ঐশ্বর্যবান্। এই আশ্চর্য দানের শেষ পর্ব বড় করুণ।

জাদুকরের বাজল ভেরী

পরমহংসদেবের দিব্যজীবন বিলোনোর কাজ ক্রমশঃই বিস্তৃত হয়ে উঠল। মুক্তিকামী রবাহুতের নিত্য নতুন দল তৃষিত হৃদয়ে দক্ষিণেশ্বরে ছুটে আসতে লাগল। মহাদাতার ভালবাসার হাটে যে আসে সেই কোন না কোন ভাবে মজে। যে যেমন অধিকারী তেমনি মাপের দুর্লভ ধন সওদা করে যায়। গভীর বনে ফুল ফুটেছে, গন্ধ পেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি ছুটে আসে মধুলোভে।

নিত্য লোকসমাগম আর কথা বলা। সময়ে খাওয়া নেই, উপযুক্ত বিশ্রাম নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের স্বাস্থ্য কোনদিন বিশেষ দৃঢ় ছিল না। অবিরত কঠোর পরিশ্রমের ফলে ক্রমে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ল। অবসাদের ক্ষণে কয়েকবার তিনি মাকে জানালেন, যত সব এঁদো লোককে এখানে আনবি, এক সের দুধে একেবারে পাঁচ সের জল, ফুঁদিয়ে জাল ঠেলতে ঠেলতে আমার চোখ গেল, হাড় মাটি হল, অত করতে আমি পারব না, তোর শখ থাকে তুই করগে যা। ভাল লোক সব নিয়ে আয় যাদের দু এক কথা বলে দিলেই (চৈতন্য) হবে।

কিন্তু তা ক্ষণিকের মানসিক অবসাদ। পরম করুণাময় শরীরের ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিত্য নব উৎসব জমিয়ে আপন মহাব্রতের কাজে ডুবে রইলেন। এইভাবে দিন যায়।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস। গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড গরমে গুরুর যাতে কষ্ট না হয় তাই ভক্তেরা প্রায়ই তাঁর সেবার জন্য বরফ আনতে লাগলেন। পরমহংসদেব বরফ দেওয়া ঠাণ্ডা শরবত প্রভৃতি খেয়ে ছোট ছেলের মত খুব আনন্দ করতে লাগলেন। কিন্তু দু-একমাস পরে হঠাৎ তাঁর গলায় ভীষণ ব্যথা হল। কয়েক সপ্তাহ সেই অবস্থায় কেটে গেল তবু বেদনা দূর হল না। ভক্তেরা বাগবাজারের একজন বিখ্যাত চিকিৎসককে আনিয়ে রোগীকে দেখালেন। তিনি বেশ করে পরীক্ষা করার পর মালিস ও খাবার ওষুধের ব্যবস্থা করলেন। রোগী কিছুদিন যাতে বারবার সমাধিস্থ না হন ও বেশি কথাবার্তা না বলেন সে সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান করে গেলেন।

ক্রমে পাণিহাটির বিখ্যাত চিঁড়ার মহোৎসবের দিন এসে পড়ল। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সময়ের কথা। বিখ্যাত ধনী দাস পরিবারের একমাত্র

সন্তান শ্রীরঘুনাথ। ঘরে তাঁর পরমা সুন্দরী স্ত্রী। তিনি অগাধ ঐশ্বর্য ও স্ত্রীর মায়া ত্যাগ করে শান্তিপুরে এসে মহাপ্রভুর চরণে নমস্কার করে দাঁড়ালেন। তাঁর চরম প্রার্থনার কথা শুনে মহাপ্রভু বললেন, এখনও তোমার সময় হয় নি। এই লোকদেখানো বৈরাগ্য ছাড়। বাড়ি ফিরে গিয়ে আরও কিছুকাল সংসার কর। গুরুর আদেশ মাথা পেতে নিয়ে রঘুনাথ পাণিহাটিতে ফিরে এলেন, আগেকার মত আবার বিষয় কর্মে মন দিলেন। তাঁর ভিতরের লুকানো অনির্বাণ বৈরাগ্যের কথা কেউ জানতে পারলে না। শুভাকাঙ্ক্ষীরা সকলেই আশ্বস্ত হলেন। এইভাবে বছর কেটে যায়। মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়ে নীলাচলে চলে গেলেন। গঙ্গাতীরে খড়দহ গ্রামে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে শ্রীনিত্যানন্দ বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। এক সময়ে পাণিহাটি গ্রামে তিনি কিছুদিন থাকেন। রঘুনাথ খবর পেয়ে তাঁকে দর্শন করতে এলেন। শ্রীনিত্যা-নন্দের ইচ্ছা হল রঘুনাথ যেন চিঁড়া দই চিনি প্রভৃতি ভগবানকে নিবেদন করে একদিন বৈষ্ণবভক্তমণ্ডলীকে পরিতোষে খাওয়ান। এই ভক্তসেবার ভার পেয়ে রঘুনাথ খুব খুশী হলেন। তিনি গঙ্গার তীরে উৎসবের আয়োজন করে শ্রীনিত্যানন্দের দর্শনলাভের আশায় সমবেত শত শত ভক্তজনকে পরম যত্নে খাইয়ে পরিতৃপ্ত করলেন। উৎসব শেষ হলে শ্রীনিত্যানন্দ তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, তোমার কাল পূর্ণ হয়েছে। এবার নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রভুর শরণ নাও। একথা শুনে পরম উল্লাসে রঘুনাথ সেইদিনই চিরকালের জন্য সংসার ত্যাগ করে নীলাচল যাত্রা করলেন। বৈষ্ণবেরা আজও সেই পুণ্য দিনের স্মরণে পাণিহাটির গঙ্গাতীরে প্রতি বছরে মহোৎসবের আয়োজন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ আগে প্রায়ই এই উৎসবে যোগ দিতেন। ইদানিং কয়েক বছর যান নি। এবারে তাঁর ইচ্ছা হল তাঁর ইংরেজীশিক্ষিত ভক্তদের নিয়ে পাণিহাটি গিয়ে আনন্দ করবেন। ভক্তদের বললেন, পাণিহাটিতে সেদিন আনন্দের মেলা, হরিনামের হাটবাজার বসবে। তোরা সব ইয়ং বেঙ্গল, কখন ওরকম দেখিস নাই, চল দেখে আস্‌বি।

যথা দিনে যাত্রা করার আগে নরেন্দ্র, বলরাম, গিরিশ, মহেন্দ্র, রামচন্দ্র প্রভৃতি শিষ্যেরা পরমহংসদেবকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন, আপনি যেন ওখানকার কীর্তন শুনে কোন বৈষ্ণবদলের মধ্যে মিশে মাতামাতি না করেন। কারণ ভাবাবেশ হলে আপনার গলার অসুখ খুব বেড়ে যাবে। ডাক্তার বার বার করে বারণ করে দিয়ে গেছেন।

ঠিক হয়েছিল, মাত্র দু-এক ঘণ্টা পাণিহাটির উৎসবে থেকে সকলে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসবেন। কিন্তু উৎসবের জায়গায় পৌঁছে কোন সঙ্কল্পই মনে রইল না। তখন দল দল ভক্ত এক এক ভাগে সমবেত হয়ে সংকীর্তনে মেতে উঠেছে। সে সময়টা বৈষ্ণবসাধনার ভাঙা হাটের কাল, কয়েক শতাব্দীর আগেকার সেই আন্তরিকতা আর সকলের নেই। কত ভণ্ডের দল স্বার্থের লোভে মহাপুরুষদের লীলাভঙ্গীর অনুকরণ করে চলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভণ্ডামির সন্ধান পেয়েও কিন্তু নিজেকে চেপে রাখতে পারলেন না। চক্ষের নিমেষে ভক্তদের সাবধানতার বেষ্টনী ভেঙে তিনি দৌড়ে এক কীর্তন সম্প্রদায়ের মাঝখানে উপস্থিত হয়ে আধা অচেতন অবস্থায় সিংহবিক্রমে নাচতে লাগলেন। কি অপরূপ সেই নৃত্য। ভাবাবেশে তালে তালে কখন আগে পা ফেলেন, কখন পিছনে। প্রতি অঙ্গে মধুর ভঙ্গিমা। মুখে রুদ্র কোমল দীপ্তি। চারিদিকে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। এক পরম সৌন্দর্যে তাঁর সর্বদেহ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। দলে দলে বৈষ্ণব এসে চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল। বুঝি প্রেমদাতা নিতাই আবার মাটির দেশে অবতীর্ণ হয়েছেন।

এইভাবে কীর্তনানন্দে ও মুহুর্মুহুঃ ভাবাবেশে প্রায় সারাদিন কেটে গেল। ফেরার পথে একদল কীর্তনীয়া শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রী দেখে আর স্থির থাকতে পারলে না, মহা উল্লাসে গান ধরলে :

"সুরধনীর তীরে হরি বলে কে রে,
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
ওরে হরি বলে কে রে,
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে—
(আমাদের) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
নিতাই নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে,
(এই আমাদের) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।"

অপরূপ দিব্য মূর্তির তারা সন্ধান পেয়েছে, অন্তরে আজ আনন্দের উত্তাল আবেগ। তারা শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে আঙুল তুলে বারবার নেচে নেচে গাইতে লাগল, এই আমাদের প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।

যাঁদের সঙ্গে দেখা করবার সঙ্কল্প ছিল তা শেষ করে ভক্তেরা সন্ধার সময় ভিড় এড়িয়ে গুরুকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশ্যে নৌকো ছাড়লেন।

পাণিহাটিতে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে নৃত্যানন্দে কঠোর পরিশ্রম করার ফলে

এবং বারবার ভাবসমাধির দরুন শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখ বেড়ে গেল। গলায় ঘা দেখা দিলে। ডাক্তারেরা বললেন, দুরারোগ্য রোহিণী রোগ হয়েছে।

আরও মাস দুয়েক কেটে গেল। সেদিন বাগবাজারের একজন মহিলাভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীকে সন্ধ্যেবেলা খাবার জন্য নেমতন্ন করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বর থেকে গুরুকে আনবার জন্য তিনি লোক পাঠিয়েছিলেন। ক্রমে সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল, গুরুর দেখা নেই। সমবেত ভক্তেরা জানতেন তাঁর অসুখের কথা। সকলেরই মন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল, হয়ত অসুখ খুব বেড়েছে। এমন সময় দক্ষিণেশ্বর থেকে লোক ফিরে এসে খবর দিলে, শ্রীরামকৃষ্ণের গলার ঘা থেকে আজ রক্ত পড়েছে।

খবর শুনে ভক্তেরা উদ্বিগ্ন হলেন। নরেন্দ্রের মুখে ঘন ছায়া পড়ল। তিনি বললেন, যাঁকে নিয়ে আমাদের এত আনন্দ তিনি বুঝি এবার চলে যান। আমি ডাক্তারী বই পড়ে আর ডাক্তার বন্ধুদের জিজ্ঞেস করে জেনেছি, এ রকম গলার ঘা থেকে শেষে ক্যানসার হয়। ক্যানসারের ওষুধ এখনও আবিষ্কার হয় নি।

ভক্তেরা আলোচনা করে ঠিক করলেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে কলকাতায় রেখে ভাল চিকিৎসককে দিয়ে দেখানো হবে।

শ্যামপুকুরে একখানা বাড়ি ভাড়া করা হল। শ্রীরামকৃষ্ণ সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে সেই বাড়িতে চলে এলেন। তখন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথপন্থী চিকিৎসক। ভক্তেরা তাঁর হাতে গুরুর চিকিৎসার ভার দিলেন। চিকিৎসায় তাড়াতাড়ি সুফলের জন্য সময়মত এবং বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পথ্য প্রস্তুত করার দরকার। ভক্তেরা দেখলেন, পথ্যের গুরুদায়িত্ব যাকে তাকে দেওয়া যাবে না। তখন তাঁরা সারদামণিকে দক্ষিণেশ্বর থেকে নিয়ে আসবার সঙ্কল্প করলেন। কিন্তু তিনি যে গাঁয়ের মেয়ে, বড় লজ্জাশীলা। দেশ এবং দক্ষিণেশ্বর ছাড়া বিশেষ আর কোন জায়গায় থাকেন নি। শহরের ছোট বাড়িতে দশজন ভক্তদের নিত্য সমাগমের মধ্যে তাঁর থাকবার, যে অসুবিধা হবে! সারদামণি কিন্তু খবর পাবামাত্র আসতে রাজী হলেন। স্বামী তাঁকে শিক্ষাচ্ছলে বলতেন, যখন যেমন, তখন তেমন। যেখানে যেমন সেখানে তেমন। যাকে যেমন তাকে তেমন। সারদামণির চরিত্রে এমন একটি নমনীয়তা ও মাধুর্য ছিল যে সেই শিক্ষাকে তিনি জীবনে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। মেয়েদের পক্ষে নানা অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি

শ্যামপুকুরের বাড়িতে থেকে একান্ত ধৈর্যের সঙ্গে পথ্যের সকল রকম ভার গ্রহণ করলেন।

গৃহস্থ অন্তরঙ্গেরা শ্রীরামকৃষ্ণকে কলকাতায় আনার আগে ভেবেছিলেন, এ কাজে একমাত্র ভাববার কথা খরচের দায়িত্ব। তাই সেই দায়িত্ব ভাগাভাগি করে বহন করবার বিষয়েই তাঁরা বিশেষ ভাবে চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু এখন সব চেয়ে বড় সমস্যা হল শুশ্রূষার ভার নিয়ে। গৃহস্থ অন্তরঙ্গেরা কেউই বিশেষ বড়লোক ছিলেন না, তবু গুরুর অসুখের ব্যয় বহন করার জন্য যদি বাড়ি বাঁধা দিতে হয় বা সংসার খরচ দুষ্করভাবে সঙ্কোচ করতে হয় তাতে সকলেই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের যে কাজকর্ম আছে, তা ছেড়ে কেমন করে তাঁরা রাত্রিদিনের শুশ্রূষার ভার মাথায় তুলে নেবেন! ভক্তদের দুশ্চিন্তার কথা নরেনের কানে উঠল। তিনি তখুনি বললেন, আমি শুশ্রূষার ভার নিলুম। তখন তিনি আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এমন কি মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করার জন্য বিদ্যাসাগরের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাজ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু গুরুর অসুখের কথা ভেবে তাঁর সে সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন। রোজ রাতে শ্যামপুকুরে থেকে গুরুকে সেবা করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর দৃষ্টান্তে আরও কয়েকজন তরুণ ভক্ত অনুপ্রাণিত হলেন। বিশেষতঃ নরেন্দ্রের উৎসাহ বাক্যে তাঁদের ইচ্ছা দৃঢ় হয়ে উঠল। শশী, কালী ও ছোট গোপাল অভিভাবকদের সকল নিষেধ উপেক্ষা করে গুরুসেবায় নরেনকে সাহায্য করতে লাগলেন। এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণসন্ন্যাসী-মণ্ডলের আদিপর্বের আরম্ভ।

ডাক্তার সরকারের ওষুধ সেবনে প্রথমে রোগের কিছু উপশম হল। ভক্তেরা আশায় বুক বাঁধলেন। সরকার ছিলেন খুব খাঁটি মানুষ, সত্যানুরাগী, প্রখর যুক্তিবাদী ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের একান্ত ভক্ত। প্রথম দিন শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে এসে নিয়মিত পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় দিন এসে যখন শুনলেন ভক্তেরা সকলে মিলে চিকিৎসার খরচ জোগাচ্ছেন তিনি তাঁদের ভক্তি ও মহত্ত্বে খুশী হয়ে বললেন, আমি আমার যথাসাধ্য চিকিৎসা করব কিন্তু আপনাদের কোন পারিশ্রমিক দিতে হবে না। আপনাদের সৎকাজে এ আমার সামান্য সাহায্য বলে গণ্য করবেন।

ডাক্তার সরকার প্রথম থেকেই পরমহংসদেবের উদার আধ্যাত্মিকতায় বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তখন তাঁর কলকাতায় খুব পসার। রোগীর এত

ভিড় থাকত যে তিনি কোথাও মুহূর্তমাত্র সময় অবহেলা করতে পারতেন না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে এসে ক্রমে দু তিন ঘণ্টা কাটিয়ে যেতে লাগলেন। এতটা মূল্যবান্ সময় কাটাবার জন্য একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানালেন। তা শোনামাত্র সরকার ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, ওহে, তুমি কি ভাব কেবল তোমার জন্যেই আমি এখানে এতটা সময় কাটিয়ে যাই? এতে আমারও স্বার্থ আছে; তোমার সঙ্গে আলোচনা করে আমি বিশেষ আনন্দ পাই। অনেক আগে তোমাকে দেখেছিলুম বটে কিন্তু এমন ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার ত সুযোগ হয় নি। তখন এটা করব, ওটা করব—এই সব নিয়ে ব্যস্ত থাকা গেছল। কি জান, তোমার সত্যানুরাগের জন্যেই তোমাকে এত ভাল লাগে। তুমি যা সত্য বলে বোঝ তার এক চুল এদিক ওদিক করে চলতে বলতে পার না। অন্য জায়গায় দেখি, তারা বলে এক, করে এক। ওটা আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না। মনে করো না, তোমার খোসামুদি করছি। এমন চাষা আমি নই। বাপের কুপুত্তুর! বাপ অন্যায় করলে তাকেও স্পষ্ট কথা না বলে থাকতে পারি না। তাই আমার দুর্মুখ বলে নামটা খুব রটে গেছে।

ডাক্তার সরকার মানুষটির উপর শ্রীরামকৃষ্ণেরও বিশেষ প্রীতি এবং শ্রদ্ধা ছিল। ডাক্তারকে দেখে তিনি খুব খুশী হতেন, রোগ যন্ত্রণা ভুলে সদ্আলোচনায় মেতে উঠতেন। অমৃত বাণীর প্রবাহ যেন আপনা থেকে উৎসরিত হয়ে উঠত। তৃষিত মানুষ দেখলেই তিনি কথা বলতেন, কিন্তু সকলের সঙ্গ তাঁর অন্তরে সমান হিল্লোল তুলতে পারত না। মনের মত মানুষ পেলেই তাঁর অন্তর্নিহিত অমৃতসাগরে যেন অকস্মাৎ জেগে উঠত জোয়ার।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে ডাক্তার বললেন, জ্ঞানে মানুষ অবাক্ হয়, চক্ষু বুজে যায় আর চক্ষে জল আসে। তখন ভক্তি দরকার হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ জবাব দিলেন, ভক্তি মেয়েমানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বারবাড়ি পর্যন্ত যায়।

—কিন্তু অন্তঃপুরে যাকে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। বেশ্যারা ঢুকতে পারে না। জ্ঞান চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ঠিক পথ জানে না কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি আছে, তাঁকে জানবার ইচ্ছা আছে—এ রকম লোক কেবল ভক্তির জোরে ঈশ্বর লাভ করে। একজন ভারি ভক্ত জগন্নাথ দর্শন করতে বেরিয়েছিল। পুরী কোন্ পথে সে

জানত না। দক্ষিণ দিকে না গিয়ে পশ্চিম দিকে গিছিল। পথ ভুলেছিল বটে কিন্তু ব্যাকুল হয়ে লোকদের জিজ্ঞাসা করত। তারা বলে দিলে, এ পথ নয়, ঐ পথে যাও। ভক্তটি শেষে পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন করলে। দেখ, না জানলেও কেউ না কেউ বলে দেয়।

ডাক্তার জ্ঞানপন্থী তাই মন্তব্য করলেন, সে ভুলে ত গিছিল।

—হ্যাঁ, ভুল হয় বটে কিন্তু শেষে ঠিক পায়।

উপস্থিত একজন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার ?

বেশি কথাবার্তা বলা ডাক্তারের নিষেধ। কিন্তু সব সময়ে তা মানা যে পরমহংসদেবের পক্ষে দুঃসাধ্য। হরি কথা, সদ্‌আলোচনা বর্জন করে পরম করুণাময় কেমন করে তৃষিত মানুষদের বঞ্চিত করবেন! শ্রীরামকৃষ্ণ প্রশ্নের উত্তরে বলতে লাগলেন, তিনি সাকার আবার নিরাকার। একজন সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শন করতে গিছিল। জগন্নাথ দর্শন করে সন্দেহ হল, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? হাতে দণ্ড ছিল, সেই দণ্ড দিয়ে দেখতে লাগল জগন্নাথের গায়ে ঠেকে কি না। একবার এ ধার থেকে ওধারে দণ্ডটি নিয়ে যাবার সময় দেখলে যে জগন্নাথের গায়ে ঠেকল না, দেখে যে সেখানে ঠাকুরের মূর্তি নাই। আবার দণ্ড এধার থেকে ওধারে লয়ে যাবার সময় বিগ্রহের গায়ে ঠেকল। তখন সন্ন্যাসী বুঝল যে ঈশ্বর নিরাকার আবার সাকার। * * * কিন্তু এটি ধারণা করা বড় শক্ত। যিনি নিরাকার, তিনি আবার সাকার কেমন করে হবেন? এ সন্দেহ মনে ওঠে। আবার যদি সাকার হন ত নানা রূপ কেন? যে ব্যক্তি সদাসর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করে সেই জানতে পারে, তাঁর স্বরূপ কি। সে ব্যক্তিই জানে যে ঈশ্বর নানারূপে দেখা দেন। নানাভাবে দেখা দেন। তিনি সগুণ আবার নির্গুণ। গাছতলায় যে থাকে সেই জানে যে বহুরূপীর নানা রঙ, আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়। যিনি সাকার, তিনি নিরাকার। কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। কূলকিনারা নাই। ভক্তি হিমে সেই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়, যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে কখন কখন সাকার রূপ হয়ে দেখা দেন। আবার জ্ঞান সূর্য উঠলে সে বরফ গলে যায়।

ডাক্তার মন্তব্য করলেন, সূর্য উঠলে বরফ গলে জল হয়। আবার জানেন, জল আবার নিরাকার বাষ্প হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই বিচারের পর সমাধি হলে রূপ টুপ উড়ে যায়। তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ হয় না। কি তিনি মুখে বলা যায় না। কে বলবে? যিনি বলবেন তিনিই নাই! তিনি তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান না। তখন ব্রহ্ম নিগুর্ণ। তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন। মন বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে ধরা যায় না। তাই বলে, ভক্তি হচ্ছে চন্দ্র, জ্ঞান সূর্য। শুনেছি, খুব উত্তরে আর দক্ষিণে সমুদ্র আছে। এত ঠাণ্ডা যে জল জমে মাঝে মাঝে বরফের চাঁই হয়। জাহাজ চলে না। সেখানে গিয়ে আটকে যায়।

ডাক্তার বললেন, ভক্তিপথে মানুষ আটকে যায়।

—হ্যাঁ, তা যায় বটে। কিন্তু তাতে হানি হয় না। সেই সচ্চিদানন্দ সাগরের জলই জমাট বেঁধে বরফ হয়েছে। যদি আরও বিচার করতে চাও, যদি ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা—এই বিচার কর, তাতেও ক্ষতি নাই। জ্ঞান-সূর্যেই বরফ গলে যাবে। তবে সেই সচ্চিদানন্দ সাগরই রহিল। * * * জ্ঞান বিচারের শেষে সমাধি হলে আমি টামি কিছু থাকে না। কিন্তু সমাধি হওয়া বড় কঠিন। 'আমি' কোন মতে যেতে চায় না। আর যেতে চায় না বলে ফিরে এই সংসারে আসতে হয়। গরু হাম্বা হাম্বা আমি আমি—করে, তাই এত দুঃখ। সমস্ত দিন লাঙল দিতে হয়। গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই। কিংবা তাকে কসাইয়ে কাটে। তাতেও নিস্তার নাই। চামারে চামড়া করে, জুতা তৈরি করে। অবশেষে নাড়ী ভুঁড়ি থেকে তাঁত হয়। ধুনুরির হাতে পড়ে যখন তুহুঁ তুহুঁ—তুমি তুমি করে তখন তার নিস্তার। যখন জীব বলে, নাহং নাহং নাহং—আমি কেউ নই। হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আমি দাস, তুমি প্রভু—তখন নিস্তার, তখনই মুক্তি।

ডাক্তার হাসতে হাসতে টিপ্পনী দিলেন, কিন্তু ধুনুরির হাতে পড়া চাই।

—যদি একান্ত 'আমি' না যাস, থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে। সমাধির পর কারো কারো 'আমি' থাকে—'দাস আমি', 'ভক্তের আমি'। শঙ্করাচার্য 'বিদ্যার আমি' লোকশিক্ষার জন্যে রেখে দিয়েছিলেন। 'দাস আমি', 'বিদ্যার আমি', 'ভক্তের আমি' এরই নাম 'পাকা আমি'। 'কাঁচা আমি' কি জান? আমি কর্তা, আমি এত বড় লোকের ছেলে, বিদ্বান, ধনবান্—আমাকে এমন কথা বলে! এই সব ভাব। * * * ঈশ্বরলাভ হলে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়। 'বালকের আমি' আর 'পাকা আমি'। বালক

কোন গুণের বশ নয়। ত্রিগুণাতীত। সত্ত্ব রজঃ তমঃ—কোন গুণের বশ নয়। দেখ, ছেলে তমোগুণের বশ নয়। এই মাত্র ঝগড়া মারামারি করলে আবার তারই গলা ধরে তৎক্ষণাৎ কত ভাব, কত খেলা। রজো গুণেরও বশ নয়। এই খেলাঘর পাতলে, কত বন্দোবস্ত, কিছুক্ষণ পরে সব পড়ে রইল। মার কাছে ছুটেছে। হয়ত একখানি সুন্দর কাপড় পরে বেড়াচ্ছে। খানিকক্ষণ পরে কাপড় খুলে পড়ে গেছে। হয় কাপড়ের কথা একেবারে ভুলে গেল নয় বগলদাবা করে বেড়াচ্ছে। যদি ছেলেটিকে বল, বেশ কাপড়খানি, কার কাপড় রে? সে বলে, আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েছে। যদি বল, লক্ষ্মী ছেলে আমায় কাপড়খানি দাও না। সে বলে, না, আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েছে, না দেব না। তারপর ভুলিয়ে একটি পুতুল কি একটি বাঁশী যদি হাতে দাও তা হলে পাঁচ টাকা দামের কাপড়খানা তোমায় দিয়ে চলে যাবে। আবার পাঁচ বছরের ছেলের সত্ত্বগুণেরও আঁট নাই। এই পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে কত ভালবাসা, এক দণ্ড না দেখলে থাকতে পারে না। কিন্তু বাপ মার সঙ্গে যখন অন্য জায়গায় চলে গেল তখন নতুন খেলুড়ে সঙ্গী হল। তাদের ওপর তখন সব ভালবাসা পড়ল। পুরোনো খেলুড়েদের এক রকম একেবারে ভুলে গেল। তারপর জাত অভিমান নাই। মা বলে দিয়েছে, ও তোর দাদা হয়, তা সে ষোল আনা জানে যে এ আমার ঠিক দাদা। তা একজন যদি বামুনের ছেলে হয় আর একজন যদি কামারের ছেলে হয় ত একপাতে বসে ভাত খাবে। আর শুচি অশুচি নাই, হেগো পোঁদে খাবে। আবার লোকলজ্জা নাই, ছোঁচাবার পর যাকে তাকে পেছন ফিরে বলে, দেখ দেখি, আমার ছোঁচানো হয়েছে কি না। * * * আবার 'বুড়োর আমি' আছে।

—সে কি রকম? ডাক্তার হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন।

—বুড়োর অনেকগুলি পাশ। জাতি অভিমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়। বিষয়-বুদ্ধি পাটোয়ারী, কপটতা। যদি কারুর ওপর আক্রোশ হয় ত সহজে যায় না। হয়ত যতদিন বাঁচে তত দিন যায় না। তারপর পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার। 'বুড়োর আমি' কাঁচা আমি। * * * চার পাঁচ জনের জ্ঞান হয় না। যার বিদ্যার অহঙ্কার, যার পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, যার ধনের অহঙ্কার তার জ্ঞান হয় না। এ সব লোককে যদি বলা যায় যে অমুক জায়গায় বেশ একটি সাধু আছে, দেখতে যাবে? তারা অমনি নানা ওজর করে বলে,

যাব না। আর মনে মনে বলে, আমি এত বড় লোক, আমি যাব? তমোগুণের স্বভাব অহঙ্কার। অহঙ্কার অজ্ঞান তমোগুণ থেকে হয়। পুরাণে আছে, রাবণের রজোগুণ, কুম্ভকর্ণের তমোগুণ, বিভীষণের সত্ত্বগুণ। তাই বিভীষণ রামচন্দ্রকে লাভ করেছিলেন। তমোগুণের আর একটি লক্ষণ ক্রোধ। ক্রোধে দিক্ বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। হনুমান লঙ্কা পোড়ালেন, এ জ্ঞান নাই যে সীতার কুটির নষ্ট হবে। আবার তমোগুণের আর একটি লক্ষণ কাম। একজন বলেছিল, কাম ক্রোধাধি রিপু এরা ত যাবে না, এদের মোড় ফিরিয়ে দাও। ঈশ্বরের কামনা কর। সচ্চিদানন্দের সঙ্গে রমণ কর। ক্রোধ যদি না যায়, ভক্তির তমঃ আন। কি, আমি দুর্গানাম করেছি, উদ্ধার হব না? আমার আবার পাপ কি? বন্ধন কি? তারপর ঈশ্বর লাভ করবার লোভ কর। ঈশ্বরের রূপে মুগ্ধ হও। আমি ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বরের ছেলে, যদি অহঙ্কার করতে হয় ত এই অহঙ্কার কর। এই রকমে ছয় রিপুর মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়।

ডাক্তার বললেন, ইন্দ্রিয়সংযম করা বড় শক্ত। ঘোড়ার চোখের দুদিকে ঠুলি দিতে হয়। কোন কোন ঘোড়ার চোখ একেবারে বন্ধ করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের চেষ্টা ছিল ডাক্তারের দৃষ্টি ভক্তিযোগের দিকে আকৃষ্ট করা। তাই বললেন, তাঁর যদি একবার কৃপা হয়, ঈশ্বরের যদি একবার দর্শনলাভ হয়, আত্মার যদি একবার সাক্ষাৎকার হয় তাহলে আর কোন ভয় নাই, তখন ছয় রিপু আর কিছু করতে পারবে না। * * * নারদ প্রহ্লাদ এই সব নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষদের অত করে চোখের দুদিকে ঠুলি দিতে হয় না। যে ছেলে নিজে বাপের হাত ধরে মাঠের আলপথে চলছে, সে ছেলে বরং অসাবধান হয়ে বাপের হাত ছেড়ে দিয়ে খানায় পড়তে পারে। কিন্তু বাপ যে ছেলের হাত ধরে সে কখনও খানায় পড়ে না।

ডাক্তার উত্তর দিলেন, কিন্তু বাপে ছেলের হাত ধরা ভাল নয়।

—তা নয়। মহাপুরুষদের বালক স্বভাব। ঈশ্বরের কাছে তারা সর্বদাই বালক, তাদের অহঙ্কার থাকে না। তাদের সব শক্তি ঈশ্বরের শক্তি, বাপের শক্তি, নিজের কিছুই নয়। এইটি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

—আগে ঘোড়ার চোখের দুই দিকে ঠুলি না দিলে ঘোড়া কি এগুতে চায়? রিপু বশ না হলে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ ডাক্তারকে বললেন, তুমি যা বলছ ওকে বিচারপথ বলে,

জ্ঞানযোগ বলে। ও পথেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। জ্ঞানীরা বলে, আগে চিত্তশুদ্ধি হওয়া দরকার। আগে সাধন চাই, তবে জ্ঞান হবে। ভক্তিপথেও তাঁকে পাওয়া যায়। যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়, যদি তাঁর নামগুণগান করতে ভাল লাগে, ইন্দ্রিয়সংযম আর চেষ্টা করে করতে হয় না। রিপুবশ আপনা আপনি হয়ে যায়। যদি কারুর পুত্রশোক হয়, সেদিন সে কি আর লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, না নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে? সে কি লোকের সামনে অহঙ্কার করে বেড়াতে পারে না সুখসম্ভোগ করতে পারে? বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখতে পায় তাহলে কি সে আর অন্ধকারে থাকে?

ডাক্তার হাসতে হাসতে মন্তব্য করলেন, তা পুড়েই মরুক সেও স্বীকার!

—না গো। ভক্ত কিন্তু বাদুলে পোকার মত পুড়ে মরে না। ভক্ত যে আলো দেখে ছুটে যায়, সে যে মণির আলো। মণির আলো খুব উজ্জ্বল বটে, কিন্তু স্নিগ্ধ আর শীতল। এ আলোতে গা পোড়ে না, এ আলোতে শান্তি হয়। আনন্দ হয়। *** বিচারপথে—জ্ঞানযোগের পথে তাঁকে পাওয়া যায়। কিন্তু এ পথ বড় কঠিন। আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই। আমার রোগ নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই। আমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, আমি সুখ দুঃখের অতীত, আমি ইন্দ্রিয়ের বশ নই, এ সব কথা মুখে বলা খুব সোজা; কাজে করা, ধারণা হওয়া বড় কঠিন। কাঁটাতে হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর করে রক্ত পড়ছে, অথচ বলছি কই কাঁটায় আমার হাত কাটে নাই, আমি বেশ আছি। এ সব বলা সাজে না। আগে ঐ কাঁটাকে জ্ঞানাগ্নিতে পোড়াতে হবে ত। * * * অনেকে মনে করে, বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না, বিদ্যা হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল। কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শোনা আর কাশীদর্শন অনেক তফাত। আবার যারা নিজে শতরঞ্চ খেলে তারা চাল তত বোঝে না। কিন্তু যারা না খেলে, ওপর চাল বলে দেয়, তাদের চাল ওদের চেয়ে অনেকটা ঠিক ঠিক হয়। সংসারী লোকে মনে করে আমরা বড় বুদ্ধিমান। কিন্তু তারা বিষয়াসক্ত। নিজে খেলছে। নিজেদের চাল ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু সংসারত্যাগী সাধুলোক বিষয়ে অনাসক্ত। তারা সংসারীদের চেয়ে বুদ্ধিমান। নিজে খেলে না তাই ওপর চাল ঠিক বলে দিতে পারে।

ডাক্তার ভক্তদের দিকে তাকিয়ে বললেন, বই পড়লে এর এত জ্ঞান হত

না। প্রকৃতিকে ফ্যারাডে নিজে দেখতেন তাই অত বিজ্ঞানের তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। বই পড়ে বিদ্যা হলে অত হত না।

—যখন পঞ্চবটীতে পড়ে পড়ে মাকে ডাকতুম, আমি মাকে বলেছিলুম, মা, আমায় দেখিয়ে দাও কর্মীরা কর্ম করে যা পেয়েছে, যোগীরা যোগ করে যা দেখেছে, আর জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে। আহা, কি অবস্থাই গেছে। ঘুম যায়। এই কথা বলে তিনি গান ধরলেন: "ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই, যোগে ভাগে জেগে আছি। এখন যোগনিদ্রা তোকে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।" আমি ত বই টই কিছুই পড়িনি। কিন্তু দেখ, মার নাম করি বলে আমায় সবাই মানে। শম্ভু মল্লিক আমায় বলেছিল, ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, শান্তিরাম সিং।

পরমহংসদেবের কথা শুনে সমবেত সকলেই হেসে উঠলেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার ডাক্তারকে বলতে লাগলেন, ঐটুকু বোঝা শক্ত, তিনিই স্বরাট্ তিনিই বিরাট। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। তিনি মানুষ হতে পারেন না, এ কথা জোর করে আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি বলতে পারি? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি এসব ধারণা হতে পারে? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? তাই সাধু মহাত্মা যাঁরা ঈশ্বরলাভ করেছেন তাঁদের কথা বিশ্বাস করতে হয়। সাধুরা ঈশ্বর চিন্তা লয়ে থাকেন যেমন উকিলরা মোকদ্দমা লয়ে থাকে। তোমার কাকভূষণ্ডীর কথা কি বিশ্বাস হয়?

ডাক্তার উত্তর দিলেন, যেটুকু ভাল বিশ্বাস করলুম। ধরা দিলেই চুকে যায়, কোন গোল থাকে না। রামকে অবতার কেমন করে বলি? প্রথমে দেখ বালীবধ। লুকিয়ে চোরের মতন বাণ মেরে তাকে মেরে ফেলা হল। এত মানুষের কাজ, ঈশ্বরের নয়।

গিরিশ বললেন, মশাই, এ কাজ ঈশ্বরই পারেন।

ডাক্তার গিরিশের সঙ্গে তর্কে না নেমে তার পূর্বপ্রসঙ্গের সূত্র ধরে বললেন, তারপর দেখ সীতাবর্জন।

একজন ভক্ত ডাক্তারকে বললেন, মশাই আপনি অবতার মানছেন না কেন? এই বললেন, যিনি আকার করেছেন তিনি সাকার, যিনি মন করেছেন তিনি নিরাকার। এই বললেন, ঈশ্বরের কাণ্ড সবই হতে পারে।

পরমহংস হাসতে হাসতে বললেন, ঈশ্বর অবতার হতে পারেন এ কথা যে ওঁর সায়েন্সএ নাই। তবে কেমন করে বিশ্বাস হয়! একটা গল্প শোন।

একজন এসে বললে, ওহে ও পাড়ায় দেখে এলুম, অমুকের বাড়ি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গেছে। যাকে ও কথা বললে সে ইংরেজী লেখাপড়া জানে। সে বললে, দাঁড়াও একবার খবরের কাগজখানা দেখি। খবরের কাগজ পড়ে দেখে যে বাড়ি ভাঙার কথা কিছুই নাই। তখন সে বললে, ওহে, তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করি না। কই, বাড়ি ভাঙার কথা ত খবরের কাগজে লেখা নাই। ও সব মিছে কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটু থেমে বলে যান, শুধু পণ্ডিত কি হবে যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে? ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা করলে আমার একটি অবস্থা হয়। পরনের কাপড় পড়ে যায়, শিড়্ শিড়্ করে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কি একটা ওঠে। তখন সকলকে তৃণজ্ঞান হয়। পণ্ডিতের যদি দেখি বিবেক নাই, ঈশ্বরে ভালবাসা নাই, খড়কুটো মনে হয়। রামনারায়ণ ডাক্তার আমার সঙ্গে তর্ক করছিল। হঠাৎ সেই অবস্থাটা হল। তারপর তাকে বললুম, তুমি কি বলছ? তাঁকে তর্ক করে কি বুঝবে! তাঁর সৃষ্টিই বা কি বুঝবে! তোমার ত ভারি তেঁতে বুদ্ধি। আমার অবস্থা দেখে সে কাঁদতে লাগল আর আমার পা টিপতে লাগল।

ডাক্তার হাসতে হাসতে বললেন, রামনারায়ণ ডাক্তার হিন্দু কি না!

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলতে লাগলেন, বঙ্কিম তোমাদের একজন পণ্ডিত। বঙ্কিমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আমি জিজ্ঞাসা করলুম, মানুষের কর্তব্য কি? তা বলে, আহার নিদ্রা আর মৈথুন। এই সব কথাবার্তা শুনে আমার ঘৃণা হল। বললুম যে তোমার এ কি রকম কথা! তুমি ত বড় ছ্যাঁচড়া। যা সব রাত দিন ভাবছ, কাজে করছ, তাই আবার মুখ দিয়ে বার হচ্ছে। মূলো খেলেই মূলোর ঢেঁকুর ওঠে। তারপর অনেক ঈশ্বরীয় কথা হল। ঘরে সংকীর্তন হল, আমি আবার নাচলুম। তখন বলে, মশাই, আমাদের ওখানে একবার যাবেন। আমি বললুম, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। তখন বলে, আমাদের সেখানেও ভক্ত আছে, দেখবেন। আমি হাসতে হাসতে বললুম, কি রকম ভক্ত আছে গো? গোপাল গোপাল যারা বলেছিল সেই রকম ভক্ত নাকি?

—গোপাল গোপাল সে ব্যাপারটা কি?

—একটি স্যাকরার দোকান ছিল। দোকানের সকলে বড় ভক্ত, পরম বৈষ্ণব। গলায় মালা, কপালে তিলক, হাতে হরিনামের মালা। সকলে বিশ্বাস করে ঐ দোকানেই আসে। ভাবে, এরা পরম ভক্ত, কখনও ঠকাবে না। একদল

খদ্দের এলে দেখত, কোন কারিগর বলছে, কেশব কেশব। আর একজন কারিগর খানিক পরে নাম করছে, গোপাল গোপাল। আবার খানিক ক্ষণ পরে একজন কারিগর বলছে, হরি, হরি। তারপর কেউ বলছে, হরহর। কাজেকাজেই এত ভগবানের নাম দেখে খরিদ্দারেরা সহজেই মনে করত, এ স্যাকরা অতি উত্তম লোক। কিন্তু ব্যাপারটা কি জান? যে বললে, কেশব কেশব, তার মনের ভাব, এ সব খদ্দের কে? যে বললে, গোপাল গোপাল, তার অর্থ এই যে, আমি এদের চেয়ে চেয়ে দেখলুম, এরা গরুর পাল। যে বললে হরি, হরি, তার অর্থ এই যে যদি গরুর পাল হয় তবে হরি অর্থাৎ হরণ করি। যে বললে হর হর তার মানে এই, তবে হরণ কর, এরা ত গরুর পাল। * * * সেজোবাবুর সঙ্গে আর এক জায়গায় গিয়েছিলুম, অনেক পণ্ডিত আমার সঙ্গে বিচার করতে এসেছিল। আমি ত মুখ্যু। তারা আমার সেই অবস্থা দেখলে আর আমার সঙ্গে কথাবার্তা হলে বললে, মশাই, আগে যা পড়েছি তোমার সঙ্গে কথা কয়ে সে সব পড়া বিদ্যা সব থু হয়ে গেল। এখন বুঝেছি, তাঁর কৃপা হলে জ্ঞানের অভাব থাকে না, মূর্খ বিদ্বান্ হয়, বোবার কথা ফোটে। তাই তোমাকে বলছি, বই পড়লেই পণ্ডিত হয় না। হ্যাঁ, তাঁর কৃপা হলে জ্ঞানের কি অভাব থাকে? দেখ না, আমি ত মুখ্যু, কিছুই জানি না, তবে এ সব কথা বলে কে? আবার এ জ্ঞানের ভাণ্ডার অক্ষয়। ও দেশে ধান মাপে রামে রাম, রামে রাম বলতে বলতে। একজন মাপে আর যাই ফুরিয়ে আসে আর একজন রাশ ঠেলে দেয়। তার কর্মই ঐ, ফুরলেই রাশ ঠেলে। আমিও যা কথা কয়ে যাই ফুরিয়ে আসে আসে হয়, মা আমার অমনি তাঁর অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডারের রাশ ঠেলে দেন।*

এমনি মধুর ও গভীর কথাবার্তায় তিন চার ঘণ্টা কেটে গেল। ডাক্তারের হুঁশ নেই। গিরিশ হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এখানে তিন চার ঘণ্টা রয়েছেন, কই রুগীদের দেখতে যাবেন না?

মুগ্ধ ডাক্তার উত্তর দিলেন, আর ডাক্তারি আর রুগী! যে পরমহংস হয়েছে, আমার সব গেল।

পরমহংসের প্রতি ডাক্তার সরকারের শ্রদ্ধা ও প্রীতি ক্রমশঃ খুব গভীর হয়ে ওঠে। মহাসাগরের তীরে এসে অতল সৌন্দর্যের মহিমায় কে না অভিভূত হয়!

* ছুদিনের কথাবার্তা থেকে সঙ্কলিত।

এদিকে দক্ষিণেশ্বরের মত শ্যামপুকুরেও নিত্য উৎসব জমে উঠতে লাগল। অন্তরঙ্গেরা প্রায় সকলেই শহরে থাকতেন। তাই গুরুকে কাছে পেয়ে তাঁদের ঘন ঘন আসার সুযোগ হয়েছিল। তাছাড়া রোজ দলে দলে দর্শনপ্রার্থী এসে হাজির হত। অসুখের যন্ত্রণা শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরের নিত্য আনন্দকে ম্লান করতে পারে নি। তিনি আগের মতই অমিয় বাণী বিলোতে লাগলেন। তাঁর নিবিড় সান্নিধ্যে গৃহস্থ ও তরুণ সকল ভক্তদেরই মনে দিব্য জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে উঠল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ অক্টোবর। অসুখ ক্রমশঃ বেড়েই যাচ্ছে। শ্যামপুকুরের বাড়িতে এসে হাজির হলেন শ্রীবিজয়কৃষ্ণ, সঙ্গে কয়েকজন ব্রাহ্মভক্ত। কিছুদিন তিনি ঢাকায় ছিলেন তারপর নানা তীর্থ পারক্রমা করে সবে মাত্র কলকাতায় পৌচেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনাদীপ্ত মুখখানি দেখে খুব খুশী হলেন। বিজয়ের মনে আরও আনন্দ, অনেক দিনের পর পরমজনকে কাছে পেয়েছেন। তীর্থে তীর্থে ঘুরেও তিনি যাঁকে পান নি তাঁর সন্ধান মিলল এই শ্যামপুকুরে।

একজন ভক্ত বিজয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, মশাই, তীর্থ করে এলেন, অনেক দেশ দেখে এলেন, এখন কি দেখলেন বলুন।

বিজয় ভক্তিআপ্লুত স্বরে জবাব দিলেন, কি আর বলব! দেখছি যেখানে এখন বসে আছি, এখানেই সব। কেবল মিছে ঘোরা। কোন কোন জায়গায় এঁরই এক আনা কি দুই আনা, কোথাও চারি আনা এই পর্যন্ত। এইখানেই পূর্ণ ষোল আনা দেখছি।

—ঠিক বলেছেন আবার ইনিই ঘোরান, ইনিই বসান।

বিজয় এক দৃষ্টে শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, বুঝেছি আপনি কে। আর বলতে হবে না। এবার আমি বুঝেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথা শুনতে শুনতে ভাবস্থ হয়ে গেলেন। আস্তে আস্তে বললেন, যদি তা হয়ে থাকে ত তাই।

বিজয়ের চোখে আনন্দ ঘনিয়ে উঠল। তিনি আর নিজের হৃদয়ের উত্তাল আবেগকে চেপে রাখতে পারলেন না। বললেন, বুঝেছি, আমি বুঝেছি। বলতে বলতে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণপদ্ম দুটি বুকে ধারণ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য, স্থির, অটল।

ভক্তের সেই অপূর্ব আত্মসমর্পণের দৃশ্য দেখে উপস্থিত অন্তরঙ্গদের সকলের

হৃদয়ে জাগল বিপুল আবেগ। ভাবোন্মত্ত হয়ে তাঁরা কেউ স্তব পড়তে লাগলেন, কেউ আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে নয়ন ভরে এক দৃষ্টে সে দৃশ্য দেখতে লাগলেন, কারুর দুচোখ বেয়ে প্রেমাশ্রু ঝরতে লাগল। কেউ গান ধরলেন, "আশা পূরিল রে, আমার সকল সাধ মিটে গেল। এখন আনন্দে মাতিয়া দুবাহু তুলিয়া বলরে মন হরি হরি। চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।"

এইভাবে অনেক ক্ষণ কেটে গেল, তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হলেন। বলতে লাগলেন, কি একটা হয় আবেশ। এখন লজ্জা হচ্ছে। যেন ভূতে পায়, আমি আর আমি থাকি না। এ অবস্থার পর গোনা যায় না, গুনতে গেলে ১।৭।৮ এই রকম হয়ে যায়।

নরেন উপস্থিত ছিলেন, বললেন, সব এক কি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ জবাব দিলেন, না, এক দুয়ের পার। হিসাব পচে যায়। পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। তিনি শাস্ত্র—বেদপুরাণতন্ত্রের পার। হাতে একখানা বই যদি দেখি, জ্ঞানী হলেও তাকে রাজর্ষি বলে কই। ব্রহ্মর্ষির কোন চিহ্ন থাকে না। শাস্ত্রের কি ব্যবহার জান? একজন চিঠি লিখেছিল, পাঁচ সের সন্দেশ ও একখানা কাপড় পাঠাবে। যে চিঠি পেলে সে চিঠি পড়ে পাঁচ সের সন্দেশ ও একখানা কাপড় এই কথা মনে রেখে চিঠিখানা ফেলে দিলে। আর চিঠির কি দরকার?

বিজয় বললেন, হ্যাঁ, সন্দেশ পাঠানো হয়েছে, বোঝা গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলে যান, মানুষ দেহধারণ করে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। তিনি সর্বস্থানে সর্বভূতে আছেন বটে কিন্তু অবতার না হলে জীবের আকাঙ্ক্ষা পুরে না, প্রয়োজন মেটে না। কি রকম জান? গরুর যেখানটা ছোঁবে গরুকে ছোঁয়াই হয় বটে। শিংটা ছুঁলেও গাইকে ছোঁয়া হল। কিন্তু গাইটার বাঁট থেকেই দুধ হয়।

একজন হাসতে হাসতে মন্তব্য করলেন, দুধ যদি দরকার হয় গাইটাগর শিংএ মুখ দিলে কি হবে? বাঁটে মুখ দিতে হবে।

বিজয় হয়ত তাঁর নিজের তীর্থ অভিজ্ঞতার কথা ভেবে বললেন, কিন্তু বাছুর প্রথম প্রথম এদিক ওদিক ঢুঁ মারে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ দিয়ে তাড়াতাড়ি উত্তর বেরিয়ে এল, আবার কেউ হয়ত

বাছুরকে ঐরকম করতে দেখে বাঁটটা ধরিয়ে দেয়। এই কথার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিজয়ের সম্বন্ধের একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

এই সময়ে ডাক্তার সরকার এসে ঘরে ঢুকলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বসে বললেন, কাল রাত তিনটে থেকে আমার ঘুম ভেঙেছে, কেবল তোমার জন্যে ভাবছিলুম, পাছে ঠাণ্ডা লেগে থাকে। আরও কত কি ভাবছিলুম।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের রোগের কথা তাঁকে জানালেন, কাশি হয়েছে, টাটিয়েছে, শেষ রাত্রিরে এক মুখ জল আর যেন কাঁটা বিঁধছে।

—হ্যাঁ, সকালে মাস্টারমশাইএর কাছ থেকে সব খবর পেয়েছি।

আরও দু-একটি সাধারণ কথার পর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে লাগলেন, ডাক্তারি কর্ম খুব উঁচু কর্ম বলে অনেকের বোধ আছে। যদি টাকা না লয়ে পরের দুঃখ দেখে দয়া করে কেউ চিকিৎসা করে, তবে সে মহৎ। কাজটিও মহৎ। কিন্তু টাকা লয়ে এ সব কাজ করতে করতে মানুষ নির্দয় হয়ে যায়। ব্যবসার ভাবে টাকার জন্যে বাহ্যের রং এই সব দেখা! নীচের কাজ।

ডাক্তার বললেন, তা যদি শুধু করে কাজ খারাপ বটে। তোমার কাছে বলা গৌরব করা—

—হ্যাঁ, ডাক্তারি কাজে নিঃস্বার্থভাবে যদি পরের উপকার করা হয় তাহলে খুব ভাল। তা যে কর্মই লোকে করুক না কেন সংসারী লোকের মাঝে মাঝে সাধু সঙ্গ বড় দরকার। ঈশ্বরে ভক্তি থাকলে লোকে সাধু সঙ্গ আপনি খুঁজে লয়। আমি উপমা দিই, গাঁজাখোর গাঁজাখোরের সঙ্গে থাকে। অন্য লোক দেখলে মুখ নীচু করে চলে যায় বা লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু আর একজন গাঁজাখোর দেখলে মহা আনন্দ। হয়ত কোলাকুলি করে। আবার শকুনি শকুনির সঙ্গে থাকে।

ডাক্তার হাসতে হাসতে বললেন, আবার কাকের ভয়ে শকুনি পালায়। আমি বলি, শুধু মানুষ কেন, সব জীবেরই সেবা করা উচিত। আমি প্রায় চড়ুই পাখীকে ময়দা দিই। ছোট ছোট ময়দার গুলি করে ছুঁড়ে ফেলি আর ছাদে ঝাঁকে ঝাঁকে চড়ুই এসে খায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ খুশী হয়ে বললেন, বাঃ, এটা খুব কথা। জীবকে খাওয়ানো সাধুর কাজ। সাধুরা পিঁপড়েদের চিনি দেয়।

ঘরের পরিমণ্ডলটি তখনও ভাবাবেশে মাতোয়ারা। ডাক্তারের মনও

ক্রমশঃ রঙিন হয়ে আসছে। রোগী দেখতে এসে তিনি যেন অজান্তে আর কিছুর সন্ধান করে ফেরেন। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, আজ গান হবে না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ তৃষিত প্রাণের এই অনুরোধ শুনে আনন্দিত হলেন, নরেন্দ্রকে বললেন, একটু গান কর না।

তানপুরা হাতে নিয়ে নরেন্দ্র গান ধরলেন, "সুন্দর তোমার নাম দীন-শরণ হে।"

গান করতে করতে তিনি মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন। প্রথম গানখানি শেষ হলে পরম উল্লাসে আত্মহারা হয়ে আর একখানি ধরলেন।

অমৃতময় পুরুষের দিব্য সঙ্গে ভক্তদের হৃদয়ে হৃদয়ে যে কথাটি জেগে উঠেছে গানের মধ্যে যেন তারই প্রতিধ্বনি। সকলেই আবার মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন। হঠাৎ বিজয় ভাবোন্মত্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে কেবলই বলতে লাগলেন, আমায় দেমা পাগল করে, কাজ নাই জ্ঞান বিচারে। শ্রীরামকৃষ্ণও চৈতন্যহারা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন, কোথায় গেল তাঁর রোগ যন্ত্রণা, কোথায় গেল দুর্বলতা। বেহুঁশ ডাক্তারও দাঁড়িয়ে পড়লেন, তিনি যে রোগী দেখতে এসেছিলেন তা ভুলে গেছেন। একে একে সকলে দাঁড়িয়ে উঠে গাইতে লাগলেন, দেমা পাগল করে। সংসারের সামাজিক জীবনের সীমার বাইরে আজ তাঁদের তৃষিত মন ছুটেছে, বিচারে আর উৎসাহ নেই, জ্ঞানের পথে—বুদ্ধির পথে তাঁরা আর আকাঙ্ক্ষিতকে পাবার চেষ্টা করে দীর্ঘ দিন প্রতীক্ষা করতে চান না। দেখতে দেখতে ছোট নরেন ও লাটুর ভাবসমাধি হল। ক্রমে সকলেই স্থির নিস্পন্দ হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে ভাবাবেগ খানিকটা কমলে কেউ কাঁদতে লাগলেন, কেউ হাসতে লাগলেন। অকারণ সেই কান্না, অজানা সেই হাসি। জন কয়েক মত্তমাতাল যেন একসঙ্গে হয়ে উঠেছেন মাতোয়ারা। তাঁদের হৃদয়আকাশের তারায় তারায় লেগেছে আজ বিশ্বআনন্দের দোল। শ্যামপুকুরের বাড়িতে রোগীকে নিয়ে শত সাবধানতার মধ্যেও প্রায়ই এমনি ব্যাপার ঘটতে লাগল।

আর একদিন একটি বিশেষ ঘটনা ঘটল। ৬ নভেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। ঘোর অমাবস্যা, কালীপূজার দিন। ঠিক হল, উপরের ঘরে বসেই শ্রীরামকৃষ্ণ পূজো করবেন। পূজোর পূর্ণ আয়োজন করা হল। নানা ফুল, চন্দন, বিল্বপত্র, রক্ত জবা, পায়স, মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভক্তেরা এনে গুরুর সামনে রেখেছেন। তখন রাত সাতটা। সকলে মিলে তাঁকে ঘিরে বসলেন,—শরৎ, শশী, রাম,

গিরিশ, চুণীলাল, মহেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন প্রভৃতি। ভক্তদের মাঝখানে বসে শ্রীরামকৃষ্ণ জগজ্জননীকে সব নিবেদন করলেন। সেই রোগজীর্ণ মহাপুরুষের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনেকেরই মন ব্যথায় ভরে উঠেছিল, কি ছিলেন আর আজ কি হয়েছেন, অন্যান্য বছরে এই দিনটিতে তাঁর কত না উল্লাস, কত না পূজার আড়ম্বর!

কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বললেন, এবার সবাই একটু ধ্যান কর। কোন কোন ভক্তের মন ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠল, কই, এবার ষোড়শোপচারে মায়ের পূজো হল কই! কিন্তু ক্ষণিকের এই বিষণ্ণতা। ধ্যান করতে করতে গিরিশের মনে হল, পূর্ণ, তোমার লীলা বোঝে সাধ্য কার! তুমিই আমাদের আশা, তুমিই ভরসা, তুমিই আমাদের ইষ্ট, তুমিই মুক্তি। তুমি ছাড়া এই পৃথিবীতে আর কার কাছ থেকে এমন অপার জননীস্নেহ আমরা পেয়েছি! তোমারই চরণে আমাদের সকল পূজা সমর্পণ করলুম। কালীপূজার জন্য যে মালা তৈরি করা হয়েছিল গিরিশ অকস্মাৎ সেই মালা তুলে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিলেন। গিরিশের মনের ভাবনা ভক্তদের সকলেরই হৃদয়ে উদয় হয়েছিল। তাঁকে অনুসরণ করে সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্র, রাখাল, রাম প্রভৃতি সকলে গুরুর চরণে ফুল অর্ঘ্য দিলেন। নতুনতর উল্লাসে মাতোয়ারা হয়ে তাঁরা গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, জয় মা, জয় মা। দেখতে দেখতে শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

শ্যামপুকুরে যখন পরমহংস ছিলেন তখন তাঁকে একান্ত কাছে পেয়ে এবং তাঁর সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করার সুযোগলাভ করে অনেক গৃহী অন্তরঙ্গেরই মনে ভক্তির আবেগ প্রবল হয়ে উঠেছিল। আবার কোন কোন ভক্তের হৃদয়ে স্বভাবিক ভক্তিযোগীর অনুকরণে মহাভাবের বদলে ভাবালুতার সৃষ্টি হল। তাঁদের পক্ষে এই অসংযত ভক্তির উচ্ছ্বাস সাধনজীবনের সহায় না হয়ে ভাববিলাসের বস্তু হয়ে উঠল। ক্রমে কোন কোন তরুণ অন্তরঙ্গও সেই সংক্রামক ব্যাধির কবলে পড়লেন। তাঁরা ভাবতে শুরু করলেন এই কৃত্রিম ভাবালুতাই আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত। কেউ কেউ কৃত্রিম চেষ্টায় সমাধি ও ভাবনৃত্যের ঢং আয়ত্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণমণ্ডলের ভবিষ্যৎ নেতা, বীর্যবান্ নরেন্দ্র সেদিন এই সব লক্ষ্য করে বিশেষ বিচলিত হলেন। তিনি পুরুষসিংহ হয়েই জন্মেছিলেন। আপন বুদ্ধি বলেই বুঝেছিলেন, এই সব ভাববিলাসিতা যথার্থ সাধকের পক্ষে বিপথ

এ পথে একবার পা বাড়ালে আর রক্ষা নেই। তিনি ছোট ভক্তদের ডেকে এই ভাবালুতার অনিষ্ট সম্বন্ধে বোঝাতে লাগলেন। সর্বস্ব ত্যাগ, সংযম ও সত্যনিষ্ঠার পথে দিব্য জীবন লাভই গুরুর বাঞ্ছিত লক্ষ্য। সেই মহৎ লক্ষ্যের তুলনায় এই ভক্তিবিলাস অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তু। এ দুর্বলের আত্মপ্রবঞ্চনার উপাদান, শক্তিমানের ধর্মসাধনার পন্থা নয়। মাত্র হাল্কা ভাবোচ্ছ্বাসে মানুষ জীবনে কোন স্থায়ী উন্নতি হতে পারে না। অঙ্গবিকার, অশ্রুপুলকাদি অবস্থা, ভাবালুতায় আংশিক বাহ্যসংজ্ঞালোপ—এসব স্নায়বিক দৌর্বল্যের লক্ষণ, গভীর আধ্যাত্মিকতার নয়। মানসিক শক্তি বলে তা দমন করতে না পারলে পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া উচিত। নরেন্দ্রের চেষ্টায় একে একে তরুণ সঙ্গীদের মন ফিরল। তাঁরা বুঝতে পারলেন, তাঁদের সাধনার লক্ষ্য অত সহজলভ্য নয়।

নরেন যখন এইভাবে তরুণ সঙ্গীদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করছেন, আর একজনের নিঃস্বার্থ হৃদয় তখন তাঁর মধ্যে তীব্র বৈরাগ্য জাগিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যে দিন দিন ব্যাকুল হয়ে উঠছিল। সেদিন কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বসে বসে গল্প করছেন এমন সময় নরেন এসে কাছে বসলেন। তিনি প্রিয় শিষ্যের দিকে এক দৃষ্টে ছলছল চোখে তাকাতে লাগলেন। শিষ্যের মধ্যে যে বিপুল পরিবর্তন এসেছে তা তিনি সবই জানেন। তবু তাতে তিনি খুশী নন। তিনি যে চান তাঁর নিঃশেষে আত্মদান—আধাদানে ত সাধনার চরম সিদ্ধি পাওয়া যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলতে লাগলেন, আচ্ছা, কেশব সেনকে বললুম যদৃচ্ছা লাভ। যে বড় ঘরের ছেলে, তার খাবার জন্যে ভাবনা হয় না। সে মাঝে মাঝে মাসোহারা পায়। তবে নরেন্দ্রের অত উঁচু ঘর, তবু হয় না কেন? ভগবানে মন সব সমর্পণ করলে তিনি সব জোগাড় করে দেবেন।

একজন ভক্ত জবাব দিলেন, কালে হবে, এখনও ত নরেনের হবার সময় বয়ে যায় নি।

শ্রীরামকৃষ্ণ তা জানেন। কিন্তু নরেন্দ্রের উপর তাঁর যে বিশাল আশা। মাটির দেশ থেকে মহাবিদায়ের আগে তিনি যে দেখে যেতে চান, নরেন্দ্র সব ছেড়ে জয়যাত্রায় বার হয়েছেন। কই সেই সিদ্ধির জন্য আটুপাটু ব্যাকুলতা! সে ব্যাকুলতা না জাগলে ত পূর্ণ বৈরাগ্যের উদয় হবে না। তিনি ভক্তের কথার উত্তরে বললেন, তীব্র বৈরাগ্য হলে ও সব হিসেব থাকে না। বাড়ির সব বন্দোবস্ত করে দিয়ে তারপর সাধনা করব,—তীব্র বৈরাগ্য হলে এ রকম

মনে হয় না। কেশব সেন বলেছিল, মশাই, যদি কেউ বিষয় আশয় ঠিকঠাক করে ঈশ্বর চিন্তা করে, তা পারে কি না? আমি বললুম, তীব্র বৈরাগ্য হলে সংসার পাতকুয়া, আত্মীয় কালসাপের মত বোধ হয়। তখন টাকা জমাবো, বিষয় ঠিকঠাক করব—এ সব হিসেব আসে না। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। ঈশ্বর ছেড়ে বিষয় চিন্তা। * * * একটা মেয়ের ভারি শোক হয়েছিল। আগে নতটা কাপড়ের আঁচলে বাঁধলে তারপর ওগো আমার কি হলো গো বলে আছড়ে পড়ল। কিন্তু খুব সাবধান যেন নতটা ভেঙে না যায়।

নরেন চুপ করে সব শুনলেন। তাঁর এখন মনের অবস্থা ভয়ঙ্কর। টাকাকড়ি উপায় করে সংসার ভোগ করার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা তাঁর ভস্মীভূত হয়েছে অথচ অজানার উদ্দেশ্যে পথে বার হবার বাসনা এখনও হয়ে ওঠে নি তীব্র। ঘর বাঁধার সব আশা তিনি জলাঞ্জলি দিয়েছেন কিন্তু এখনও মজে ওঠে নি বাসা ভাঙার নেশা। তিনি গুরুর কথার মধ্যে যে ইঙ্গিত ছিল তা বুঝলেন। তাই নিজের মনে করুণ কণ্ঠে গান করতে লাগলেন, "যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে ?—"

*

* *

শ্যামপুকুরে তিন মাস কেটে গেল। ডাক্তার সরকারের চিকিৎসায় শেষ পর্যন্ত রোগীর বিশেষ উপকার হল না। তিনি বারে বারে ঔষধ বদলালেন। তবু প্রথম প্রথম যে উন্নতি দেখা গেছল তা আর ফিরল না। বরং ক্রমেই অসুখ বেড়ে গেল, বেদনা অসহ্য বোধ হতে লাগল। শেষে এমন হল যে প্রথমে যে সব ঔষধ সেবনে ফল পাওয়া গেছল তা দিয়ে আর কোন উপকার হচ্ছে দেখা গেল না। হয়ত শহরের বদ্ধ দূষিত পরিমণ্ডলের জন্য এমন হচ্ছে—এই ভেবে সরকার শহরের বাইরে কোন ফাঁকা জায়গায় রোগীকে নিয়ে গিয়ে রাখবার পরামর্শ দিলেন। উদ্বেগে ভক্তদের হৃদয় বিচলিত হল। তাঁদের অন্তরের পরমজনকে কি তবে আর ইহলোকে আটকে রাখা যাবে না। তাঁদের জীবন আকাশ থেকে চাঁদের হাসির হাট কি এবার ভাঙবে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর কাশীপুরে একটি বাগান বাড়ি ভাড়া করা হল। বাড়িটি বেশ বড়, বাগানটিও চমৎকার, তাতে অনেক ফলফুলের গাছ ছিল। চারিদিক খোলা,—শহরতলীর প্রান্তে নিরালা জায়গা। ১১ ডিসেম্বর তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণকে কাশীপুরে নিয়ে আসা হল।

শহর থেকে নিরালা বাগানে এসে প্রকৃতির পরিমণ্ডলে শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পী মন বিশেষ উৎফুল্ল হল। কয়েক দিন তাঁর শরীরের অবস্থা একটু ভালর দিকে ফিরল। একদিন তিনি ওপরের হল ঘর থেকে নেমে বাগানে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালেন। কিন্তু দুর্বল দেহে অত বেশি পরিশ্রম সহ্য হল না। কয়েক দিন আর নড়াচড়া করতে পারলেন না। ডাক্তারেরা খুব পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা দিলেন। তার ফলে কিছুদিন তিনি উত্তরোত্তর ভাল হতে লাগলেন। তা দেখে সকলেই আশায় আবার বুক বাঁধলেন।

এদিকে কাশীপুরে আসার জন্য খরচের অঙ্ক খুব বেড়ে গেছল। বাগানের ভাড়া মাসিক আশি টাকার ভার সুরেন্দ্র একাই নিলেন। পরমহংসদেবের ব্যক্তিগত খরচের দায়িত্ব ছিল বলরামের উপর। শ্যামপুকুরে শুশ্রূষাকারী তরুণ ভক্তেরা প্রায় সকলেই বাড়ি থেকে খাওয়া দাওয়া করে আসতেন। কিন্তু কাশীপুর থেকে দূরে শহরে গিয়ে তা করা আর সম্ভব হল না। তাই ভক্তদের থাকা ও খাবার আয়োজন বাগানেই করতে হল। গৃহী অন্তরঙ্গেরা অকুণ্ঠিত চিত্তে সব ব্যবস্থা করলেন।

একে একে বার জন তরুণ শিষ্য বাড়ি ছেড়ে গুরুর সেবায় আত্মসমর্পণ করলেন। নরেন হলেন তাঁদের নেতা। কারুর কারুর অভিভাবকেরা পীড়াপীড়ি করলেন, বললেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা ত সারা দিনরাত করতে হবে না। সেবা করার পালা শেষ হলে রোজ বাড়িতে ফিরে এস।

দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর এল, না।

এমন ভাবে সব ছেড়ে গুরুর কাছে থাকার মধ্যে তাঁরা এক অজানা আনন্দের সন্ধান পেয়েছিলেন। সকলে পালা করে রোগীর সেবা করতেন। অন্য সময়ে নরেনের উৎসাহে ধ্যান, জপ, ভজন, বই পড়া, সদ্ আলোচনা প্রভৃতি করে তাঁদের দিনগুলি মধুময় হয়ে উঠত। এর আগে কোনদিন তাঁরা লক্ষ্যপথে এগিয়ে যাবার জন্য এইভাবে দৃঢ় মনে চেষ্টা করেন নি। আজ গুরুর অসুখে সেবা করতে এসে ঠিক ঠিক সাধন ভজনের পথে শুরু হল তাঁদের যাত্রা।

নরেন তখনও সন্ন্যাস জীবনের উদ্দেশ্যে নিঃশেষে সব ত্যাগ করতে পারেন নি। তখনও ইচ্ছা ছিল, কাশীপুরে গুরুর সেবার ফাঁকেফাঁকে আইনের বই পড়ে শেষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হবেন। তা ছাড়া বাড়ির মা ভাইদের মোটামুটি খাওয়া পরার একটা ব্যবস্থা না করে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না।

এ সময়ে তাঁর দিন কাটছিল তীব্র দ্বন্দ্বের মধ্যে। একদিন ভাবলেন, এখানে গুরুর সেবার সব বন্দোবস্ত এক রকম করা হয়েছে। এবার কাল একবার বাড়ি যাব সেখানকার বন্দোবস্ত করতে। রাত্রে গুরুভাইদের সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করে তিনি শুতে গেলেন। রাত নিশুতি হয়ে এল কিন্তু নরেনের চোখে ঘুম এল না। এক চিন্তার জ্বালে প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল। হঠাৎ তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে শরৎ, ছোট গোপাল ও আরো কয়েকজন গুরুভাইকে ডেকে তুললেন, বললেন, চল্ বাগানে একটু বেড়াই। বেড়াতে বেড়াতে তিনি বিষণ্ণ মনে তাঁর চিন্তার কথা পাড়লেন, দেখ্ ঠাকুরের অসুখ সাংঘাতিক। হয়ত এবার তিনি শরীর ত্যাগ করবার সঙ্কল্প করেছেন। আমাদের উচিত সময় থাকতে থাকতে ধ্যানজপ করে সাধন পথে এগিয়ে যাবার প্রাণপণে চেষ্টা করা। তাঁকে হারালে তখন আর আমাদের অনুতাপের সীমা থাকবে না। হাতের কাজ শেষ করে সাধন ভজন করব—এই আশায় বৃথাই আমরা আজ সময় নষ্ট করছি। আর বাঁধনের পর বাঁধনে জড়িয়ে পড়ছি। আমাদের উচিত সব বাঁধন নির্মূল করে কেটে এখুনি বেরিয়ে আসা।

শীতের রাত। মাথার উপর আকাশভরা তারার মালা। চারিদিক নিশুতি। নরেনের মনে ধ্যান করবার জন্য তীব্র ইচ্ছা জেগে উঠল। একটা গাছের তলায় এক আঁটি শুকনো কাঠ পড়েছিল। তিনি সেখানে বসে পড়ে বললেন, ওতে আগুন দে। এই সময়ে মুনিরা ধুনি জেলে ধ্যানে বসেন! আমরাও এই আগুন ঘিরে ধ্যানে বসব। আমাদের সব বাসনা এমনি ভাবে পুড়ে ছাই হয়ে যাক্। তরুণ বৈরাগীর দল হয়ে উঠলেন উৎসাহে উদ্দীপ্ত। আগুনের চারিদিকে ঘিরে বসে সকলে মগ্ন হয়ে গেলেন গভীর ধ্যানে।

পরের দিন নরেন বাড়ি গেলেন। আত্মীয় সকলে অনুযোগ করলেন, বললেন, কি হো হো করে বেড়াচ্ছিস? আইন পরীক্ষা এত কাছে, পড়াশোনা নেই, কেবল হৈ হৈ করে দিন কাটাচ্ছিস? এবার একটু বাড়িতে থেকে পড়াশোনায় মন দে।

নরেন সোজাসুজি না বলতে পারলেন না। কিন্তু বাড়িতে বসে পরীক্ষার পড়া তৈরি করলে গুরুর সেবা করবে কে? ছোট ছোট গুরুভাইরা যে যে কাশীপুরে থাকে প্রায় সকলেরই অভিভাবকরা তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। নরেন নিজে তাদের সঙ্গে থেকে উৎসাহ দিয়ে তাদের মনে সাহস সঞ্চার করেন বলেই তারা অভিভাবকদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ

করে দিতে পেরেছেন। নরেনের অনুপস্থিতিতে আবার সব বন্দোবস্ত পণ্ড হয়ে যাবে। হঠাৎ গুরুর রোগজীর্ণ দুর্বল শরীরের কথা তাঁর মনে পড়ল। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। দুদিন পরে আবার ফিরে এলেন কাশীপুরের বাগানে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রতি অন্তরঙ্গদের ভালবাসা ক্রমশঃ নিবিড়তর ও তাঁদের অন্তরের বৈরাগ্য তীব্রতর হচ্ছে লক্ষ্য করে খুব খুশী হচ্ছিলেন। আর এদিকে তাঁদের নিঃস্বার্থ সেবার জন্য নীরব কৃতজ্ঞতায় তাঁর হৃদয় ভরে উঠছিল। একদিন একজন শিষ্য এই তরুণ বৈরাগীদের প্রসঙ্গে তাঁকে বললেন, পাঁচ বছর তপস্যা করে যা না হত, এই কদিনে ভক্তদের তা হয়েছে। সাধনা, প্রেম, ভক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ তা বটে। এই নিরঞ্জন বাড়ি গিছল। হ্যাঁরে নিরঞ্জন, তুই বল্ দেখি আজকাল কি রকম বোধ হয়।

নিরঞ্জন বললেন, আগে আগে আপনার উপর ভালবাসা ছিল বটে কিন্তু এখন এমন হয়েছে যে আর ছেড়ে থাকতে পারবার জো নেই।

প্রথম ভক্তটি তা শুনে বললেন, আমি একদিন দেখেছিলুম, এরা কত বড়লোক। সেদিন একপাশে দাঁড়িয়ে শ্যামপুকুরের বাড়িতে এদের দেখছিলুম। দেখতে দেখতে বোধ হল, এরা এক একজন কত বাধা বিঘ্ন ঠেলে এসে হাজির হয়েছে আপনার সেবার জন্যে।

নিষ্কাম ভালবাসার জন্য তরুণ অন্তরঙ্গদের এই ত্যাগের কথা শুনতে শুনতে পরমহংসদেব ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন। ক্রমে তাঁর বাহ্যচৈতন্য লোপ পেলে, তিনি গভীর সমাধিতে লীন হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখ একদিকে তাঁর অন্তরঙ্গদের হৃদয়ে গুরুভক্তি নিবিড়তর করে তুলেছিল আর একদিকে একত্রে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যসাধনের উদ্দেশ্যে মিলিত হবার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের নববর্ষের দিন শ্রীরামকৃষ্ণ অনেকটা সুস্থ বোধ করলেন। তখন ডাক্তার সরকারের মত নিয়ে তাঁর বন্ধু ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্ত চিকিৎসা করছিলেন। সেদিন ছুটি ছিল বলে প্রায় ত্রিশ জন ভক্ত গুরুকে দেখতে এসেছিলেন। বিকাল তিনটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ একটু বেড়াবার উদ্দেশ্যে বাগানে বার হলেন। সামনে একটি গাছের ধারে গিরিশচন্দ্র দু-একজন ভক্তের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। পরমহংসদেবকে দেখে তিনি এগিয়ে এসে

নমস্কার করলেন। হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্তর হল। তিনি আধাঅচেতন অবস্থায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, গিরিশ, এখানকার ভিতরে তুমি কি দেখেছ যার জন্যে সকলের কাছে অবতার বল ?

গিরিশ ভক্তিগদগদ কণ্ঠে বললেন, ব্যাস বাল্মীকি যাঁর মহিমা বুঝে শেষ করতে পারেন নি, আমার মত সামান্য জীব তাঁর কথা কেমন করে বলবে ?

—তোমাদের আর কি বলব! তোমাদের সকলের উদ্দীপন হোক্। কথা বলতে বলতে শ্রীরামকৃষ্ণের মন সমাধি পথে এগিয়ে গেল। ইতিমধ্যে চারপাশে যে সব ভক্ত এসে জমা হয়েছিলেন, এমনি অপ্রত্যাশিতভাবে সকলে গুরুর চরম আশীর্বাণী পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। এ যে আশার অতীত পাওয়া! হৃদয়ে হৃদয়ে লাগল অজানা আবেগের তীব্র কাঁপন। একে একে সকলে সেই জ্যোতির্ময় দিব্যপুরুষের চরণে লুটিয়ে পড়লেন। পরমহংসদেব পরম করুণায় সকলকে স্পর্শ করে যে যেমন আধার সেই মত প্রত্যেককে শক্তিদান করলেন। সেই বিদ্যুৎস্পর্শে সকলের মন উঠে গেল সংসারের সকল বাঁধনের অতীত লোকে এক অপূর্ব অনুভূতির রাজ্যে। উচ্ছল বিশ্বপ্রাণের প্রবাহে তাঁরা মুহূর্তের মধ্যে ভেসে গেলেন। সেই অপরূপ অবস্থায় কেউ শিশুর মত হাসতে লাগলেন, কারুর চোখ দিয়ে হু-হু করে অজানা বেদনার অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল, কেউ বুঁদ হয়ে ডুবে গেলেন গভীর ধ্যানে। চারিদিকে ডাকাডাকি পড়ে গেল। যাঁরা বাড়ির মধ্যে কাজে বা আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, তাঁরা খবর পেয়ে ছুটে এলেন। একে একে সকলেই ধন্য হলেন মহাপ্রাণের কাছ থেকে কৃপালাভ করে।

*

* *

সেদিন নরেন্দ্র ছাড়া প্রায় সকল ভক্তই গুরুর কাছ থেকে শক্তিলাভ করলেন। গুরুর সেবায় আগের দিন সারারাত জাগতে হয়েছিল বলে এ সময়ে নরেন্দ্র ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ভাঙলে সব কথা শুনলেন, তীব্র বেদনায় তাঁর ভিতরটা জ্বালা করে উঠল। জীবনের এক দুর্লভ সুযোগ চলে গেছে, হয়ত আর কখন ফিরে পাওয়া যাবে না। পরের দিন তিনি গুরুর কাছে এসে আবেগভরে জোর করে ধরলেন, সবাইএর ত হল, এবার আমায় কিছু দিন। সবাই শান্তি পেলে আর আমার হবে না ?

পরমহংস হাসতে হাসতে বললেন, তুই বাড়ির একটা ঠিক করে আয় না, সব হবে। তুই কি চাস ?

—আমার ইচ্ছে, অমনি তিন চার দিন সমাধিস্থ হয়ে থাকব। কখন কখন এক একবার খেতে উঠব। নরেন এখন চরম আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভের জন্য মেতে উঠেছেন।

কিন্তু গুরুর লক্ষ্য অন্য। তিনি চান, চরম আধ্যাত্মিক সম্পদে অধ্যুষিত হয়ে নরেন বিশ্বজনের সেবায় নিজেকে দান করবেন। তাই বললেন, তুই ত বড় হীন বুদ্ধি! ও অবস্থারও উঁচু অবস্থা আছে। তুই ত গান গাস, যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যাঁয়। *** তা তুই বাড়ির একটা ঠিক করে আয় না, সমাধিলাভের অবস্থার চেয়ে উঁচু অবস্থা হতে পারবে।

নরেনের অন্তরে তখন ভোরের আলো অন্ধকারের শেষ রেশটুকুর নাগপাশ কাটবার জন্য আকুলিবিকুলি করেছে। বাড়ির একটা বন্দোবস্ত করে দিয়ে সংসারের সঙ্গে শেষ সম্বন্ধটুকু ত্যাগ করতে না পারলে তাঁর যে পথ চলা অবাধ হয়ে উঠছে না। তিনি গুরুর কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে পরের দিন বাড়ি গেলেন। বাড়ির সকলে তাঁকে যা হোক করে আইন পরীক্ষাটি দেবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করতে লাগল। নরেন তাঁদের অনুনয় এড়াতে না পেরে পড়বার ঘরে গিয়ে বই খুলে বসলেন। হঠাৎ তাঁর মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত আতঙ্ক জাগল, এ কি তুচ্ছ জিনিসের নেশায় তিনি মত্ত হতে যাচ্ছেন! দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ নরেনের চোখ বেয়ে দরদর ধারে জল গড়িয়ে পড়ল। পুঁথিপত্র ফেলে আকুল-ভাবে তিনি পথে বেরিয়ে পড়লেন। পরীক্ষা দেবার সব মোহ তাঁর নির্মূল হল। মানুষ হয়ে জন্মেছেন, কত সাধনার জোরে এক অদ্বিতীয় মহামানুষের দেখা পেয়েছেন। সেই মহামানুষের চিরবিদায়ের আর ত বিশেষ দেরি নেই। এর মধ্যে যদি তিনি লক্ষ্যপথে পৌঁছবার জন্য যাত্রা শুরু না করেন তাহলে হয়ত সারা জীবনই তাঁর কেঁদে কেঁদে কাটবে। নরেন কাশীপুরে ফিরে এসে কঠোর তপস্যায় উঠে পড়ে লাগলেন।

পরের দিন ছিল অমাবস্যা। কন্‌কনে শীত পড়েছে। তরুণ বৈরাগী একলা চললেন রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে বেলতলায় ধুনি জেলে ধ্যান করবার জন্য। পরমহংস সে কথা শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে, আইনের পড়া পড়বি না ?

—একটা ওষুধ পেলে এখন বাঁচি যাতে পড়াটড়া যা হয়েছে সব ভুলে যাই।

নরেনের পরিবর্তন দেখে গুরু বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করলেন। এত দিনে ক্ষেপা সিংহশিশুকে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন। ভিতর বাহির আজ তাঁর দুঃসহ দ্বন্দ্বে ভরপুর, এত দিনে পাগলা ঝোরা সকল বাঁধন ভেদ করে মুক্তি পথে ছুটে যাবার জন্য হয়ে উঠেছে উত্তাল।

দিন দিন নরেন ও অপর তরুণ অন্তরঙ্গদের মধ্যে যেমন কঠোর সাধনার চেষ্টা প্রখর হয়ে উঠতে লাগল শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের শেষ-আকর্ষণের জন্য অলক্ষ্যে প্রস্তুতির সব আয়োজন করতে লাগলেন। কিছুদিন আগে থেকেই এঁদের সকলকে বিশেষভাবে নরেনকে নানা বিধিবদ্ধমার্গে সাধনা করার জন্য হাতেনাতে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। এই সময়ে একদিন সকলকে ডেকে গাঁয়ের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে সাধুদের মত ভিক্ষা করে আনতে বললেন। তখন সবাইএর হৃদয়ে বৈরাগ্যের তীব্র আগুন। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ভক্তেরা একে একে ভিক্ষা করে নিয়ে এলেন। ভিক্ষায়পাওয়া চাল ডাল রান্না করে গুরুব সামনে দেওয়া হল। পরমহংস একটুখানি মুখে দিয়ে প্রসাদ করে দিলেন, তখন সকলে মহা পরিতৃপ্তির সঙ্গে সেই অন্ন খেলেন। এর কয়েক মাস পরে গুরু তাঁদের গৈরিক বসন ও রুদ্রাক্ষের মালা দান করেন। একদিন নরেনকে ডেকে তিনি বললেন, এই সব ছেলেদের তোর জিম্মায় রেখে গেলুম, দেখিস যেন ওরা সাধনভজন করে, আর বাড়ি ফিরে না যায়।

ক্রমে মার্চ মাস শেষের দিকে এগিয়ে চলল। শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখ আরও বেড়ে গেছে। এখন কথা বলতে রীতিমত কষ্ট হয়। তবু তাঁর অমিয় বাণীর আনন্দ হাট নীরব হয় নি। যখনই অন্তরঙ্গেরা একত্র হন তিনি বারেবারে তাঁদের জীবনের চরম লক্ষ্যের কথা আলোচনা করেন। সেদিন ভক্তদের বলতে লাগলেন, কি দেখছি জান? তিনিই সব হয়েছেন। মানুষ আর যা জীব দেখছি, যেন সব চামড়ার তৈরি, তার ভেতর থেকে তিনিই হাত পা নাড়ছেন। যেমন একবার দেখেছিলুম মোমের বাড়ি, বাগান, রাস্তা, মানুষ, গরু—সব মোমের, সব এক জিনিসে তৈরি। * * * দেখাচ্ছে সে-ই কামার, সে-ই বলি, সে-ই হাঁড়িকাট হয়েছে।

আহা, আহা বলতে বলতে তিনি ভাবস্থ হলেন। আগের দিন রাত তাঁর অসহ্য যন্ত্রণায় কেটেছিল। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে নিজের সুখদুঃখের অতীত অবস্থার কথা ইঙ্গিত করে বললেন, এখন আমার কোনও কষ্ট নাই,—ঠিক পূর্বাবস্থা। ঐ যে লোটো মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে, তিনিই মাথায় হাত দিয়ে যেন রয়েছেন।

তাঁর সাধনায় পাওয়া অদ্বৈতজ্ঞানের বস্তুগত অনুভূতির চরম অবস্থায় আজ তিনি পৌঁছেছেন। সবই ভগবান দেখতে দেখতে নিজের অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যেও আজ ভগবানকে দেখতে পাচ্ছেন।

ভক্তদের হৃদয়ে হৃদয়ে এখন একটি মাত্র আশা ক্ষীণ শিখায় জ্বলছে, পরমহংসদেব নিজে যদি দেহরক্ষার ইচ্ছা করেন তাহলে আর তাঁকে হারাবার ভয় থাকে না। সুযোগ বুঝে রাখাল আজ গুরুকে ব্যাকুল হয়ে সেই কথা জানালেন, বললেন, আপনি বলুন যাতে আপনার দেহ থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।

নরেন গদগদ কণ্ঠে অনুনয় করে বললেন, আপনার ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয়ে গেছে।

মন যাঁর নিত্যসমাধি লোকে গর্গর মাতোয়ারা তিনি কখন দেহরক্ষার জন্য প্রার্থনা করতে পারেন! নরেনের অনুনয় শুনে পরমহংস ভাবাবিষ্ট অবস্থায় নিজের বুকে হাত রেখে বলতে লাগলেন, এর ভিতর দুটি আছেন। একটি তিনি। আর একটি ভক্ত হয়ে আছে। তারই হাত ভেঙে ছিল, তারই এই অসুখ করেছে। বুঝেছ?

ভক্তেরা বিষণ্ণ মনে চুপ করে রইলেন। তিনি বলতে লাগলেন, কারেই বা বলব, কেই বা বুঝবে? * * * তিনি মানুষ হয়ে—অবতার হয়ে ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তেরা তাঁরই সঙ্গে আবার চলে যায়।

রাখালের বুক থেকে করুণ মিনতি বেরিয়ে এল, তাই বলছি আপনি আমাদের যেন ফেলে না যান।

তাঁর মুখে দিব্য হাসির রেখা ফুটে উঠল,—নীল আকাশে যেন পূর্ণিমার আলো ছড়িয়ে পড়ল। তিনি ভক্তদের সান্ত্বনার জন্য বললেন, বাউলের দল হঠাৎ এল, নাচলে, গান গাইলে। আবার হঠাৎ চলে গেল,—এল গেল কেউ চিনলে না।

দিব্য পুরুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গদের আসক্তির বাঁধন কিছুমাত্র নেই। ভক্তদের মেলায় যেমন দিক দিক থেকে বাউলের দল আসে, পরস্পরের মধ্যে কেউ কারুকে চেনে না, জানে না। তবু মেলার উৎসবে এক সঙ্গে নেচে গেয়ে তারা আনন্দ করে। তারপর মেলার শেষে আবার যে যার দিকে চলে যায়, পরস্পরের মধ্যে কেউ কারুকে কোন বাঁধনে জড়িয়ে যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর লীলাসহচরদের লীলাখেলাও সেই রকম, আপন আপন লীলার শেষে সকলকেই

চলে যেতে হবে, পরস্পরের মধ্যে মায়ায় বাঁধনে কেউ জড়িয়ে পড়বে না। পরমহংসদেব রাখালের মিনতির উত্তরে চমৎকার একটি উপমার সাহায্যে নিজেদের পরস্পরের বাঁধনহীন সম্বন্ধের ছবিটি ফুটিয়ে তুললেন। তারপর নরেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে যাচ্ছিল। শঙ্করাচার্য গঙ্গায় নেয়ে কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। চণ্ডাল হঠাৎ তাঁকে ছুঁয়ে ফেলেছিল। শঙ্কর বিরক্ত হয়ে বললেন, তুই আমায় ছুঁয়ে ফেললি! সে বললে, ঠাকুর, তুমিও আমায় ছোঁও নাই, আমিও তোমায় ছুঁই নাই। তুমি বিচার কর। তুমি কি দেহ, তুমি কি মন, তুমি কি বুদ্ধি? কি তুমি বিচার কর। শুদ্ধ আত্মা নির্লিপ্ত। সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ কোন গুণে লিপ্ত নয়।

দেহের ক্ষয়ের সঙ্গে সত্যিকার শ্রীরামকৃষ্ণের কোন ক্ষয় নেই। তিনি শুদ্ধ আত্মা—সুখ দুঃখ, মিলন বিচ্ছেদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। তিনি আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় কাতর শিষ্যদের ইঙ্গিতে সেই কথা বোঝালেন।

আভাসে চিরবিচ্ছেদের প্রসঙ্গ উঠতেই দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ নরেন্দ্র তাঁর শেষ প্রশ্নের পুনরায় অবতারণা করলেন। ঘুরে ফিরে বারবার এই প্রশ্ন তাঁর জীবনকে কণ্টকিত করে তুলছিল, কিছুতেই তিনি চরম মীমাংসার পথে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারছিলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, কেউ কেউ রাগে আমার ওপর ত্যাগ করবার কথায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের গলায় দুঃসহ যন্ত্রণা। তিনি আস্তে আস্তে উত্তর দিলেন, ত্যাগ দরকার। একটা জিনিসের পর যদি আর একটা জিনিস থাকে, প্রথম জিনিসটা পেতে গেলে ও জিনিসটা সরাতে হবে না? একটা না সরালে আর একটা কি পাওয়া যায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সেইময় দেখলে আর কিছু কি দেখা যায়?

—সংসার ত্যাগ তা হলে করতে হবেই?

গুরু বললেন, যা বললুম। সেইময় দেখলে কি আর কিছু দেখা যায়? সংসার ফংসার আর কিছু কি দেখা যায়? তবে মনে ত্যাগ।

তিনি প্রিয় শিষ্যের দিকে সস্নেহে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে মৃদু হাসতে হাসতে বললেন, খুব।

প্রিয় শিষ্য জিজ্ঞাসা করলেন, খুব কি?

—খুব ত্যাগ হয়ে আসছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে বাঞ্ছিত চরম সাফল্যের অম্লান প্রসন্নতা।

রাখাল গুরুর কথাটাকে স্পষ্ট করে বললেন, নরেন্দ্র আপনাকে খুব বুঝছে।

কিছুদিন পরে নরেন এক অপূর্ব অনুভূতির ফলে চরম লক্ষ্যের আস্বাদ পেলেন। তাঁর সব দ্বন্দ্ব চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেল। সেদিন রাতে তিনি ধ্যান করছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল যেন একটি বিদ্যুৎ শিখা মাথার পিছন দিকে চমকে উঠল। তারপর সেই প্রখর আলোর মধ্যে তাঁর মন যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। নিজের মধ্যে তিনি যেন আর নেই—এ যেন আর কেউ। অচৈতন্য অবস্থা থেকে ক্রমে যখন তিনি চৈতন্যের রাজ্যে ফিরে আসতে লাগলেন তখন তাঁর বোধ হল, তাঁর দেহ যেন লুপ্ত হয়েছে, শুধু ভেসে আছে মুখখানা। বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন, ওরে, আমার শরীর কোথায় গেল? বুড়ো গোপাল কাছেই ছিলেন। তিনি নরেনের প্রশ্ন শুনে ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে বললেন, এই যে নরেন, এইত তোমার শরীর। কিন্তু ভাবাবিষ্ট নরেনের হুঁশ হল না। তিনি বারেবারেই বলতে লাগলেন, কই কই, আমার শরীর? তাঁর অবস্থা দেখে বুড়ো গোপাল ভয় পেয়ে ওপরে গুরুর কাছে ছুটে গেলেন। তিনি সব শুনে বললেন, ও থাক্ অমনি অবস্থায়। ইদানিং ঐ অবস্থার জন্যে বড় জ্বালাতন করে মারছিল।

কয়েক ঘণ্টা পরে নরেনের মন দেহরাজ্যে ফিরে এল। তিনি উঠে পড়লেন। তাঁর হৃদয়ে অপরিসীম শান্তি। অদ্বৈত তত্ত্বের অনুভূতির স্পর্শে তিনি যেন নতুন মানুষ হয়ে গেছেন। সেই অবস্থায় গুরুর কাছে এসে হাজির হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, এখন টের পেলি ত? মা তোকে সব দেখিয়ে দিয়েছেন। চাবি আমার কাছে রইল। মার কাজ শেষ করলে তবে মুক্তি পাবি।

ক্রমে শ্রাবণ মাসের শেষ সপ্তাহ ঘনিয়ে এল। তাঁর অসুখ ঘোরতর হয়ে উঠল। ভক্তেরা বুঝলেন, দিন দিন শেষের ক্ষণটি এগিয়ে আসছে। ভাবী বিচ্ছেদের চিন্তায় সকলেই কাতর। তাঁদের হৃদয় যেন কিছুতেই এই মর্মান্তিক বিচ্ছেদের সম্ভাবনাকে স্বীকার করতে পারে না। পরমহংসদেব চলে গেলে যে তাঁদের ভবন থেকে সব আলো নিভে যাবে। তাঁরা ধর্ম জানেন না, কর্ম জানেন না, তাঁদের জীবন ঘিরে শুধু আছে যে এই দিব্য মানুষটি। তাঁকে হারিয়ে তাঁরা কি নিয়ে জীবনে বেঁচে থাকবেন! তাঁদের আর কোন আকাঙ্ক্ষা ত সংসারে নেই। অনন্ত প্রেমময়, তাঁরা যে শুধু তোমার প্রেমের কাঙাল!

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেনকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর ঘরে তখন আর কেউ ছিল না। নরেন এলে তাঁকে নিজের কাছে সামনাসামনি বসিয়ে তাঁর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। শিষ্যের বোধ হল যেন বিদ্যুৎপ্রবাহের মত একটি সূক্ষ্ম শক্তি তাঁর শরীর ভেদ করে ঢুকছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। কতক্ষণ এইভাবে তাঁদের কেটে ছিল তার ঠিক নেই। যখন নরেনের জ্ঞান ফিরে এল তখন দেখতে পেলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর সামনে বসে রয়েছেন আর তাঁর চোখ বেয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ছে। সর্বত্যাগী দিব্য পুরুষের চোখে জল! গভীর বিস্ময়ে শিষ্য জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কাঁদছেন কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, বাবা আজ থেকে আমি ফকির হলুম। আমার যা কিছু সব তোকে দিয়ে দিয়েছি। এই শক্তির বলে তুই মার কাজ করবি। তোকে দিয়ে অনেক বড় বড় কাজ হবে। তারপর কাজ শেষ হলে যেখান থেকে এসেছিস সেখানে চলে যাবি।

এই শুভক্ষণটির আশাতেই শ্রীরামকৃষ্ণের এতদিনের ব্যাকুল প্রতীক্ষা। শিষ্যের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দিয়ে তিনি সৃষ্টি করে গেলেন নবীন লীলার সম্ভাবনা।

দিন চার পাঁচ পরে চিরবিদায়ের মুহূর্তটি এসে উপস্থিত হল। শ্রাবণ মাসের শেষ দিন, পনেরই অগস্ট। রবিবার। সেদিনও তিনি অন্তরঙ্গদের সঙ্গে অনেকক্ষণ সদ্ আলোচনা করলেন। কিন্তু শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে তাঁর কষ্ট হতে লাগল। সারাদিন শিষ্যদের কাটল গভীর উদ্বেগে। তাঁদের জীবন থেকে আলোর উৎস বুঝি এবার চিরতরে শেষ হয়!

আকাশের কোণে কোণে শ্রাবণের ঘনকাল পথিক মেঘের দল, পূব হাওয়া যেন উধাও হয়েছে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। মালতীর গন্ধে জমেছে বুকচাপা, অশ্রুভরা বেদনা। বিশ্বপ্রকৃতির দিকে দিকে আজ যেন হারাবার ব্যাকুল আশঙ্কা।

সন্ধ্যার পরে পরমহংসদেব খেতে চাইলেন। ভক্তেরা তাঁকে খাওয়াবার চেষ্টা করলেন কিন্তু গলা দিয়ে বিশেষ কিছু গেল না। তারপর ভক্তেরা তাঁর মুখ মুছিয়ে দিয়ে পা ছড়িয়ে বিছানায় ভাল করে শুইয়ে দিলেন। দুজন শিষ্য পাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি হয়ে গেলেন সমাধিমগ্ন। দেহ নিস্পন্দ, কঠিন। দুপুর রাতে আবার তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। অকস্মাৎ তিনি যেন বেশ সুস্থ বোধ করতে লাগলেন। নরেন বললেন, এখন আপনি একটু

ঘুমোবার চেষ্টা করুন। তিনি পরিষ্কার গলায় তিনবার কালী কালী কালী উচ্চারণ করে চুপ করে শুলেন। একটা বেজে দু মিনিটের সময় তাঁর সর্বশরীর হঠাৎ কেঁপে উঠল। গা রোমাঞ্চিত, চোখ দুটি নাকের ডগার উপর নিবদ্ধ, মুখে দিব্য হাসির জ্যোতিঃ। ধীরে ধীরে পরমহংসদেব চিরতরে লীন হয়ে গেলেন মহাসমাধিতে।

ভক্তদের হৃদয়ে হৃদয়ে কেঁদে উঠল আর্ত বেদনা। ওগো অকরুণ, তুমি যেও না, তুমি যেও না। তোমারই জন্যে আমরা বাবা মা, আত্মীয় স্বজন সকলকে ভুলেছি। আমাদের জীবন থেকে তাঁদের চিহ্ন মুছে গেছে। সংসারে থেকেও সংসারের সঙ্গে আমাদের কোন যোগ নেই। ভাঙাবাসার দল আমরা, তোমার সঙ্গে পথে নেমেছিলুম,—সে যাত্রা যে আজও অসমাপ্ত। তুমি এমন করে মাঝপথে আমাদের ত্যাগ করে যেও না। কি অপূর্ব মায়াই না তুমি জানতে! তোমার সেই মায়ায় ভুলে আমরা যে পৃথিবীর সব চাওয়াপাওয়াকে তুচ্ছ করে দিয়েছি। তুমিই যে আজ আমাদের জীবনের সর্বস্ব ধন। তুমি যে আজ আমাদের আত্মীয় থেকে পরমাত্মীয়, আপন থেকে আপনতর। তুমি ত্যাগ করে গেলে আমাদের দিনরাত্রি এবার কেমন করে কাটবে। প্রিয়, তোমায় নিয়ে আমাদের নিঃসম্বল জীবনে এত দিন আমরা অভিনব কল্পলোক সৃষ্টি করে তুলেছিলুম। আজ এমন করে সেই কল্পলোক থেকে আমাদের নির্বাসিত করে যেও না। ঘরের বাইরে কাল রাত্রি, সেই রাত্রির নিবিড় অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে। তোমার বিরহে আমরা কাতর। হে অকাতর, হে অবিচলিত, হে কর্ণধার, আবার আমাদের দাও ডাক, আবার আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে রাখ তোমার পরম পরশ।

ভক্তদের চোখের জলে ভেজা বোবা আর্তনাদকে তুচ্ছ করে কাল রাত্রি এগিয়ে চলল।

ভোরে খবর পেয়ে দলে দলে লোক এসে বাগানে উপস্থিত হল। সকলেরই চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন। মাটির পৃথিবী যাঁর স্পর্শে সোনার পুরী হয়ে উঠেছিল, সেই স্পর্শমণি আজ হারিয়ে গেছে অনন্তের কোলে।

কর্ণেল উপাধ্যায় এসে পরীক্ষা করে বললেন, দেহে এখনও সামান্য তাপ আছে। ভক্তেরা তাঁর নির্দেশমত শেষকৃত্যের আয়োজন বন্ধ রাখলেন। প্রায় দুপুরে ডাক্তার সরকার এসে বললেন, আধঘণ্টা আগে শেষ তাপটুকুও বিদায় নিয়েছে।

বিরহের মধ্যে দিয়েই অফুরানের নিত্য নবলীলা। পেয়েও যাঁকে পাওয়া যায় না, বারেবারে হারানোর বেদনার মধ্যে দিয়েই তাঁকে ঘিরে মানুষের চিরজয়যাত্রা।

গুরুর তিরোভাবের পর শোকের প্রথম দাপট কেটে গেলে শিষ্যেরা আবার নতুন আশায় বুক বাঁধলেন। তাঁরা দেখলেন, তাঁদের জীবন থেকে কর্ণধার চলে গেছেন কিন্তু তিনি তাঁদের নিঃস্ব করে ত ফেলে রেখে যান নি। তিনি দান করে গেছেন অমূল্য সম্পদের বীজ। সেই সম্ভাবনাকে চরম পরিণতিতে বিকশিত করার চেষ্টাই আজ তাঁদের কাম্য হওয়া উচিত।

অসুখে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবাকালে একটি অপ্রত্যাশিত জিনিস সকলের অজ্ঞাতে আপনাআপনি গড়ে উঠেছিল। গৃহী ও অবিবাহিত তরুণ অন্তরঙ্গরা সকলে একটি নিঃস্বার্থ স্নেহসূত্রে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা পড়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে থাকার সময়ে কয়েকজনের মধ্যে হয়ত গভীর বন্ধুত্ব জন্মেছিল কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকে কেন্দ্র করে সকলের মধ্যে একটা যে নিবিড় ঐক্যভাব তা সৃষ্টি হয় গুরুর সেবায় একত্রে আত্মত্যাগ করার চেষ্টার মধ্যে দিয়েই। শ্রীরাম-কৃষ্ণের তিরোভাবের পর তাঁরা বুঝতে পারলেন, তাঁরা যেন সকলে এ সংসারে এক অপরূপ মায়াজালে জড়িয়ে পড়েছেন। পরস্পরের পরস্পরকে ছেড়ে আর থাকতে ভাল লাগে না। অন্য লোকের সঙ্গে আলাপে বিরক্তি আসে। যে জন তাঁদের ছেড়ে গেছেন সেই প্রিয়ের কথা বই অন্য কিছু অসার বলে মনে হয়। নিরুপায় গৃহীরা যতক্ষণ সম্ভব সংসারের স্বার্থচিন্তার কাজে লিপ্ত থাকেন। কিন্তু যেই কাজের ফাঁকে অবসর পান অমনি মনে পড়ে সেই আনন্দময়ের মূর্তি। প্রাণে প্রবল বাসনা জাগে তাঁর কথা আলোচনা করতে। কিন্তু মনের মানুষের কথা ত যার তার সঙ্গে মজে না। তখন তরুণ গুরুভাইদের সংসর্গের জন্য প্রাণ আকুলিবিকুলি করে ওঠে।

তরুণ ভক্তেরাও বাড়ি ফিরে গিয়ে অনুভব করলেন তাঁদের এত দিনের পরিচিত পৃথিবী যেন একেবারে বদলে গেছে। বাড়ি, আত্মীয়স্বজনকে আর আগের মত আপন বলে বোধ হয় না। এ যেন বন্দীশালা। সকলে ভাবেন, এ বন্দীশালায় তাঁদের দিন কেমন করে কাটবে! প্রাণে ব্যাকুল প্রশ্ন জাগে, তাঁকে কি আর দেখতে পাব না?

নির্জনে বসে বসে তাঁরা কাঁদেন। কখন কখন উদ্দেশ্যহীন হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান,—কারণে অকারণে চোখে অশ্রু ঘনিয়ে আসে।

দু তিনজন তরুণ ভক্তের ফিরে যাবার জায়গা ছিল না। সুরেন্দ্র তাঁদের ডেকে বললেন, ভাই, তোমরা আর কোথা যাবে? এস একটা আড্ডা গড়া যাক্। সেখানে তোমরাও থাকবে আর আমাদেরও জুড়োবার একটা আশ্রয় হবে। তা না হলে রাতদিন সংসারে কেমন করে থাকব? কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের সেবার জন্যে মাসে মাসে যা দিতুম এখন থেকে এই আড্ডার খরচের জন্যে তাই দেব।

মহেন্দ্র, গিরিশ প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করে সুরেন্দ্রের কথামত বরাহনগরে একটি ভাঙা বাড়ি ভাড়া করা হল। প্রথমে বুড়ো গোপাল, পরে বৃন্দাবন থেকে ঘুরে তারক সেখানে এসে আশ্রয় গড়ে তুললেন। অনেকে মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে যাতায়াত করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে নরেন, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, বাবুরাম, যোগীন, লাটু, রাখাল ও কালী বাড়ির বাঁধন চিরদিনের মত ত্যাগ করে এসে উপস্থিত হলেন। সেই সময় থেকে ভবিষ্যৎ শ্রীরামকৃষ্ণমঠের সূচনা আরম্ভ হল। ক্রমে প্রসন্ন, সুবোধ, গঙ্গাধর ও হরি এসে জুটলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কৃত্যের পর তাঁর ভস্মাবশেষের খানিকটা বলরামের বাড়িতে রাখা হয়েছিল। বরাহনগরের বাসায় সকলে এসে আশ্রয় নেবার পর সেই ভস্মাবশেষ এনে একটি ঘরে প্রতিষ্ঠা করে নিত্যপূজার আয়োজন করা হল। শশী নিলেন সেই ঠাকুরঘরের ভার। আর নরেন নিলেন গুরুভাইদের তত্ত্বাবধানের ভার। তিনি বললেন, সাধন করতে হবে, তা না হলে ত ভগবানকে পাওয়া যাবে না।

তাঁদের অন্তরে তখন তীব্র বৈরাগ্য। সকলেই লক্ষ্যলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। তাই বেদ পুরাণ তন্ত্র মতে কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। তরুণ হৃদয়ে ছিল অদম্য অনুরাগ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, দুঃখ, মৃত্যু—কিছুরই ভয় তাঁদের সে অনুরাগকে সঙ্কুচিত করতে পারে নি। এতগুলি লোকের খাবার সংস্থান করা মাঝে মাঝে দুষ্কর হয়ে উঠত। মাঝে মাঝে তাঁদের উপবাস করেই দিন কাটাতে হত। যেদিন বা খাবার জুটত তাও অতি সাধারণ, মাত্র প্রাণধারণের উপযোগী। তবু সাধনায় তাঁদের ঘটত না কোন বিঘ্ন। কখন নিরালা গাছের তলায়, কখন ঘোর অন্ধকারে শ্মশানের মধ্যে, কখন গঙ্গাতীরে বসে তাঁরা যোগ সাধনা করতেন। কখন মঠের মধ্যে ধ্যানের ঘরে

বসে জপ করতে করতে রাত ভোর হয়ে যেত। আবার কখনবা সকলে মিলে মেতে উঠতেন গান ও সংকীর্তনানন্দে।

বাইরের সংসারের লেশমাত্র চিন্তা তাঁদের ছিল না। তাঁরা যেন কজনে মিলে এক নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করে তুলেছিলেন। কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের স্বাভাবিক অনিয়মের মধ্যেও নরেন্দ্রের পরিচালনায় তাঁদের মধ্যে একটি স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা থাকত। সকলেই ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠতেন। তারপর জপ ধ্যানাদির ফাঁকে ফাঁকে নিয়মিত শাস্ত্র পাঠ ও আলোচনা করতেন। শঙ্করাচার্য, রামানুজ, উপনিষদ্, যোগাবশিষ্ট, পুরাণ, গীতা, বাইবেল প্রভৃতি প্রাচ্যও পাশ্চাত্যের সকল ধর্ম ও দর্শনপ্রণালী তাঁদের বিচারের বিষয় ছিল। শুধু তাই নয়, যীশু, চৈতন্য, বুদ্ধ প্রভৃতি সকল মহাগুরুদের নিয়েই তাঁরা উৎসব করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার বিরাট উদারতা তাঁদের প্রতিদিনের সাধন জীবনকে মহিমান্বিত করে রেখেছিল।

এই বিচিত্র সাধনভজন, পাঠ আলোচনার মধ্যে নিয়ত ভেসে উঠত তাঁর চিন্তা। সেই হারানো প্রিয়জনকে ফিরে পাবার জন্য তাঁদের হৃদয়ে হৃদয়ে ঘনিয়ে উঠত তীব্র বেদনা।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ, এপ্রিল মাস। একদিন মহেন্দ্র মঠে এসেছেন। নরেন্দ্রের সঙ্গে বসে গল্প করছেন। কথাবার্তার মধ্যে ঘুরে ফিরে সেই গুরুর কথাই এসে হাজির হচ্ছে। নরেন্দ্র বললেন, পাগলের মত বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলুম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কি চাস্? আমি বললুম, আমি সমাধিস্থ হয়ে থাকব। তিনি বললেন তুই বড় হীনবুদ্ধি! সমাধির পারে যা। সমাধি ত তুচ্ছ কথা।

মহেন্দ্র উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, তিনি বলতেন জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। ছাদে উঠে আবার সিঁড়িতে আনাগোনা করা।

—কালী জ্ঞান জ্ঞান করে। আমি বকি। জ্ঞান কত্তে হয়? আগে ভক্তি পাকুক।

—তোমার বিষয় আর কি কি বলেছেন বল।

—নিজের বুকে হাত দিয়ে বলতেন, তোর গান শুনলে এর ভেতর যিনি আছেন তিনি সাপের মত ফোঁস করে যেন ফণা ধরে স্থির হয়ে শুনতে থাকেন। কিন্তু মাস্টারমশাই, এত তিনি বললেন, কই, আমার কি হল?

মহেন্দ্র বললেন, এখন শিব সেজেছ, পয়সা নেবার জো নেই। ঠাকুরের গল্প ত মনে আছে? বহুরূপী শিব সেজেছিল। যাদের বাড়ি গিছল, তারা একটা টাকা দিতে এসেছিল, সে নেয়নি। বাড়ি থেকে হাত পা ধুয়ে এসে টাকা চাইলে। বাড়ির লোকেরা বললে, তখন যে নিলে না! সে বললে, তখন শিব সেজেছিলুম, সন্ন্যাসী—তাই টাকা ছোঁবার জো নেই। তেমনি তুমি এখন রোজা সেজেছ। তুমি মঠের ভাইদের মানুষ করবে। তোমার ওপর সব ভার।

নরেন্দ্রের হৃদয়ে বৈরাগ্যের তীব্র অতৃপ্তি। তিনি বললেন, এক একবার খুব অবিশ্বাস আসে। বাবুরামদের বাড়িতে কিছু নেই বোধ হল। যেন ঈশ্বর টিশ্বর কিছু নেই।

মহেন্দ্র সান্ত্বনা দেবার আশায় আবার গুরুর কথা পাড়লেন, বললেন, ঠাকুর ত বলতেন, তাঁরও এ রকম মনের অবস্থা এক একবার হত। ধন্য তোমরা, রাতদিন তাঁকে চিন্তা করছ।

গোপনে পুষেরাখা দুঃসহ বিরহবেদনা নিমেষে প্রকাশিত হয়ে পড়ল, নরেন্দ্র ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, কই মাস্টারমশাই, তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না বলে শরীর ত্যাগ করতে ইচ্ছে হচ্ছে কই?

তরুণ ভক্তদের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণভাবধারাকে প্রতিষ্ঠা করার কাজ এমনি ভাবেই এগিয়ে চলে। বছর কেটে যায়।

ইতিমধ্যে তাঁদের আনন্দনীড়ে একটি ঘন মেঘের ছায়া পড়ল। মুক্তিকামীর দলে ধীরে ধীরে জাগল পথের নেশা। অন্তর্জগতের জয়যাত্রায় যারা বার হয়েছিলেন, মাটির পথ আজ তাঁদের ডাক দিলে। বরাহনগরের বাসাও যেন বদ্ধ বন্দীশালার মত অনেকের মনে হতে লাগল। একে একে কয়েকজন নানা তীর্থ ভ্রমণ করে আসতে লাগলেন। নিরঞ্জন পুরী ঘুরে এলেন, প্রসন্ন কারুকে না বলে বৃন্দাবন যাত্রা করলেন। প্রাণের জ্বালা আর চেপে রাখতে না পেরে একদিন রাখাল নরেনকে ডেকে বললেন, এখানে থেকে ত কিছু হল না। তিনি যা বললেন, ভগবান দর্শন হল কই?

নরেন চুপ করে রইলেন।

রাখাল তখন মনের গূঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, চল, নর্মদায় বেরিয়ে পড়ি।

নরেন বললেন, বেরিয়ে কি হবে? জ্ঞান কি হয়? তাই জ্ঞান জ্ঞান করছিস!

—তাহলে সংসার ত্যাগ করলে কেন?

নরেন কঠোরভাবে বললেন, রামকে পেলাম না বলে শ্যামের সঙ্গে থাকব! আর ছেলেমেয়ের বাপ হব—এমন কি কথা!

তখনও নরেনের ধারণা ছিল, কস্তুরী মৃগের মত সত্য আছে আপন আপন অন্তরের মধ্যেই। তীর্থে তীর্থে ঘুরে মরলে তাকে লাভ করা যাবে না,—নিজেকে বিকশিত করেই তাকে নিজের মধ্যে করতে হবে আবিষ্কার।

নরেনের নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে রাখাল সাময়িকভাবে মনের আশা জলাঞ্জলি দিলেন। কিন্তু ক্রমে বাইরে বার হবার নেশা অনেকেরই মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠল। কেবল নিজের মধ্যে আবদ্ধ থেকে তাঁরা আর স্থির থাকতে পারলেন না। যাঁকে একান্তভাবে পেয়েও তাঁরা ধরে রাখতে পারেন নি তাঁকে তাঁদের চাই-ই চাই। দুর্বার অতৃপ্তির বেদনায় একে একে অনেকেই বরাহনগর ছেড়ে বিশাল ভারতবর্ষের দিকে দিকে বেরিয়ে পড়লেন।

ক্রমে একদিন নরেনের অটল ধৈর্যও টলল। কানে পৌঁছল সুদূরের জলকল্লোল। তাঁর মন বললে, তুমি ত বলেছিলে, তোমাকে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তুমি আবার আসবে। কিন্তু আজকের এই অন্ধকারের জাল ভেদ করে তোমাকে ত দেখতে পাচ্ছি না? দুর্লভ, অন্তরে বাইরে না-পাওয়ার বেদনা যে দুঃসহ হয়ে উঠেছে, তুমি সাড়া দাও, সাড়া দাও, ঘোর অন্ধকারের বুক চিরে সাড়া দাও। তুমি জাগো, তুমি আমাদের ঘুমন্ত সত্তাকে জাগাও।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বিরহকাতর নরেন নিরুদ্দেশ যাত্রায় বার হলেন।

জীবনবিধাতা চাইছিলেন তাঁদের এই পথে বার হওয়া। গুরু তাঁদের দিয়েছিলেন গানের মালা, এবার শুরু হল তাঁদের সুরসন্ধানের পালা। বরাহ-নগরের নতুনগড়া মঠ ভেঙেই সকলের অলক্ষ্যে তৈরি হয়েছিল চিরদিনের মঠপ্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা।

তরুণ সাধকেরা শ্রীরামকৃষ্ণকে জীবনে দেখেছিলেন মাত্র—কিন্তু তাঁকে লাভ করেন নি। তাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁকে নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ তাঁদের হয় নি। অথচ সারা পৃথিবীর তৃষিত মানুষ-গোষ্ঠীর ঘরে ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণভাবধারা বিলোনোর জন্য প্রয়োজন ছিল তাঁর অনন্ত ভাবধারার এক একটি রূপ এঁদের এক এক জনের জীবনে কঠোর অভ্যাস ও মননের দ্বারা মূর্ত করে তোলা। বিশ্ববিধাতা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবময় সত্তা পরম

সম্পদরূপে পৃথিবীকে দান করেছিলেন। তাঁর তরুণ লীলাসঙ্গীরা তাঁর স্থূল সত্তাকে হারিয়ে সেই ভাবময় সত্তার সন্ধানেই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সেই বিরাটকে শুধু নিজের বিকাশের মধ্যে খুঁজলে তাঁকে একটি সমগ্ররূপে ত পাওয়া যেত না। তাহলে বরং তাঁরা ব্যক্তিজীবনের সীমার মধ্যে তাঁকে সঙ্কুচিত করে গুহাবাসী সাধকের মত প্রমত্ত হয়ে থাকতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বিরাট ভাবময় সত্তাকে ঠিক ঠিক ভাবে পাবার জন্য দরকার ছিল একদিকে যেমন নিজের মধ্যে খোঁজা আর একদিকে তেমনি বিশাল বাইরের বিশ্বের দিকে দিকে সন্ধান করা। তাঁদের মধ্যে যিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ সেই নরেন্দ্র একদিন এমনিভাবেই বনে প্রান্তরে তাঁকে খুঁজে বেড়িয়েছিলেন। সেই অনুসন্ধানের ফলে তিনি ভারতের মুচিমেথর, ব্রাহ্মণ শূদ্র, নগর বন, নদী পর্বত, মঠ মন্দির—সকলের মধ্যে সেই বিরাটকে আবিষ্কার করে মানুষের প্রেমে পাগল হয়ে গেছলেন। বিবাগী সন্ন্যাসীর জীবনে মুক্তিলাভের বাসনা পর্যন্ত হয়ে গেছল তুচ্ছ। বিশ্বজনের সেবার মহাব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করে তিনি নতুনতর অদ্বৈত লাভ করেছিলেন।

*

* *

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনই হচ্ছে তাঁর সব চেয়ে বড় কথামৃত। যা নিজে আচরণ করেছেন তাই তিনি বলেছেন। তাঁর তত্ত্বগুলি জীবনের অভিজ্ঞতায় পাওয়া সত্য, বইপড়া পণ্ডিতী তথ্য নয়। অপরে জীবনসমুদ্রের তীরে বসে অমৃত আস্বাদন করতে চায়, রত্ন কুড়িয়ে পাবার চেষ্টা করে। তিনি জীবন সমুদ্রের অতলে ডুব দিয়েছিলেন। তাঁর জীবনকথার বৈশিষ্ট্য এইখানে।

কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর জীবন ও কথামৃতের শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে সর্ব ধর্মসমন্বয়ের চেষ্টা। এক দিক থেকে এ কথা সত্য কিন্তু পুরোপুরি সত্য নয়। তাঁর মত এমন সুন্দর করে এমন প্রাণমাতানো ভাষায় এর আগে আর কেউ বলেন নি যে সকল ধর্মই সত্য। যত মত, তত পথ। প্রাচীন হিন্দুসাধকদের কাছে এই চিন্তাটি কিছু নতুন নয়। তাঁরা স্বীকার করেছিলেন, নদীর দল যেমন নানা পথ দিয়ে গিয়ে শেষে সাগরে মেশে তেমনি সকল মতবাদ আচরণ করেই এক ভগবানে পৌছানো যায়। কিন্তু মনে হয়, এই চিন্তাটি তাঁদের কাছে শুধু একটি তত্ত্ব হয়েই ছিল,—কারুর জীবনে ব্যাপকভাবে সত্যে পরিণত হয়েছিল কিনা তার প্রামাণিক কোন ইতিহাস আমরা পাই না। কারণ

প্রধান প্রধান ধর্মাচার্যেরা কেউই এই তত্ত্বটিকে বিশেষ জোর দিয়ে কোথাও প্রচার করে যান নি। তাছাড়া, হিন্দুসাধকদের কাছে নানা মত বলতে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত নানা সাম্প্রদায়িক সাধনপ্রণালী বোঝাত। তাঁরা হিন্দুধর্ম ছাড়া অন্য কোন ব্যাপক ধর্ম সম্বন্ধে সন্ধান রেখেছিলেন কি না তা তাঁদের রচনায় স্পষ্ট করে বলা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবই প্রথম আপন ধর্মমতের সমসাময়িক প্রতিদ্বন্দ্বী—মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মের নির্দিষ্ট পন্থায় সাধনা করে জীবনে সর্বধর্মসমন্বয়কে সত্যরূপে লাভ করে তা বিশ্বমানুষগোষ্ঠীকে দিয়ে গেছেন। অবশ্য শ্রীচৈতন্য, নানক এবং ইদানিংকালের রাজা রামমোহন ও কেশবচন্দ্র সমন্বয়ের তত্ত্বটি সম্বন্ধে বেশি আড়ম্বর না করে নিজ নিজ মতধারার মধ্যে একটি সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমন্বয়ের তুলনায় তাঁদের সমন্বয়ের রূপ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁরা আপন আপন উপলব্ধিমত নানা মতের শ্রেষ্ঠ বস্তুগুলি নিজের মতধারার অঙ্গীভূত করে একটি সমন্বয় গড়ে তুলেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমন্বয় বলতে কোন একটি বিশেষ মতধারা বুঝতেন না। তিনি বলেছেন, যে কোন ধর্ম আশ্রয় করে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। ধর্ম কিছু ঈশ্বর নয়।

এ কথা শুনে একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যদি অন্য ধর্মে ভ্রম থাকে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ তখুনি উত্তর দিয়েছিলেন, তা ভ্রম কোন্ ধর্মে নাই ? সকলেই বলে আমার ঘড়ি ঠিক যাচ্ছে। কিন্তু কোন ঘড়িই একেবারে ঠিক যায় না। সব ঘড়িকেই মাঝে মাঝে সূর্যের সঙ্গে মেলাতে হয়। * * * ভুল কোন্ ধর্মে নাই ? আর যদিই ভুল থাকে, যদি কেউ আন্তরিক হয়, যদি ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকে, তাহলে তিনি শুনবেনেই শুনবেন। মনে কর, এক বাপের অনেকগুলি ছেলে—ছোট, বড়। সকলেই বাবা বলতে পারে না। কেউ বলে বাবা, কেউ বা, কেউ কেবল পা। যারা বাবা বলতে পারলে না তাদের উপর বাপ রাগ করবে নাকি ? না, বাপ সকলকেই সমান ভালবাসবে ?

এমন উদার বিশ্বমানুষের ধর্মের সন্ধান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগে আর কেউ পেয়েছেন কি না সন্দেহ। পৃথিবীতে এক ধর্মের সঙ্গে আর এক ধর্মের ঝগড়া নিয়ে যুগে যুগে কত না মারামারি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি হয়ে গেছে। তিনি চিরতরে সে ঝগড়ার মীমাংসা করে দিয়ে গেছেন।

সর্বধর্মসমন্বয় শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের একটি শ্রেষ্ঠদান সন্দেহ নেই কিন্তু এ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য নয়। তিনি যৌবনে সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শ নিয়ে সাধনা শুরু

করেন নি। দীর্ঘ সাধনার মধ্যে যদিও বিভিন্ন নির্দিষ্ট পথে বারবার একই লক্ষ্যে পৌছবার চেষ্টা করেছেন তবু কোনও দিন তিনি সমন্বয়ের আদর্শ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সচেতন ছিলেন না। তাঁর মনের গড়নটা ছিল নিছক আদর্শপন্থী নয়,—সূক্ষ্ম, বস্তুপন্থী। তিনি কেবল ভাবের দ্বারা চালিত হতেন না, নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধপন্থী, বাইরে থেকে ঠিককরা কোন আদর্শ অনুযায়ী নিজের জীবনকে ভেঙে চুরে গড়ার চেষ্টা কখনও করেন নি। তিনি ছিলেন মূলতঃ শিল্পী-প্রকৃতির মানুষ,—পুরোপুরি স্বভাবের অনুগামী। এদিক থেকে আর্যসমাজ-প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ ছিলেন ঠিক তাঁর বিপরীত মানুষ। তাঁর ছিল মূলতঃ কর্মীর প্রকৃতি। তিনি ছিলেন আদর্শপন্থী। সমসাময়িক কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া এবং কঠোর পরিশ্রমে শাস্ত্রপাঠের ফলে কতকগুলি ভাব তাঁর হৃদয় মন অধিকার করেছিল। সেই ভাবধারা অনুযায়ী তিনি নিজেকে ভেঙে চুরে গড়বার চেষ্টা করেছিলেন, প্রাচীন শাস্ত্র অনুযায়ী নিজের জীবন এবং পারিপার্শ্বিক সমাজ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পাণ্ডিত্য ছিল না। তিনি জীবনকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন তাঁর পারিপার্শ্বিকের ভিত্তিভূমিতে জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশের মধ্যেই, প্রাচীন শাস্ত্রের কচকচির মধ্যে নয়। তিনি ছিলেন জীবনের মহাসাধক।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন যৌবনে সাধনা শুরু করেন তখন মনে হয় তাঁর বিশেষ কোন নির্দিষ্ট আদর্শ ছিল না। তিনি জন্মেছিলেন পুরোহিত বংশে, অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে কৌলিক বৃত্তি হিসাবেই পূজার কাজ আরম্ভ করেন। পুঁথিবিদ্যাবর্জিত তাঁর মনে ছিল জীবনকে লাভ করার প্রচণ্ড স্বাভাবিক আগ্রহ। সেই আগ্রহের প্রেরণাতেই বিগ্রহ পূজার মধ্যে তিনি জীবনের সত্য সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সে সত্য জীবন থেকে বর্জিত সত্য নয়, শাস্ত্র থেকে সংগৃহীত জ্ঞানও নয়। চরম চেষ্টা ও মনের অপূর্ব আধ্যাত্মিক সম্পদের জোরে তিনি আপন স্বভাবের নির্দিষ্ট পথে ভূমানন্দের অধিকারী হয়েছিলেন। সেই আনন্দের অনুভূতি পেয়ে তিনি বুঝেছিলেন এর কাছে পার্থিব ঐশ্বর্যের আনন্দ নিতান্ত তুচ্ছ। তাঁর জীবনে সেই অনুভূতিই দিয়েছিল পরম সত্যের সন্ধান। বিশ্বজীবনকে নব নব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে লাভ করেই তিনি পরম সত্যকে নিত্য নতুনরূপে আবিষ্কার করেছিলেন। মনে হয়, এই শাশ্বত জীবনকে নব নব পথে সন্ধান করার চেষ্টাই তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

সাধারণতঃ, তাঁকে আমরা দেখি ধর্মাচার্য হিসাবে। কিন্তু তিনি মহা-জীবনের ডুবুরী ছিলেন বলে ধর্মকে কোনদিন নিছক ধর্ম হিসাবে দেখতে পারেন নি,—কোন মতধারার সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে তাঁর বাণীকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তিনি ছিলেন অনন্ত ভাবময়। মানুষজীবনের যে কোন ক্ষেত্রের তৃষিত পথিক এসে তাঁর অমিয় বাণী থেকে নবপ্রেরণা লাভ করতে পারেন। শুধু বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের লোক নন, শিল্পী, কর্মী, যিনি যে ক্ষেত্র থেকে জীবনকে গভীরভাবে লাভ করার চেষ্টা করছেন তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের মধ্যে সন্ধান পাবেন অফুরন্ত পাথেয়ের।

তাঁর কাছে সত্যসন্ধানে যাঁরা এসে হাজির হতেন তাঁদের সকলের মধ্যেই প্রথমে তিনি মানুষটিকে দেখবার চেষ্টা করতেন। তাঁদের আপন আপন ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক গতি ও বিকাশের তারতম্য অনুযায়ী পথের সন্ধান দিতেন। তাই কেউ তাঁর কাছে থেকে শুধু হাতে ফিরতে পারতেন না। কর্মযোগী বিদ্যাসাগরকে তিনি বলেছিলেন, কর্ম করছ ভাল। কিন্তু নিষ্কাম হয়ে করো। জ্ঞানযোগী শশধর পণ্ডিতকে বলেছিলেন, যে পণ্ডিতের বিবেক নাই সে পণ্ডিতই নয়। তাই বলছি ঈশ্বরের পাদপদ্মে ডুব দাও। ভক্তিপন্থী কেশবচন্দ্রকে বলেছিলেন, সচ্চিদানন্দরসে ডুব দাও, আড়ায় বসে আস্বাদন করার চেষ্টা করো না। সকলকে মূলতঃ সেই এক কথাই বলেছেন, যে যে কাজ করছ কর, যে ভাব আশ্রয় করেছ কর, কিন্তু মনটিকে আন্তরিকভাবে ভগবানের দিকে ফিরিয়ে নাও,—নিজের মধ্যে যে বড় আমি আছে তাকে জাগাও, নির্লিপ্ত হবার চেষ্টা কর। বিশ্বজীবনের সঙ্গে সংস্পর্শহীন, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধকরা যোগাসন কারুকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করতে বলেন নি। বিচিত্রের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন একের নিত্যলীলা।

তাঁর তরুণ অন্তরঙ্গেরা জন্মেছিলেন তাঁর ভাবধারা পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবার মহাব্রত উদ্‌যাপন করার জন্য। সে দুরূহ কাজের জন্য সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য ছিল। কিন্তু তাই বলে সন্ন্যাসের আদর্শ রামকৃষ্ণভাবধারার একমাত্র আদর্শ নয়। স্বামী বিবেকানন্দের সফল জীবন এমনই প্রখর দ্যুতিময় ছিল যে সাধারণতঃ আমাদের ধারণা হয়ে গেছে যে শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝি পৃথিবীর সকল নরনারীকেই সন্ন্যাসের মন্ত্র দিয়ে গেছেন। কিন্তু তা সত্য নয়। গৃহীদের জন্যও তিনি শুনিয়ে গেছেন অভয় বাণী। তাঁর গৃহী অন্তরঙ্গদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের মত প্রতিভাবান্ কোন লোক

ছিলেন না, থাকলে আজ আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণকে পূর্ণতরভাবে বোঝার সুবিধা হত। তাঁর কথামৃতের সকল দিকের তাৎপর্য সহজ হয়ে যেত।

তিনি গৃহী অন্তরঙ্গদের বারে বারে বলতেন, যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে সে ধন্য, সে বীরপুরুষ। যেমন কারুর মাথায় দু মণ বোঝা আছে, আর রাস্তা দিয়ে বর যাচ্ছে। মাথায় ভারি বোঝা, তবু সে বর দেখছে। খুব শক্তি না থাকলে হয় না। যেমন পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে একটুও পাঁক নাই। পানকৌড়ি জলে সর্বদা ডুব মারে, কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই আর গায়ে জল থাকে না। * * * সংসারে নির্লিপ্তভাবে থাকতে গেলে কিছু সাধন করা চাই। দিন কতক নির্জনে থাকা দরকার। তা এক বছর হোক, ছমাস হোক, তিন মাস হোক বা এক মাস হোক। সেই নির্জনে ঈশ্বর চিন্তা করতে হয়, সর্বদা তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ভক্তির জন্য প্রার্থনা করতে হয়। আর বলতে হয়, এ সংসারে আমার কেউ নেই, যাদের আপনার বলি তারা দুদিনের জন্যে। ভগবান আমার একমাত্র আপনার জন, আমার সর্বস্ব। * * * ভক্তিলাভের পর সংসার করা যায়। যেমন হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙলে হাতে আর আঠা লাগে না। সংসার জলের স্বরূপ আর মানুষের মনটি যেন দুধ। জলে যদি দুধ রাখতে যাও, দুধে জলে এক হয়ে যাবে। তাই নির্জন স্থানে দই পাততে হয়। দই পেতে মাখন তুলতে হয়। মাখন তুলে যদি জলে রাখ তাহলে জলে মিশবে না, নির্লিপ্ত হয়ে ভাসতে থাকবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলতেন, যদি বল সংসার আশ্রমের জ্ঞানী আর সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞানী এ দুয়ের তফাত আছে কিনা। তার উত্তর এই যে দুইই এক বস্তু। এটিও জ্ঞানী উটিও জ্ঞানী। তবে সংসারে জ্ঞানীরও ভয় আছে। কামিনীকাঞ্চনের মধ্যে থাকতে গেলেই একটু না একটু ভয় আছে। কাজলের ঘরে থাকতে গেলে যত সিয়ানাই হও না কেন, কাল দাগ একটু না একটু গায়ে লাগবেই। মাখন তুলে যদি নতুন হাঁড়িতে রাখ, মাখন নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে না। যদি ঘোলের হাঁড়িতে রাখ, সন্দেহ হয়। খই যখন ভাজা হয় দুচারটে খই খোলা থেকে টপ্ টপ্ করে লাফিয়ে পড়ে। সেগুলি যেন মল্লিকা ফুলের মত, গায়ে একটুও দাগ থাকে না। খোলার উপর যে সব খই থাকে সেও বেশ খই, তবে অত ফুলের মত হয় না। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞানলাভ করে তবে ঠিক এই মল্লিকা ফুলের মত দাগশূন্য হয়। আর জ্ঞানের পর সংসার খোলায় থাকলে একটু গায়ে লালচে দাগ হতে পারে। * * তা

যাই হোক, যদিও সংসারের জ্ঞানীর গায়ে দাগ থাকতে পারে সে দাগে কোন ক্ষতি হয় না। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বটে কিন্তু তাতে আলোর ব্যাঘাত হয় না।

সন্ন্যাসী ও সংসারীর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের মূল কথা সেই এক। স্বকীয় বিকাশ ও মনের গতি অনুযায়ী আপন আপন জীবন যাপন কর কিন্তু নির্লিপ্ত হও, মন থেকে বিষয়াসক্তি দূর করে দাও। কামিনীকাঞ্চন বর্জন কর। অপূর্ব তাল ও ব্যঞ্জনাময় এই দুটি শব্দ তাঁর সৃষ্টি করা। বাংলা ভাষা এ দুটি শব্দ লাভ করে সমৃদ্ধ হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ এ দুটি শব্দ দিয়ে ভিতরের তাৎপর্যকেই বুঝতেন নিছক বাইরের অর্থে এদের প্রয়োগ করতেন না। গৃহীদের জীবনে সব চেয়ে বড় আসক্তির বস্তু হচ্ছে দেহভোগ আর বিষয়ানন্দ। এই দুটি মৌলিক ভোগাসক্তির উপাদান হচ্ছে কামিনী ও কাঞ্চন। উপাদানের নাম উল্লেখ করে তিনি আসক্তি দুটিরই ছবি শ্রোতাদের সামনে প্রকট করে তোলবার চেষ্টা করতেন। কারুর কারুর ধারণা মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর মধ্যযুগীয় সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। কিন্তু তিনি কামিনী বলতে নারীজাতিকে বুঝতেন না। কামিনীবর্জন মানে পৃথিবী থেকে সমগ্র নারীজাতি লুপ্ত হোক—এ ধারণা নয়। কামিনী বলতে পুরুষের কামিনীভোগেচ্ছা ও নারীর পুরুষভোগেচ্ছাকেই ইঙ্গিত করতেন। কারণ তাঁর যেমন পুরুষ ভক্ত ছিলেন তেমনি মেয়ে ভক্তও ছিলেন। পুরুষদের যেমন রমণীসঙ্গ ত্যাগ করতে বলতেন, মেয়ে ভক্তদের তেমনি পুরুষসংসর্গ এড়িয়ে চলতে পরামর্শ দিতেন। তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি জীবন থেকে কামিনীবর্জন করেছিলেন কিন্তু স্ত্রী ত্যাগ করেন নি। তাঁর চরম সিদ্ধিলাভের পরও সন্ন্যাসিনী সারদামণি দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছেই থাকতেন।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এই দুটি শব্দ নিয়ে প্রথমে ভুল করেছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ, এপ্রিল মাস। অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণকে তখন ভক্তেরা কাশীপুরের বাগানে এনে চিকিৎসা করাচ্ছেন। সেদিন ডাক্তার সরকারের সঙ্গে তাঁর একজন বন্ধু ডাক্তারও এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের সেবা ও আত্মত্যাগের জন্য ইঙ্গিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্য বললেন, এদের বড় খরচা হচ্ছে।

ডাক্তার ভক্তদের দেখিয়ে উত্তর দিলেন, তা এঁরা সব প্রস্তুত। বাগানের খরচা সব দিতে এঁদের কোন কষ্ট নাই। এখন দেখ, কাঞ্চন চাই। আবার কামিনীও চাই।

ডাক্তারের বন্ধু মৃদু হাসতে হাসতে বললেন, হ্যাঁ, এঁর পরিবার রেঁধে বেড়ে দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের রোগশীর্ণ মুখে এক ফালি অপরূপ হাসি ভেসে উঠল। তিনি বললেন, বড় জঞ্জাল।

—জঞ্জাল না থাকলে ত সবাই পরমহংস হত।

—স্ত্রীলোক গায়ে ঠেকলে অসুখ হয়, যেখানে ঠেকে সেখানটা ঝন্‌ঝন্‌ করে, যেন শিঙি মাছের কাঁটা বিঁধল।

ডাক্তার বললেন, তা বিশ্বাস হয়। তবে না হলে চলে কই?

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বুঝতে পারলেন, তিনি কি অর্থে কামিনীকাঞ্চন বর্জন করতে বলেন তা ডাক্তার ঠিক বুঝতে পারেন নি। তাই তাঁকে বোঝাবার জন্য গলার ভয়ঙ্কর বেদনা সত্ত্বেও আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, টাকা হাতে করলে হাত বেঁকে যায়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। টাকাতে যদি কেউ বিদ্যার সংসার করে, ঈশ্বরের সেবা—সাধুভক্তের সেবা করে, তাতে দোষ নাই। আর স্ত্রীলোক নিয়ে মায়ার সংসার করা! তাতে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। যিনি জগতের মা, তিনিই এই মায়ার রূপ—স্ত্রীলোকের রূপ ধরেছেন। এটি ঠিক জানলে আর মায়ার সংসার করতে ইচ্ছা হয় না। সব স্ত্রীলোককে ঠিক মা বোধ হলে তবে বিদ্যার সংসার করতে পারে। ঈশ্বর দর্শন না হলে স্ত্রীলোক কি বস্তু বোঝা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সূক্ষ্ম মন এ কথা জানত, বাস্তব পৃথিবীতে কোন আদর্শের চরম অনুসরণ করলে বেঁচে থাকা অসম্ভব। যতদিন জীবন ততদিন অংশতঃ মানতেই হবে জড়জগতের অপরিহার্য নিয়মাবলী। তাই বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় সাধকের জীবনে টাকার প্রয়োজন একেবারে শূন্য করে দেওয়া সম্ভব নয়, তবে টাকার আসক্তি নিঃশেষে লোপ করা সম্ভব। কাঞ্চন নিয়ে যদি কেউ নির্লিপ্ত বিদ্যার সংসার করতে চায় তাতে দোষ নেই। তেমনি দেহভোগেচ্ছা ত্যাগ করাই হচ্ছে—কামিনীবর্জন করার মূল লক্ষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সারদামণির মধ্যে দেখতে পেতেন না নিজের স্ত্রীকে, দেখতেন তাঁর ইষ্টদেবীরই মূর্তি।

তিনি গৃহীদের বলেছেন, নির্লিপ্ত বিদ্যার সংসার গড়ে তোল। বৈরাগীদের বলেছেন, নির্লিপ্ত হও অদ্বৈতলাভের সাধনা করে অথবা শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করে। এই হচ্ছে তাঁর মানুষগোষ্ঠীকে অপরূপ দিব্যজীবনলাভের মন্ত্রদান।

*

* *

এই নির্লিপ্ততার বাণী ভারতীয় সংস্কৃতির পুরাতন বাণী। যুগ যুগ ধরে

নানাস্থনে নানাভাবে প্রকাশ করেছেন এই চরম তত্ত্বকে। গীতাকার বলেছেন, কর্ম কর কিন্তু আগে সুখদুঃখকে সমান জ্ঞান করে বিতস্পৃহ হও। শঙ্করাচার্য বলেছেন, মায়ার নাগপাশ কেটে ব্রহ্মজ্ঞ হও। বেদান্তেরও মূল কথা নির্লিপ্ততার সাধনা।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্লিপ্ততার বাণীর মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁর অমিয় বচনগুলি সমগ্রভাবে বিশ্লেষণ করে দেখলে মনে হয় তাঁর নির্লিপ্ততা তোতার মত শুষ্ক জ্ঞানমার্গীর পাষাণ নির্লিপ্ততা নয়। তা হচ্ছে ভক্তিরসমাখা, সরস নির্লিপ্ততা। তার মূলে নেই মায়া বলে এই নিখিল মানবজীবনকে বর্জন করার চেষ্টা। জীবনকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করার প্রেরণাই হচ্ছে তাঁর কথামৃতের গোড়ার কথা। মাটির দেশে তিনি দিয়ে গেছেন দিব্যের সন্ধান,—আপন জীবনের সাধনা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন দিব্যকে। এই সর্বব্যাপক গ্রহণ তাঁর নির্লিপ্ততার প্রথম বৈশিষ্ট্য।

ইংরেজজাতির কাছে ভারতবর্ষের যখন রাজনৈতিক পরাজয় ঘটে তখন আমাদের গোষ্ঠীগত জীবনে প্রকট হয়ে উঠেছিল জীবনকে বর্জনের চেষ্টা। সে যুগে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, যাঁরা বৃহৎ, যাঁরা জন্মগত লোকনায়ক তাঁদের প্রভাব থেকে সমাজ হয়ে পড়েছিল বঞ্চিত, কারণ তাঁরা আপন মোক্ষলাভের সাধনায় গুহাবাসী হয়ে চারপাশের মানুষের সংসর্গ ত্যাগ করেছিলেন। ভারতীয় সমাজের দিকে দিকে তাই প্রবল হয়ে উঠেছিল সেই সব শক্তিহীন মানুষ যারা শুধু বুঝত স্বার্থান্বেষণ, কূটবুদ্ধি ও ছলচাতুরী। ক্রমে বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম প্রচলন হল। তার ফলে ভারতীয় মনীষীরা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করলেন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির রূপ কি এবং ইংরেজের মানসপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য কোথায়। তাঁরা এই তথ্য আবিষ্কার করলেন, ইংরেজের গোষ্ঠীগত ও ব্যক্তিগত শক্তির প্রধান উৎস হচ্ছে জীবনকে গ্রহণ করার আদর্শধারা। ভারতবাসীর মত তারা জীবনকে বর্জন করে গুহাবাস মোক্ষসাধন অবলম্বন করে না,—সংসারকে মায়া বলে উপেক্ষা করে ভাগ্যের রুদ্ধদ্বারে মাথা ঠুকতে ঠুকতে তাকিয়ে থাকে না অনিশ্চিত স্বর্গের দিকে। নব্য বাঙালী সেই আদর্শ-ধারা আবিষ্কার করে মুগ্ধ হল, ধীরে ধীরে ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে অন্তর্জীবনে সেই আদর্শ অবলম্বন করতে লাগল এক একজন শক্তিশালী সাধক। এইভাবে স্তরে স্তরে অতিবাহিত হয়েছিল রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্র

নাথের যুগ। অকস্মাৎ সেকালের সমাজের একটি বিভিন্ন উৎস থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে এসে হাজির হলেন চরম সিদ্ধির অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণদেব, তাঁর সিদ্ধির মধ্যে ফুটে উঠল গ্রহণের নব আদর্শধারা।

এ গ্রহণ পাশ্চাত্যসংস্কৃতির আদর্শগত গ্রহণ নয়। পাশ্চাত্য সমাজে মানুষের প্রতি যে মৈত্রী ও করুণা দেখা যায় তার মূলে আছে বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ। পাশ্চাত্যবাসীর হৃদয়ে জীবনকে গ্রহণ করার প্রেরণার গোড়ায় আছে ভোগের আদর্শ—অবশ্য সে ভোগ বীর্যবানের ভোগ। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বব্যাপক গ্রহণের ভিত্তি হচ্ছে নির্লিপ্ততার সাধনা। মানুষের উপর তাঁর যে মমত্ব তার উৎস হচ্ছে নব অদ্বৈতবাদ,—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা। তাঁর জীবনে মূর্তি পেয়েছে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির এক নতুন রূপ। নতুন ও পুরাতনের মধ্যে প্রকৃতিতে ভেদ নেই, ভেদ শুধু আকৃতিতে।

শ্রীরামকৃষ্ণভাবধারার নির্লিপ্ততার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার গতীয়তা। এই বৈশিষ্ট্য তাঁর বাণীর চেয়েও জীবনলীলার মধ্যেই বেশি প্রকাশ পেয়েছে। নিরাসক্তিসাধনার মধ্যে কোথাও তিনি টানতে চান নি ইতির ছেদ। আজীবন তিনি অনুসরণ করে গেছেন নিত্যচলার লীলাবাদ। এক পাওয়া থেকে আর এক পাওয়ার জন্য যাত্রা করা—এই ছিল তাঁর পথ চলার মন্ত্র। অল্পে তাঁর তৃপ্তি হয় নি, বিরাটকে বিচিত্রভাবে আস্বাদন করার জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন অবিরত। তাঁর নিরাসক্তিসাধনার চরম লক্ষ্য ঠিক মোক্ষলাভ ছিল না। মোক্ষ বলতে কোন না কোন পর্বে জীবনের সঙ্গে সকল সংযোগ থেকে মুক্তি বোঝায়। শ্রীরামকৃষ্ণ মোক্ষের স্তরে উঠেও মোক্ষকে উপেক্ষা করেছেন। তাঁর নিজের উপমায় বলা যেতে পারে ছাদে উঠে আবার বারে বারে নেমে এসেছেন। তাঁর দীর্ঘ সাধনজীবনে এই মহাসত্যই ফুটে উঠেছে। তিনি যতই স্তরে স্তরে গভীরতর নিরাসক্তিলাভ করেছেন ততই তাঁর মধ্যে লীলায়িত হয়ে উঠেছে দিব্য জীবন সম্বন্ধে নূতনতর ও প্রচণ্ডতর উল্লাস। সেই মহা উল্লাসের প্রেরণা জীবনের পর্বে পর্বে নানা পথে চরম অনুভূতি লাভ করে শেষে শিবজ্ঞানে জীবের সেবার আদর্শে বিশ্বজনকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর তীর্থে সেই অনুভূতির নিত্যরসাস্বাদন করে গেছেন। তাঁর অপূর্ব নিরাসক্তি কোনদিন তাঁর অন্তরের অবিরাম দিব্য উল্লাসের উৎসকে শুকিয়ে দিতে পারে নি। মোক্ষলাভের মধ্যে কোন দিন রুদ্ধ হয় নি তাঁর জীবনের নিত্য চলা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পরবর্তীকালে বাংলাদেশের আর একজন মহাপ্রাণও

শুনিয়েছিলেন এই নির্লিপ্ততা এবং অবিরত পথচলার মহাবাণী। তিনি ছিলেন না সাধনমার্গের সন্ধানী পথিক। তিনি জীবনকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন কাব্যরসানুভূতির পথে। সে যাত্রার ঘাটে ঘাটে বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর হৃদয় যে চরম সত্যের স্পর্শ লাভ করেছিল তা তাঁর "ফাল্গুনী" নাটকে কবিচরিত্রের মুখে প্রকাশ করেছেন। নাটকের কবি মহারাজকে বলছেন :

"কবি। আমাদের মন্ত্র এই যে, ওরে ভাই, ঘরের কোণে তোদের থলি থালি আঁকড়ে বসে থাকিসনে, বেরিয়ে পড়্ প্রাণের সদর রাস্তায় ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল।

"মহারাজ। সংসারের পথটাই বুঝি তোমার বৈরাগ্যের পথ হল ?

"কবি। তা নয় ত কি মহারাজ ? সংসারে যে কেবলি সরা, কেবলি চলা। তারই সঙ্গে সঙ্গে যে লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলি সরে, কেবলি চলে, সেই ত বৈরাগী, সেই ত পথিক, সেই ত কবিবাউলের চেলা।

"মহারাজ। তাহলে শান্তি পাব কি করে ?

"কবি। শান্তির উপরে আমাদের একটুও আসক্তি নেই, আমরা যে বৈরাগী।

"মহারাজ। কিন্তু ধ্রুব সম্পদটি ত পাওয়া চাই।

"কবি। ধ্রুব সম্পদে আমাদের একটুও লোভ নেই, আমরা যে বৈরাগী।

"মহারাজ। সে কি কথা ?

"কবি। আমরা অধ্রুব মন্ত্রের বৈরাগী। আমরা কেবলি ছাড়তে ছাড়তে পাই, তাই ধ্রুবটাকে মানি না।

"মহারাজ। এ তোমার কি রকম কথা ?

"কবি। পাহাড়ের গুহা ছেড়ে যে নদী বেরিয়ে পড়েছে তার বৈরাগ্য কি দেখেন নি মহারাজ ? সে অনায়াসে আপনাকে ঢেলে দিতে দিতেই আপনাকে পায়। নদীর পক্ষে ধ্রুব হচ্ছে বালির মরুভূমি—তার মধ্যে সেঁধলেই বেচারা গেল। তার দেওয়া যেমনি ঘোচে অমনি তার পাওয়াও ঘোচে।

"মহারাজ। ঐ শোন কবিশেখর, কান্না শোন। ঐ ত তোমার সংসার!

"কবি। ওরা মহারাজের দুর্ভিক্ষকাতর প্রজা।

"মহারাজ। আমার প্রজা ? বল কি কবি ? সংসারের প্রজা ওরা। এ

দুঃখ কি আমি সৃষ্টি করেছি? তোমার কবিত্বমন্ত্রের বৈরাগীরা এ দুঃখের কি প্রতিকার করতে পারে বলত।

"কবি। মহারাজ, এ দুঃখকে ত আমরাই বহন করতে পারি। আমরা যে নিজেকে ঢেলে দিয়ে বয়ে চলেছি। নদী কেমন করে ভার বহন করে দেখেছেন ত? মাটির পাকা রাস্তাই হল যাকে বলেন ধ্রুব, তাইত ভারকে কেবলি সে ভারি করে তোলে; বোঝা তার উপর দিয়ে আর্তনাদ করতে করতে চলে আর তারও বুক ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। নদী আনন্দে বয়ে চলে, তাই ত সে আপনার ভার লাঘব করেছে বলেই বিশ্বের ভার লাঘব করে। আমরা ডাক দিয়েছি সকলের সব সুখ দুঃখকে চলার লীলায় বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। আমাদের বৈরাগীর ডাক। আমাদের বৈরাগীর সর্দার যিনি, তিনি এই সংসারের পথ দিয়ে নেচে চলেছেন তাই ত বসে থাকতে পারি নে,

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
ডাক দিয়ে সে যায়,
আমাদের ঘরে থাকাই দায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ যাকে বলেছেন নির্লিপ্ততা, রবীন্দ্রনাথ তাই বুঝেছেন বৈরাগ্য শব্দ দিয়ে। কবির বৈরাগী হচ্ছে নিরাসক্ত বাউল, শান্তির মধ্যে—সুখের মধ্যে তার একটুও আসক্তি নেই, তাই সে দুঃখের মধ্যেও দেখতে পায় ভারহীন দিব্য আনন্দকে। তার লক্ষ্য কিছুকে আঁকড়ে ধরে পাওয়া নয়—কেবলি ছাড়তে ছাড়তে পাওয়া। সে জমতে চায় না চলতে চায়, ফল চায় না ফলতে চায়। বনানীপ্রকৃতির ঋতুউৎসবেও এই একই লীলা—চিরপুরাতনের নিত্যনতুন আবরণ মোচনের অবিরাম খেলা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে একই মূল আদর্শ ফুটে উঠেছে—অবশ্য ভিন্ন সুরে, ভিন্ন ভাষায়। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে আছে দুটি সত্তা—একটি ব্যক্তিগত, অপরটি বিশ্বগত। একটি ছোট আমি, আর একটি বড় আমি। মহাজীবনের কবি আপন বিশ্বসত্তার মধ্যে রসানুভূতির বিদ্যুতস্পর্শে যা পেয়েছিলেন, মহাজীবনের আচার্য সেই উপলব্ধি আপন বিশ্বসত্তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত সত্তার অণুতে অণুতে লাভ করেছিলেন কঠিন সাধনার দ্বারা। একই মূল আলোকশিখাকে দুজনে অনুভব করেছেন বিভিন্ন কোণ থেকে,—একই মূল সুরকে দুজনে রূপায়িত করে তুলেছেন

জীবনের বিভিন্ন তারের ঝঙ্কারে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ যাকে বলেছেন ত্যাগের পথে নির্লিপ্ত হওয়া, কবি তাকেই বর্ণনা করেছেন ছাড়তে ছাড়তে পাওয়া। পরমহংসের উপলব্ধি ব্যক্তিগত সত্তার দৈনন্দিন পরিধির সীমায় গভীর তাই তাঁর কথা আরও মৌলিক এবং প্রাণমাতানো।

বাঙলার অন্তরের শ্রেষ্ঠ রত্ন দিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণসত্তা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণীকে কেন্দ্র করে যে অপরূপ আদর্শধারা গড়ে উঠেছে তাকে কেবল বাঙলার সংস্কৃতির নবজাগরণ ভাবলে ভুল করা হবে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে যে নবজন্মের প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল তা প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষেরই নবজন্মের সাধনা। তার ইতিহাসের মধ্যে বাঙালী-গোষ্ঠীর একান্ত নিজস্ব কোন সন্ধান ও নতুন সত্যলাভের পরিচয় নেই। অবশ্য একথা স্বীকার করি, অন্যান্য ভারতীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে বাঙালীর যেমন বহুলাংশে মিল আছে, তেমনি আছে কতকগুলি সুস্পষ্ট স্বকীয়তাও। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীন কেন্দ্র ছিল উত্তর ভারত। সেখানকার প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের তুলনায় বাংলার বনানীপ্রকৃতির একটি নিজস্ব রূপ আছে। তেমনি নবযুগের বাঙালীর মানসপ্রকৃতি, দৈহিক গঠন এবং সামাজিক অভিব্যক্তির মধ্যেও আছে কতকগুলি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য। বাঙালী পরিবারে আবির্ভাব এবং বাঙলার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে প্রতিপালনের ফলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহে মনে সেই সব বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে রূপায়িত হয়েছিল সত্য। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে মূল ভাবধারা এবং সাধনপ্রণালী অবলম্বন করে জীবন কাটিয়ে গেছেন তা ছিল একান্তভাবে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির দান। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সিদ্ধি মানে মূলতঃ সেই ভারতীয় সংস্কৃতিরই নূতনতর সিদ্ধি। তাঁর সাধনার মধ্যে দিয়ে নবজন্ম লাভ করেছে ভারতবর্ষের মহাজাতি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাজীবনখানি আমাদের প্রতিদিনের জীবনে এনে দিয়েছে নতুন আশার আলো। নিত্যপরিচিত বস্তুর মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেছেন নতুন অর্থ। তাঁর কথা চিন্তা করলে আমাদের পুরাতন পৃথিবী ভরে ওঠে নতুন সম্পদে, অবসন্ন হৃদয় জেগে ওঠে অভিনব প্রেরণায়, ঘুচে যায় চিরাচরিতের একঘেঁয়েমি জড়তা। পরম কারুণিক তিনি, সকল মানুষকেই ডাক দিয়েছেন অভয় মন্ত্রে। ছোট বড়, প্রতিভাবান্ ও সাধারণ, ত্যাগী ও ভোগী,—যে যেমন আধার হোক না কেন—সকলের জন্য চলার পথ তৈরি করে

দিয়ে গেছেন। তাঁকে স্মরণ করলে চারিদিকের অন্ধকার থেকে যেন নিয়ত শুনতে পাওয়া যায় ভোরের ভৈরবী ডাক :

"তিমির লয় হল দীপ্তিসাগরে,
স্বার্থ হতে জাগো, দৈন্য হতে জাগো,
সব জড়তা হতে জাগো জাগোরে।"

—১৯৪৫ সালের অগস্ট থেকে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর।

শেষ

এই লেখকের লেখা আরও বই

উপন্যাস ঃ

যে নদী মরুপথে   ঘুমপাড়ানি গান

জীবনী ঃ

স্বামীজির জীবনকথা

"এই পুস্তকের ভাষা এত চিত্তাকর্ষক ও সতেজ হয়েছে যে একবার পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করে রাখা যায় না। * * * মূল্যবান মন্তব্যগুলি বইখানিকে সাধারণ জীবনীর শ্রেণী থেকে উচ্চস্তরের সাহিত্যের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। এরূপ জীবনী বাংলাভাষায় কমই লেখা হয়েছে।" —উদ্বোধন

মানুষ রবীন্দ্রনাথ

"It shows considerable powers of observation and of forming an idea of a man's personality from what he says aud does. For this kind of work what is necessary, among other things, is capacity for psychological study. This the author possesses. The book is written in an attractive style." স্বাঃ শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

ছোটদের জন্য জীবনী ঃ

ছোটদের রামকৃষ্ণ, ছোটদের বিবেকানন্দ, ছোটদের গান্ধীজী, ছোটদের রবীন্দ্রনাথ, ছোটদের বিদ্যাসাগর।

"প্রত্যেক বইখানিতে পুরো একটি জীবনের মোটামুটি আভাস দেবার চেষ্টা আছে। বড়মানুষদের জীবনের সত্য কাহিনী পড়ে ছোটদের বস্তুবাদী মন খুশী হবে—অজান্তে আপনা থেকে জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করবে।"

কলিকাতার বড় বড় বইএর দোকানে পাওয়া যায়।

লেখকের লেখা বই

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাকথা 	৪॥০
মানুষ রবীন্দ্রনাথ

জীবনকথা রচনামালা ঃ

স্বামীজীর জীবনকথা 	২৲
রবীন্দ্র জীবনকথা 	২৲
সারদামণির জীবনকথা
স্ট্যালিনের জীবনকথা 	৬৵০
মহামানুষদের কথা

উপন্যাস ঃ

যে নদী মরুপথে 	২॥০
ঘুমপাড়ানি গান 	২৲

মহামানুষ রচনামালা ঃ

(ছোটদের জন্য)

ছোটদের বিবেকানন্দ 	॥৵০
ছোটদের শ্রীরামকৃষ্ণ 	॥৵০
ছোটদের গান্ধীজী 	১৵০
ছোটদের রবীন্দ্রনাথ 	॥৵০
ছোটদের বিদ্যাসাগর 	॥৵০

মুদ্রণ—বেঙ্গল অটোটাইপ প্রেস